আল বাহি আল খাওলী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

ইসলামে নারী

মূল

আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)

বাংলা রূপান্তর ও সম্পাদনায়

মোহাম্মদ নুরুল হুদা নদভী

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ

বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫-৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫-৮১৯৮৬৯

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬-২৭৩০৩৫

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০১৫

মুদ্রণে
ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

হাদিয়া : ৩৩০ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের কথা

নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ই প্রথমবার নারীজাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। আর ইসলামের সার্বজনীন বিপ্লবী আদর্শে সবার আগে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন একজন নারী– উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদীজাতুল-কোবরা (রা) তায়ালা আনহা। এরপর থেকে ইসলামের গোটা ইতিহাসে মুসলিম নারী তার নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ইসলামী আদর্শ মোতাবেক মুসলিম পরিবার ও মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে অমুসলিম পরিবার ও সমাজের নারীদের মতো অপমান, বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা ভাববারও অবকাশ থাকে না। তাই দেখতে পাচ্ছি যে, আজ সারা বিশ্বে অমুসলিম নারীসমাজ যখন তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি তুলছে তখন মুসলিম মহিলাসমাজ তাদের যথার্থ মুক্তির জন্যে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা নারীকে ভোগবিলাসের নিষ্প্রাণ পণ্যে পরিণত করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য বলুন বা সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য, উভয় ক্ষেত্রেই নারীসমাজ দারুণভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত। উভয় সমাজেই নারীকে পুরুষের মনোরঞ্জন এবং পুরুষালী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ই নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র, বিশেষ অধিকার এবং স্বতন্ত্র মর্যাদাকে অস্বীকার করে। আর উভয় গোষ্ঠীর প্রভাববলয়ে নারীসমাজের সাথে একই দুর্ব্যবহারের মহড়া চলছে। অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মগুলো তো নারীকে যেন মানুষ হিসেবেই মানতে চায় না।

কোনো কোনো ধর্ম নারীকে 'সকল পাপের উৎস' বলে ঘোষণা করেছে। কোনো কোনো ধর্ম নারীর আত্মা আছে বলে অস্বীকার করে, আবার এমন ধর্মও আছে যা নারীকে মানুষ বলে বিবেচনা করতেও

অনিচ্ছুক। খ্রিস্টানদের বাইবেল, ইহুদিদের তৌরাত, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, পারসিকদের জিন্দাবেস্তা, শিখদের গ্রন্থ সাহেব আর হিন্দুদের বেদ-ঋগবেদ বা গীতার কোথাও নারীদের অধিকার ও মর্যাদাসংক্রান্ত কোনো আইনবিধির অস্তিত্ব নেই, এমনকি নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা পর্যন্ত নেই। এর পরিবর্তে নারী-নির্যাতন ও নারীর অবমাননা এবং নারী লাঞ্ছনার অনেক লোমহর্ষক কাহিনী, অথবা যৌন ব্যভিচারের অশ্লীল আলোচনাই পরিলক্ষিত হয়। এভাবে আধুনিক পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বলুন বা তথাকথিত ধর্মগুলোর কথা বলুন– কোথাও নারীকে তার স্বাভাবিক অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সর্বত্র সবসময় নারীকে ভোগের সামগ্রী এবং পুরুষের সেবাদাসী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

নারীসমাজের সাথে প্রাচীন ও আধুনিক শোষকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে এক জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম নারী ও পুরুষকে মানব অস্তিত্বের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা আর দুটি হাতের মতোই সমগুরুত্বের অধিকারী বলে মনে করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা, সমগুরুত্ব ও সম-অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। শারীরিক ও মানসিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্য ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে কেউ কারো ওপর অন্যায়-অত্যাচার বা শোষণ করতে না পারে।

জীবনের অন্যান্য বিষয়-বিভাগ ও ক্ষেত্রের মতো এ সম্পর্কেও ইসলাম শুধু নীতি নির্ধারণই করেনি; বরং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীসমাজের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তার সকল কার্যকারিতাও প্রমাণ করেছে।

পবিত্র কুরআনে নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, আইনবিধি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ আদেশ রয়েছে। কুরআন শরীফের পূর্ণ একটি সূরার নামই হচ্ছে 'নিসা' অর্থাৎ 'নারিগণ'। এছাড়া কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও নারীসংক্রান্ত আইন-কানুন রয়েছে। এসব কুরআনী আইন ও আদেশে নারীদের যাবতীয় স্বাভাবিক অধিকার ও চাহিদার আলোকে সব রকমের সমস্যাবলির সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান

পেশ করা হয়েছে। নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো বিষয়ই কুরআনের আলোচনা ও বিধিবিধান থেকে বাদ পড়েনি।

ইসলাম ও বিশ্বমানবতার দরদি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের এক একটি আইন-বিধিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন। মহিলাদের অধিকার এবং মর্যাদা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি নিজেই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। প্রিয় নবী ﷺ ব্যক্তিগতভাবেও মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। মহিলাদের জান-মাল ও মর্যাদার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি যে কত বেশি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন তাঁর বাণী ও ভূমিকাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদা দান সম্পর্কিত তাঁর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। বিশেষকরে বিদায় হজের ভাষণে তিনি নারীদের জন্যেও স্থায়ী মুক্তিসনদ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের অন্যায় কর্তৃত্ব, নির্যাতন ও শোষণের হাত থেকে নারীজাতিকে চিরদিনের জন্য মুক্তিদান করেন। তিনি নারীদের সাথে কৃত সব রকমের বিভেদ-বৈষম্যেরও স্থায়ী অবসান করেন। নারীরাও যে আল্লাহর প্রিয়পাত্রী এবং পুরুষের মতোই স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধির মালিক হতে পারে, একথা বিশ্বের মানুষ প্রথমবার প্রিয় নবী ﷺ-এর কাছেই শুনতে পেয়েছে। তিনি স্বামী, পিতা ও সন্তানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঘোষণা করলেন যে "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যে শিক্ষা অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের আয়-উপার্জনের অধিকার দান করেন।

এভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নারী ও পুরুষের অধিকার, মর্যাদা এবং দায়িত্বের স্পষ্ট পন্থা নির্দেশ করে ইসলাম একটি সুখী-সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা কায়েম করে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোথাও কারো গুরুত্বকে অবহেলা করা হয়নি; বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার বন্ধনকে করা হয়েছে মজবুত, স্থিতিশীল ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। আজকের এই জড়বাদী যুগে, যেখানে জীবনের সর্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ, বৈষম্য, ভেদাভেদ আর বিশৃঙ্খলার জয়জয়কার চলছে, সেখানে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন করে

সঠিক সমস্যাবলির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে। বিশেষ করে ইসলামী সমাজব্যবস্থার আলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বিভেদ-বৈষম্য দূর করে দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন, জাতীয় জীবন এবং তার আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বত্র সম-মর্যাদা, সম-অধিকার ও সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে।

এ উদ্দেশ্যে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার এবং ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে মহিলাদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক। এ ব্যাপারে সচেতন ভাই-বোনেরা নিজ নিজ ভূমিকা পালন করবেন– এটাই আমাদের কামনা।

বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রখ্যাত মিশরীয় চিন্তাবিদ জনাব আল-বাহি আল-খাওলি অত্যন্ত যত্নের সাথে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং নারীসংক্রান্ত ইসলামের যাবতীয় আইন-বিধি ব্যাখ্যাসহ পেশ করেছেন।

গ্রন্থটি নারী-সমস্যাসংক্রান্ত ইসলামী নীতি সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তির অপনোদন এবং নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা প্রচারে বিরাট অবদান রাখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

নূরুল হুদা

ভূমিকা

"সীমাহীন প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যার মেহেরবানীতে যাবতীয় মহৎকর্ম সুসম্পন্ন হয় এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যিনি হেদায়াত ও কল্যাণময় পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাবৃন্দ এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করবে– তাঁদের প্রত্যেকের ওপর বর্ষিত হোক রহমত-বরকত, শান্তির অফুরন্ত ধারা।"

উনিশ বছর আগে ১৯৫১ সালে আমি আমার 'আল মারয়াতু বাইনাল বাইতে ওয়াল মুজতামা' গ্রন্থটি লিখি। তাতে আমি বিক্ষিপ্ত সমস্যাবলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি। তার ভূমিকায় আমি আমার দৃষ্টিকোণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলাম। আজ আমি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে 'নারী ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে' পেশ করছি। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তার রচনার উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের গ্রন্থ থেকে আলাদা। পূর্বের গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদান এবং কতিপয় যুবকের সমস্যা ও সংকটের নিরসন করা; কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য যা তার শিরোনামেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে– নারী-সমস্যাসংক্রান্ত মৌলিক সমস্যা ও প্রশ্নাবলির ইসলামী সমাধান পেশ করা।

সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, এর জন্যে এখনো পরিবেশ অনুকূল নয়, কারণ আধুনিক যুগের নারী এখন সবরকমের সেকেলে ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসী এবং পাশ্চাত্য জীবনদর্শনকে তারা নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। ওখানে তারা সব রকমের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত; কিন্তু এখানে তার সম্পর্ক অতীতের সাথে সম্পৃক্ত যা তাদের নৈরাশ্য ও স্থবিরতার দিকে ঠেলে দেয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সমস্যার সমাধানের জন্যে এ ধরনের চিকিৎসা একদম অর্থহীন; বরং আসল কথা এই যে, আমরা যখন নারী-স্বাধীনতা ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করি তখন সেই চিন্তাধারাকে সর্বপ্রথম আমরা নিজেরাই নিজেদের মন থেকে ঝেঁটিয়ে বের করি। আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ওই কথা অস্বীকার করবেন না যে, এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সব রকমের দৃষ্টিকোণ এবং পূর্ব-বৈষম্যমূলক চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরি এবং শুধু

বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করি যে, প্রকৃতির কোন সেই বিধানাবলি ও উদ্দেশ্য রয়েছে যার ভিত্তিতে নারীকে জীবন সংগ্রামে সীমিত দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ যে নারীকে শুধু সৌন্দর্য ও ভোগের জন্যেই সৃষ্টি করেননি তা বলাই বাহুল্য; বরং এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও স্পষ্ট উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা সেই সত্য ও বাস্তবতাকে না মানেন এবং অস্বীকার করেন তাহলে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে আমাদের কাছে একটিমাত্র পথই খোলা আছে, আর তা হচ্ছে এই যে– আমরা নারীত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী সমস্যার আলোচনা করবো– নারীকে পুরুষ ভেবে নয়। বস্তুত এটাই হচ্ছে এ ব্যাপারে আলোচনার স্বাভাবিক পন্থা, এছাড়া অন্য কোনো পন্থাই প্রভাবশালী বা বাস্তবানুগ হতে পারে না। এ ছাড়া অন্য সব মত এবং পথই ভ্রান্ত, বাতিল, বুদ্ধি-বিরুদ্ধ, বাস্তবতাবিমুখ ও যুক্তিহীন হতে বাধ্য।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা সেই স্বাভাবিক পন্থারই অনুসরণ করছি। কারণ প্রকৃতির পথ-নির্দেশনা এবং স্বভাবের অভিমত সব দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য হয় এবং সরাসরি আসল সত্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। সত্যানুসন্ধানীর জন্যে এছাড়া আর কোনো পথই অনুসরণযোগ্য হতে পারে না।

আল বাহি আল-খাওলি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পঞ্চম অধ্যায়

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রথম অধ্যায়

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۱﴾

"হে মানব জাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রাণ থেকেই তার জোড়া বানিয়েছেন এবং দুইজন থেকেই অনেক অনেক পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবি কর। আর আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।" (আল্ কুরআন, সূরা নিসা : ১)

ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারী

আমরা যখন প্রাচীন মানব ইতিহাস এবং তার সভ্যতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করি তখন এমন কয়েকটি তিক্ত তথ্য জানতে পাই, যাতে তাদের সরলতার সাথে সাথে অজ্ঞতা, মূর্খতা, দুঃখ-দুর্দশা, ভীতি, দাম্ভিকতা এবং অন্যের সামনে নিজেকে বড় করে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়। আর যখন হিংস্র বন্য জন্তুদের সাথে লড়াইয়ের যুগ শেষ হয় তখন আমাদের সামনে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়; যাতে রক্তক্ষয়ী, যুদ্ধবিগ্রহ, দস্যুবৃত্তি, চুরি, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অন্যের সম্পত্তিতে জবরদখল বিস্তার, ক্রীতদাস প্রথা এবং শিশু নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনাবলির বিস্তর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। আর এসব দুষ্কর্ম শুধু এ জন্যেই করা হতো যেন অন্য মানুষেরা তার অধীনস্থ হয়ে তার ঘর-বাড়ি, খেত-খামার, গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য বিষয়-আশয়ের দেখাশুনা করে। আমরা এ সম্পর্কে গভীর আলেচনায় না গিয়ে এবং আরো তিক্ত তথ্যাবলির উল্লেখ না করে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, প্রাচীনযুগের মানুষ কি এজন্যে নিন্দার যোগ্য? তারা তো তখন সভ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করেছিল মাত্র। আর সে যুগের অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন, পরস্পরকে অধীনস্থ দাস বানিয়ে রাখার প্রয়োজন কি অপরিহার্য ছিল? এই প্রশ্নটিই আবার

অন্যভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই, যেমন– এক ব্যক্তি তার শক্রুর ওপর আক্রমণ চালাতে অথবা হামলা প্রতিহত করতে বের হয়। সেখানে বিজয়ী অবস্থায় কি তার শত্রুপক্ষের গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধা বা অন্য কোনো দুর্বল মহিলাকে ক্ষমা করবে? আর কোনো বিজয়ী দল কি বিজিত শত্রু-সম্পদ বণ্টনের সময় তার মহিলাদের মুক্তিদান করবে? অথবা এভাবে যদি কোনো গোত্রের যুবকরা একত্রিত হয়ে কোনো যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করে বা কোনো গোত্রের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে অবস্থায় যদি মহিলাদের শরিক না করে তাহলে তাদেরকে নিন্দার যোগ্য মনে করা হবে? তাছাড়া এটাও বিবেচ্য ব্যাপার যে, প্রাচীন যুগীয় মানুষ নিজের কোনো সন্তানের ওপর আনন্দিত হবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছেলের, বা সেই মেয়ের, যে নিজের নিরাপত্তা তো দূরের কথা; বরং যোদ্ধাদের জন্যে এক আলাদা বোঝা বলেই প্রমাণিত হয়? আর যাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই যতসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়? মোটকথা, প্রাচীনতম যুগে নারীর মর্যাদা খর্ব হওয়ার পেছনে দুটি বিরাট কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, নারীদের কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সীমিত ও নির্দিষ্ট ছিল। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল– যুগের দাবি অনুযায়ী নারীর কাজ শুধু এটাই ছিল যে, পুরুষদের মনে নানা রকম কামনা-বাসনার সৃষ্টি করা এবং যুদ্ধের জন্যে তাদের উৎসাহিত করা। জয়ী হলে তাদের প্রশংসা করা এবং বিজয় ও সাফল্যের আবেগময় স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা।

প্রাচীনতম সমাজে মহিলাদের মান ও মর্যাদা নির্ধারণে এ দু'টি কারণ ছিল গভীরভাবে কার্যকরী। পরে যুগের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির সাথে সাথে সরকারি ও প্রশাসনিক আইন-বিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধির জন্য কিছু কিছু নীতি নির্ধারিত হতে থাকে। এসব আইন-বিধি ও নীতিমালার প্রণয়ন ছিল সেই বর্বর যুগের প্রত্যক্ষ চাহিদা। এভাবে রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে এবং জাতি ও গোত্রের মধ্যে কিছু কিছু আইনগত কাঠামো গড়ে ওঠে। এরপর তাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয় এবং এভাবে নারী সামাজিক এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়; এছাড়া যাবতীয় উন্নতি অর্থহীন হয়ে থেকে যায়। ক্রমবিকাশের এই পর্যায়ে নারীর যে সামাজিক অবস্থান ছিল তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা নিচে আলোচনা করবো।

১. চীন সমাজে নারী

চীনে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে লেখেন– "আমাদের নারীদের স্থান হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান এবং এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে

নিকৃষ্ট কর্ম।" তারই এক নীতিকথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে– "নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছু নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোনো দেবতা; কিন্তু মেয়েদের জন্মমুহূর্তেও আনন্দের সানাই বাজে না। যখন তারা বড় হয়ে ওঠে তখন বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় যেন কোনো মানুষ তাকে দেখতে না পায়, আর যখন সে নিজ গৃহ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকে না।"[১]

২. প্রাচীন ভারতে তথা হিন্দু ধর্মে নারী

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেছিল তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দানকারিণী রূপে সৃষ্টি করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামির জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক। (বিশ্ব ইতিহাস–৩৯৪, বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজে আজও নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হয় এবং হিন্দু ধর্মমতে নারীর কোনো অধিকার বা মর্যাদা নেই।) মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, "অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোনো কথা না বলে যা তার জন্য দুঃখজনক হয়, তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাশই হোক না কেন। কেননা, কেবল ওই জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটিমাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না; বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে।"[২]

৩. গ্রিস সভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রিক সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা ছিল না এবং নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রিক

---

[১] 'কিস্‌সাতুল হামারার চীন সভ্যতা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে গৃহীত। পৃষ্ঠা ২৮৩, লেখক– V. V. KANT, অনুবাদ– Mohammad Badran.।

[২] হামারাতুল হিন্দ, পৃষ্ঠা–১৭৯।

দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।[৩]

তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। এ ছাড়া নারীর যদি অন্য কোনো কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে, সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা' এ কথাটি ছিল গ্রিকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালোবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত গ্রিক চিন্তাবিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেন : "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।" এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে; কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয়; বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনের জন্যেই।

৪. রোমান সভ্যতায় নারী

রোমান সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সেই। সব রকমের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই আয়ত্ত্বাধীন ছিল। রোমান সমাজেও নারীর কোনো গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। কোনো রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্মে নেওয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেওয়ার অধিকার ছিল না। রোমান সমাজে অন্য এক ধরনের বিয়ে-শাদীরও প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে 'সর্দারি বিয়ে' বলা হতো। এর মাধ্যমে যেকোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারি বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার ওপর কোনো অভিযোগ আনা হলে

[৩] গ্রিক ইতিহাস–১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা।

তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও রাখতো, যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। এছাড়া কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে, তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্রসন্তান না থাকতো তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।

৫. জাহেলী আরবে নারী

আরবে তো অধিকাংশ লোক তাদের ঘরে মেয়ের জন্ম হওয়ার খবর পেয়ে দস্তুরমতো দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো। এমন এক সমাজে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহই তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম, সেখানে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের এই বিরূপ মনোভাব ছিল স্বাভাবিক, কারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ধকল সইবার ক্ষমতা শুধু পুরুষেরই থাকতে পারে এবং পুরুষের বীরত্বের মাধ্যমেই গোত্রীয় মানমর্যাদা ছিল নির্ভরশীল। রইলো নারীদের ব্যাপার, তারাতো এ ধরনের কোনো কাজেই আসতো না; বরং তারা ছিল শত্রুর লোভনীয় লভ্য বস্তু। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করতো। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্য এক স্থায়ী বোঝা। কারণ সবসময়ে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তাদের মেয়ে শত্রুর অধিকারে যাওয়াটা ছিল গোত্রের জন্যে চরম অবমাননার বিষয়। এতেকরে তাদের মাথা হেঁট হয়ে যেতো। কোনো কোনো গোত্রের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যদি কারো ঘরে মেয়ের জন্ম হতো তখন সে তীব্র মর্মযাতনা অনুভব করে এটা ভাবতো যে, এমন দুঃখজনক ও লজ্জাকর অবস্থার পরও মেয়েটিকে বাঁচতে দেবে, নাকি অপমানের এই প্রতীকটিকে হত্যা অথবা জীবন্ত পুঁতে দেবে! অনেক লোক এই শেষ সিদ্ধান্তটিই কার্যকরী করতো, অর্থাৎ মেয়ে সন্তানটিকে জীবন্ত পুঁতে দিতো। এই নিষ্ঠুর ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "যখন তাদের মধ্যে কাউকে মেয়ে সন্তান হওয়ার সুখবর দেওয়া হতো তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যেতো এবং সে যেন তিক্ত ঢোক গিলে নিতো, লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতো যে, এই দুঃসংবাদের পর কিভাবে কাউকে মুখ দেখাবে। ভাবতে থাকে যে, অপমানের সাথে মেয়েটিকে নাকি মাটিতে পুঁতে দেবে? দেখ; কেমন মন্দ কথা, যা এরা (খোদার ওপর) আরোপ করে।"[৪] আরবে এই প্রথাও ছিল যে, যখন কোনো স্ত্রীর স্বামী মারা যেতো তখন তার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তার পিতার স্ত্রীকে যদি নিজের জন্যে প্রয়োজন মনে করতো তাহলে তার ওপর নিজের জামা ছুঁড়ে মারতো এবং এভাবে সেই বিধবা তার একান্ত মালিকানায় এসে যেতো।

---

[৪] সূরা আন্ -নহল : ৫৮-৫৯।

৬. ইহুদি ধর্মে নারী

ইহুদিরা যদিও এক আসমানি দ্বীনেরই অনুসারী ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যেও একদল বোনকে তার ভাইয়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ইহুদি সমাজে নারীর মান ছিল নিছক সেবিকার সমান। ইহুদি নারীদের তাদের ভাইদের মতো সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অংশ দেওয়া হতো না এবং ইহুদি পিতা তার প্রাপ্ত কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকারও রাখতো।

৭. খ্রিষ্ট ধর্মে নারী

খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তো দু'দুবার নারীদের মান খর্বকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে। অথচ এই খ্রিস্টান পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে দয়া ও স্নেহের অগ্রদূত বলে দাবি করতো। এরাই নারীদের ব্যাপারে তাদের 'পবিত্র গ্রন্থ' থেকে এই বক্তব্যের উল্লেখসহ প্রচার করে যে– "নারীকে লজ্জায় মরে যাবার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে, সে নারী। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো অবমাননার কারণও এই নারী।" নারীদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ধারণাও ঠিক হিন্দুদের মনুর মতো ছিল যে, "নারী হচ্ছে নরকের দরজা এবং পাপের প্রতিমা।" কোনো কোনো খ্রিস্টান পণ্ডিত তো আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে যে, "নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান।" তারা আরো বলেছে– "নারীদের ওপর অভিসম্পাৎ করা অপরিহার্য, কেননা বিপথগামিতার আসল কারণ এটাই।" খ্রিস্টান পণ্ডিতদের আর এক গোষ্ঠীর ধারণা হচ্ছে– "নারী হচ্ছে শয়তানেরই বহিঃপ্রকাশ। শয়তান নারীর বেশ ধরে দৃশ্যমান হয়।" এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার ছিল খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রিদের। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক যে, "নারী কি পুরুষের মতো খোদার উপাসনা করতে পারে?" "নারী কি স্বর্গে যেতে পারবে? নারীর মধ্যে কি মানবিক আত্মা আছে? নাকি তারা ভৌতিক জীবনযাপন করে?" বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এই-ই ছিল নারীর অবস্থান। কোথাও মানবিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না।

৮. বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন ও একদেশদর্শিতামূলক। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করেন। নারীদেরকে তিনি মোহের বাস্তব স্বরূপ ও মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন বলে মনে করতেন। এভাবে তিনি নারীত্ব ও গৃহধর্মের আদর্শকে অবহেলিত ও অবমাননা করেন। বৌদ্ধরা নারী জাতিকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতেন। তাদের সমাজে নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। হিন্দু সমাজের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও মেয়ের জন্ম অলুক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হত। মেয়েরা এত স্বল্প মূল্যের সম্পত্তি

বলে বিবেচিত হত যে, তাদের কোন ভাল নামও রাখা হত না। ক্ষুদ্র পা সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে তখনকার বৌদ্ধ সমাজের প্রবাদ ছিল। এ কারণে তারা মেয়েদের পা শৈশব থেকে বেঁধে রাখত। এর ফলে মেয়েরা ক্ষুদ্র ও কদাকার হতে বাধ্য হত। তারা সব সময় পুরুষের তাঁবেদার হয়ে থাকত। জাপানেও সে সময় কন্যাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করা হত। পিতা কন্যাকে সাময়িকভাবে বেশ্যালয়ে বিক্রয় করতে বা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারতেন। তারা পূজা-অর্চনায় যোগদান বা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করতে পারত না। মন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধরা নারী মর্যাদায় আগ্রহী ছিল না। বরং কিভাবে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা যায় সে ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। রায় দীনেশ চন্দ্র বাহাদুরসহ অনেকেই বৌদ্ধ সমাজে নারীর অবনতির আরো ভয়াবহ চিত্র অংকিত করে গেছেন।

অতীত-ভ্রান্তির সারমর্ম এবং ইসলামের অভিমত

উপরের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি আমাদের সামনে অতীতে সভ্য ও অর্ধসভ্য সমাজসমূহে নারীজাতির নির্মম দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে অবস্থা অনুমান করতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে অতীতের উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ– পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর কোনো মানবিক মান-মর্যাদা ছিল না। নারীর অধিকার আদায়ের কোনো চেষ্টা-সাধনা কিংবা পৃথক কোনো কর্মক্ষেত্রও ছিল না। সামাজিক উন্নয়নে অংশ নেয়ার জন্যে তার কোনো আলাদা ভূমিকা পালনের অবকাশও ছিল না। যেমন উপরে বলা হয়েছে, পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মান এতটা নিকৃষ্ট ছিল যে, তারা নারীর মানবিকতা এবং তার মধ্যে আত্মা আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নকে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। অতীতের পণ্ডিতরা নারীকে আত্মাহীন এক অপবিত্র নোংরা অস্তিত্ব বলে মনে করতো। অধিকাংশ পুরুষই মনে করতো যে, নারীর উপাসনা করা বা সমাজে মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের কোনো অধিকারই নেই । যেমন হিন্দুদের মনুস্মৃতি অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু নারীকে মানবিক মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত বলে মনে করতো। অধিকাংশ পুরুষ তারই মতো ধারণা পোষণ করতো, মনু এবং তার অনুসারীরা নারীকে উপাসনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পরিবারে মেয়ে ও ছেলের মধ্যেকার সমতা বলতে কিছুই ছিল না। চীনা ও আরবি ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু পুরুষরা তো তাদের স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করতো। প্রাচীন অতীতে নারীর কোনো আইনগত মান বা মর্যাদাও ছিল না। তার কোনো রকমের অর্থনৈতিক অধিকারও ছিল না। নারীর কোনো জিনিসের ওপর মালিকানা বা উত্তরাধিকারের

কোনো অংশ ছিল না। নারীর কেনা-বেচা বা ব্যবসা-বাণিজ্যেও অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মোটকথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই নারীর ওপর শোষণ-নির্যাতন চলছিল এবং পুরুষ তার স্বেচ্ছাচারী কর্তা হয়ে থাকতো। রোমান ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, নারীর নারীত্বই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এই নারীত্বই তার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে ছিল যথেষ্ট। অতীতের এসব ভ্রান্তিকে এক কথায় বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে, যেহেতু তারা নারীকে মানুষ বলেই স্বীকার করতো না এজন্যে তারা মানবিক মর্যাদা থেকে নারীকে বঞ্চিত করতো। আর এর পেছনে তাদের সম্ভবত এই যুক্তি ছিল যে, যেহেতু নারী স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল, এজন্যে জীবন-সংগ্রামের ময়দানে সমস্যাবলির মোকাবিলা করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এতক্ষণের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অতীতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর নারীত্বই ছিল নারীর উন্নতি-অগ্রগতির সামনে সবচেয়ে বড় বাধা। নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা সকল সময়ই নারীর অধিকার ও মান-মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই সেই অভিশপ্ত অতীতের সকল শোষণ ও জুলুমের অবসান ঘটে। ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নারীজাতিকে মানবিক উন্নতি-প্রগতির আসল বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং নারীর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, নারী পুরুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ; বরং নারীকে তার নারীত্বের কারণে পুরুষের থেকেও বেশি মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীর স্বভাব-প্রকৃতির আলোকে তার আসল মান নির্ধারণ করে দেয় এবং তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করে দেয়। ইসলাম নারীকে সব রকমের অন্যায় বন্ধন থেকেও মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, সক্ষম, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করে। নারীজাতির যুক্তি-অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের ওপর আলোকপাত করে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী আলোচনার শীর্ষক হবে 'সম অধিকার'। সামনের অধ্যায়ে আমরা নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা, তার মালিকানা-অধিকার, তার অর্থনৈতিক স্বাধিকার, সমাজ সংস্কারে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং নারী হিসেবে তার সাধারণ ব্যবহার ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোকপাত করবো। তার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা নারীর 'বিশেষ অধিকার' শীর্ষক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এতে বিয়ে, তালাক, মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার এবং সংক্ষেপে এও আলোচনা করবো যে, তার অধিকার ও দায়িত্ব কি? আর এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশ কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামে নারী অধিকার

১. নারী-পুরুষে সমঅধিকার

"মো'মেন পুরুষ ও মো'মেনা নারী এরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, (তারা) সততার আদেশ দেয় এবং মন্দের প্রতিরোধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে বিজয়ী ও মহাজ্ঞানী।"[৫]

যখন অন্ধকার অমানিশা সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখন রাসূল ﷺ আরবদেশে উদিত হয়ে আলোকিত করেছেন আরবসমাজ তথা বিশ্বজগৎ। রাসূল ﷺ বলেন– "তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার প্রিয়– সুগন্ধি, নারী ও নামায। নামাযের মধ্যে আমার চোখ জুড়ানো বা আত্মার শান্তি রয়েছে।" রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম নারী জাতিকে মানবতার আলোকে সম্মানিত করেছেন।" রাসূল ﷺ আরো বলেছেন– "পুরুষ যখন স্ত্রী গ্রহণ করে তখন তার অর্ধেক ধর্ম পূর্ণ হয়। অতঃপর বাকী অর্ধেক ধর্ম রক্ষার জন্য আল্লাহকে ভয় করা দরকার।" এজন্য ইসলাম নারীদেরকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে মূল্যায়ন করে। নর যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নারীকেও মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাস, ইচ্ছাবোধ, অনুভূতি, কর্মস্পৃহা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিবেক ও সত্তার দিক থেকে নারী আর পুরুষের মধ্যে কোন বিভেদ করা হয়নি। এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাদের অধিকার ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা হয়েছে।

পৃথিবীতে নারী পুরুষের সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী-পুরুষের একত্ব সম্পর্কে কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী আসলে কোন স্বতন্ত্র জীবসত্তা নয় । নারীও পুরুষের মত মানুষ। যেমন মানুষ হচ্ছে এ পুরুষরা। নারী একই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ধারার বিকাশে সাধিত হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে

---

[৫] আল কুরআন : সূরা তওবা-৭১।

সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।[৬]

পুরুষের মধ্যে যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, নারীর মধ্যেও তাই রয়েছে। মানব সৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য নারী ও পুরুষে বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে তাদেরকে স্বতন্ত্র করার কোন বিধান ইসলামে সংরক্ষণ করা হয়নি। দুনিয়ার সব মানুষ (নর-নারী), সকল কালের, সকল দেশের, সকল জাতের ও সকল বংশের মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি বলে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। এক আল্লাহর সৃষ্টি বলে কোন মানুষ (নর-নারী) অর্থাৎ নর-নারীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা যায় না। দুনিয়ার সব মানুষই একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌন মিলনের ফল হিসেবে সৃষ্ট। দুনিয়ার একমাত্র হযরত ঈসা (আ) ছাড়া এমন কোন পুরুষ নেই, যার সৃষ্টি ও জন্মের ব্যাপারে কোন নরের প্রত্যক্ষ দান নেই কিংবা এমন কোন নারী নেই, যার জন্মের ব্যাপারে কোন পুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ অনুপস্থিত। আবার এমন কোন নারী-পুরুষ নেই, যাদের জন্মের ব্যাপারে নারীর কোন প্রত্যক্ষ অবদান নেই। এ কারণেই নারী-পুরুষ কেউ কারোর ওপর কোন মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউই অপর কাউকে জন্মগত কারণে হীন, নীচ, নগণ্য ও ক্ষুদ্র বলে ঘৃণাও করতে পারে না। মানব দেহের সংগঠন পুরুষের সাথে নারীরও যথেষ্ট অংশ শামিল রয়েছে। এখানে পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে ভ্রুণের সৃষ্টি হয়। কুরআন কারীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী-সাবধানী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[৭] কুরআন কারীমে আরো আয়াত রয়েছে যেগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হবে যে, নারী এবং পুরুষ আসলে এক ও অভিন্ন। শারীরিক গঠনে সামান্য ভিন্ন থাকলে মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, ইচ্ছাবোধ, মানবতাবোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৃষ্টিভংগি, প্রজ্ঞা, বিবেক, ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। নারী-পুরুষের এ অভিন্নতা সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর হোক নারীই, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে আসলে এক অভিন্ন"। নারী পুরুষ যে সর্ববিধ

---

[৬] আল-কুরআন : সূরা আন নিসা : ১।

[৭] সূরা আল হুজুরাত : ১৩।

থেকে সমান, প্রত্যেকেরই যে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা, সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্যে একান্তই অপরিহার্য এবং কেউ কাউকে ছাড়া নয় বা হতে পারে না, তা স্পষ্টভাবে এ ধরনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে কুরআন কারীমে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের যে ব্যবধান রয়েছে তার ভিত্তি মূলত দু'টি। একটি হল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে, দ্বিতীয়টি হল তাকওয়ার ভিত্তিতে। এছাড়া মানুষ হিসেবে নর-নারীর মর্যাদা, সম্মান, ইজ্জত ও অধিকারকে পার্থক্য করা হয়নি বরং এসব বিষয়গুলো নারী আর পুরুষের জন্যে। বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা কর হলো–

ক. জন্মগত সমতা

ইসলামে জন্মগত কারণে নারী-আর পুরুষের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদার সুব্যবস্থা রাখা হয়নি। মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাই পুত্র সন্তান হলে খুশীতে আটখান, আর কন্যা সন্তান হলে মুখ বিষাদের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তা ইসলাম গ্রাহ্য করে না। সুতরাং এ সৃষ্টিগত কারণে নারী আর পুরুষ তথা পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের সমতা করা হয়েছে মর্যাদা, অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। সকলেরই পৃথিবীতে সুন্দর করে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন। অথবা করেন- পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি কন্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[৮] সন্তান হিসেবে কন্যা বা ছেলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

খ. অধিকারের সমতা

নারী আর পুরুষের মধ্যে সম্মান, ইজ্জত, সম্পদ, শিক্ষা অর্জনের অধিকারের ক্ষেত্রে কোন তারতাম্য সৃষ্টি করা হয়নি ইসলামে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে "নারীরা তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তোমরাও নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ।[৯] "তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান

---

[৮] সূরা আশ্ শূরা : ৪৯-৫০।
[৯] সূরা বাকারা : ১৮৭।

করেছেন। তবুও তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অবিশ্বাস করবে?[১০]

মহান আল্লাহর কাছে সত্যবাদী নারী ও পুরুষ সমান। তিনি কাউকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না বা মূল্যায়ন করেন না। তাই তিনি নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন। প্রেম, ভালোবাসা ও পবিত্রতা রক্ষায় নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন– "যাকে চারটি জিনিস দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ বস্তু দান করা হয়েছে– কৃতজ্ঞ আত্মা, যিকরকারী রসনা, বিপদে ধৈর্যধারী শরীর ও বিশ্বস্ত স্ত্রী।" রাসূল ﷺ নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আরো বলেছেন– "পৃথিবীর সব কিছুই সম্পদ। এ সম্পর্কগুলোর মধ্যে নারীই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ"। অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের ওপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে হযরত মরিয়াম (আ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "এবং পুরুষ নারীর সমান নয়"। অর্থাৎ তাকওয়ার ভিত্তিতে অনেক সময় নারীও পুরুষদের ওপরে গিয়ে মর্যাদায় আসীন হতে পারে। সব পুরুষ সব নারীর সমান নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষ আরো নিম্নমানের আছে। এ অধিকারের ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১১] তাই রাসূল ﷺ বলেছেন "নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর।"

গ. কর্তব্যবোধের সমতা

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সমান। দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা হয়নি। যার যার দায়িত্ব পালনের অগ্রাধিকার সকলের সমভাবে রয়েছে। কুরআন কারীমে এ দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে।"[১২]

এখানে পুরুষকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার জন্য তাকে দায়ী করা হবে, আর নারীকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে। নর বা নারীই হোক কারো কর্মকে আল্লাহ বিফল করেন না; বরং আল্লাহর কাছে নর ও নারী সমান। কুরআন

---

[১০] আন্ নাহল : ৭২।

[১১] সূরা আল বাকারা : ২২৮।

[১২] সূরা আল মুদ্দাসসির : ৩৮।

কারীমে বলা হয়েছে– "অতঃপর আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর বা নারীর কর্মকে বিফল করি না, তোমরা একে অপরের সমান-------।"[১৩] নর-নারী হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমে উভয়ই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে এবং এ সুন্দর কাজের জন্য পুরস্কারও সমভাবে অর্জন করার সুযোগ ইসলামে দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব"।[১৪] সুতরাং দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে পুরুষকে কম, আর নারীকে বেশী দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। তবে সৃষ্টিগত কারণে পুরুষ, আর নারীর দায়িত্বের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা হয়নি। মহান আল্লাহ যে ইবাদতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন তা সুষ্ঠুভাবে পালন ও বাস্তবায়ন এবং সে মোতাবেক জীবন গঠনের ক্ষেত্রে যে অধিকার রয়েছে তা কোন পুরুষ হরণ করতে পারে না। বরং এ দায়িত্ববোধের জন্যে নর-নারী উভয়কে দায়ী করা হবে। অতএব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নর ও নারীর সমতা রয়েছে।

ঘ. তাকওয়ার সমতা

মহান আল্লাহ ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। যে নর বা নারী আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বলেন– নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্ম সমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাংগ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাংগ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের সকলে জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহান প্রতিদান রেখেছেন।[১৫] এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর বিশ্বাসী, অনুগত, সত্যবাদিতা, ধৈর্যশীল, দানশীল, রোযা পালনকারী, যৌনাংগ, যিকিরকারী সকল নারী ও পুরুষ সমভাবে আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত হবে এবং সমভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে মহা প্রতিদান অর্জন করবে। এখানে তো মহান আল্লাহ তা'আলা সুন্দর ও ভাল

---

[১৩] সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।

[১৪] সূরা আন নাহাল : ৯৭, সূরা আন নিসা : ১২৪।

[১৫] সূরা আল বাকারা : ৩৩-৩৫।

কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্যে আলাদা কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আল্লাহর কাছে নারী-পুরুষ তাকওয়া অর্জনকারী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহর আইন অমান্য করার কারণে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে একত্রে শাস্তি হিসেবে বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখানে দুজনকেই সমভাবে শাস্তি ভোগ করে বেহেশত ছেড়ে পৃথিবীতে আবাসস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে আরো বলা হয়েছে– "ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ সৎ কর্ম সম্পাদন করবে, পুরুষ হউক বা নারী হউক, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার তাদেরকে দিব।[১৬] কুরআন কারীমে আরো বলা হয়েছে– "ঈমানদার নর-নারী পরস্পর বন্ধু। তারা সৎ কার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্য প্রতিরোধ করে, যথাযথভাবে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল ﷺ-কে আনুগত্য করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১৭] এভাবে তাকওয়া অর্জনের জন্যে নর-নারী উভয় সমান দাবীদার এবং নর-নারী উভয়কেই চরিত্রবান ও সংযমী হওয়ার জন্যে ইসলামে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে নর-নারী উভয়ে আহ্বান করার অধিকার অর্জন করেছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান, রিসালাত, ফিরিশতা, আখেরাত, আমল, সৎ কাজ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নর-নারীর উভয়ের রয়েছে এবং এ দায়িত্ববোধ সঠিকভাবে পালনের জন্যে সমভাবে পুরস্কার অর্জনের অধিকার রয়েছে এবং ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করার ক্ষেত্রে উভয়কে করা হবে। এখানে কোনভাবে পুরুষদের আলাদা বা নারীদের আলাদা অধিকার বা সুযোগ প্রদান করা হয়নি। নর-নারী উভয়ের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকল স্তরে সকল অবস্থায় তাকওয়া অর্জন করা। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "হে লোকসকল! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" নর-নারীর ক্ষেত্রে তাকওয়া বিধান সমভাবে প্রযোজ্য। এরা মহান আল্লাহর বন্ধু। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, "তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহর বন্ধু।" সুতরাং মানুষ হিসেবে নর-নারীর দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, তাকওয়া অর্জন, ঈমানকে সুসংহত করা, সমাজে শান্তি আনয়নের কার্যকারিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয়ের মর্যাদা ও অধিকার সমান।

---

[১৬] আন্ নাহল : ১৭।
[১৭] সূরা আত্ তাওবা : ৭১।

ঙ. প্রয়োজনীয়তার সমতা

নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তা তার চাহিদা, রুচি, দৃষ্টিভংগি, সুপ্রবৃত্তি, বিবেক, পরিবেশ প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। এসবের কারণে নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কিছুটা অমিল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু মানুষ হিসেবে কতগুলো অনিবার্য বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে। যেমন– ১. বেঁচে থাকার পরিবেশ ও উপাদান, ২. অন্ন, ৩. বস্ত্র, ৪. বাসস্থান, ৫. চিকিৎসা, ৬. শিক্ষা, ৭. ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, ৮. যৌনসুখ উপভোগ, ৯. উত্তম আচরণের বিকাশ সাধন, ১০. পারস্পরিক আচরণে সুসম্পর্ক স্থাপন, ১১. মহানুভবতা, ১২. সুপ্রবৃত্তি অর্জন, ১৩. কুপ্রবৃত্তি দমন, ১৪. ধর্মীয় অনুশাসন, ১৫. সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ১৬. বিবেক ও মেধার বিকাশ, ১৭. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, ১৮. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়াশীল। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।

চ. শাস্তির ক্ষেত্রে সমতা

যে পুরুষ বা যে নারী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করে না তাদের আবাস দোজখে। আবার যারা মুসলমান হয়েও অপরাধ করে থাকে তাদের জন্যও যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তার ক্ষেত্রে নারীদের জন্যে বিশেষ কঠিন কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। অপরাধী হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান এবং উভয়েই সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। নারী হোক, বা পুরুষই হোক অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের শাস্তি সমান। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "যারা অবিশ্বাস করবে ও আল্লাহর আয়াতসমূহে অসত্যারোপ করবে তাদেরকে সর্বদা দোজখে রাখা হবে।[১৮]

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করে না তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।[১৯]

কোন পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাদের জন্যে একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহ তাআলার বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভুত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে ও পারকালে বিশ্বাসী হও।"[২০]

---

[১৮] সূরা বাকারা : ৩৯।
[১৯] সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৭।
[২০] সূরা আন নূর : আয়াত-২।

আবার একজন পুরুষ বা নারী চুরি করলে উভয়ের জন্য একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২১]

এ শাস্তির বিধান করার উদ্দেশ্য চুরি বা ব্যভিচারি বা ব্যভিচারিণীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। দু'জনকে আবার একত্রে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "ঈমানদার পুরুষদেরকে আপনি বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গ সাবধানে সংযত রাখে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। ঈমানদারদেরকে বলে দিন, তার যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ করে থাকে, তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।[২২]

নারী আর পুরুষদেরকে সমভাবে শাস্তির বিধান থেকে রক্ষা করার জন্যে উত্তম জীবন গঠনের জন্যে সমভাবে মহান আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন। যারা বভিচারী বা ব্যভিচারিণী তাদের জন্যে বিশ্বাসী পুরুষ বা বিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে বিধানের সমতা রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "ব্যভিচারী অবশ্যই ব্যভিচারীগণ বা অংশীবাদিনী ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিণী অবশ্যই ব্যভিচারী বা অংশীবাদী ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং এবং এটা (ব্যভিচার) বিশ্বাসীদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে।[২৩]

ছ. ইবাদতের ক্ষেত্রে সমতা

সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানব সমাজের প্রতি সুন্দর জীবন গঠনের নির্দেশ জারী করেছেন। সূরা যারিয়ার ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।" এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নর-

---

[২১] সূরা আল মায়িদা : আয়াত-৩৮।
[২২] সূরা আন নূর : আয়াত-৩০-৩১।
[২৩] সূরা আন নূর : আয়াত-৩।

নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কোন পুরুষ তার ইবাদত করার অধিকারকে হরণ করতে পারে না বা এ বিষয়ে কোন বাধা দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অর্থাৎ তাদেরকে সমতার বিধানে আবদ্ধ করা হয়েছে।

জ. ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সমতা

নরের ন্যায় একজন নারীকেও কালেমা বিশ্বাসের মাধ্যমে তার ঈমান ও আমলকে সুসংহত করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঈমানের আরকান হল সাতটি। তাওহীদে বিশ্বাসের পরেই বাকী ৬টির প্রতি ঈমান আনাও নারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে– "শুধু পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নেই। প্রকৃতপক্ষে নেকী হল, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আসমানী কিতাবের ওপর এবং নবীদের ওপর।[২৪]

সুতরাং ঈমান আনয়নের পরই নারীকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এছাড়া প্রতিটি নারীকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে, চাকর-চাকরাণিদের সাথে, শিশুদের সাথে, বড়দের সাথে ইসলামের আলোকে আচরণ ও তাদের অধিকার আদায় করতে হয়। এভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান নরের ন্যায় নারীও পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশীল, কল্যাণময়ী জীবন গঠন করার তাগিদ কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয়েছে। নারী নারীর জন্য, আবার পুরুষ পুরুষের জন্য– এ দৃষ্টিভংগিতে কেউ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবে না; আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। ঈমানের পরই ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন তথা আমলের মাধ্যমে নারীও অনেক সময় নরকে পেছনে ফেলে আল্লাহর নৈকট্য সহজেই অর্জন করতে পারে। আল্লাহর কাছে তাকওয়াই বড় বিষয়, নর বা নারী নয়। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন– তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।[২৫] এভাবে ঈমান ও বিশ্বাসের দিকে নর-নারীকে অধিকার সমান রেখেছেন।

---

[২৪] আয়াত-১৭৭।

[২৫] সূরা আল মূলক, আয়াত-১-২।

ঝ. বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা

বিয়ের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী (নর ও নারী) দু'জনে মিলেই পরিবারের সূচনা করে। সূরা রাদের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তোমাদের এমন সব ছেলে মেয়েদের বিয়ে দাও এবং বিয়ে দাও তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য।" একজন নর ও একজন নারী বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের অধিকার যৌথভাবে রয়েছে। নর ও নারীর দুজনারই যৌন চাহিদা রয়েছে। এ যৌন কামনা ভোগ করার অধিকার দু'জনেরই সমান। তাই বিয়ের মাধ্যমে এ যৌন ক্ষুধাকে উপশম করার জন্য বিয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "এ ছাড়া যত নারী আছে, নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে তাদের হাসিল করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে– যদি বিয়ের দুর্গ তাদের সুরক্ষিত করো এবং মুক্ত যৌন কামনা চরিতার্থে উদ্যত না হও।[২৬]

আল্লাহ তা'আলা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন যৌন কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"[২৭]

আল্লাহ তায়ালা যত নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন সকলে বিয়ে করেছেন। এটি হল তাঁদের স্থায়ী সুন্নত। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "আপনার পূর্বেও আমি অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যও স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।"[২৮]

রাসূল ﷺ বলেছেন– "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য রয়েছে তাদের বিয়ে করা উচিত।" কারণ, চক্ষুদ্বয়কে কুদৃষ্টি হতে রক্ষা ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করতে বিয়ে উত্তম পন্থা। তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা যৌন কামনা দমন করে।[২৯]

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি বিবাহিত? উত্তরে আমি বললাম, না। তিনি বললেন– বিয়ে করুন। কারণ এ উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর সর্বাধিক সংখ্যক স্ত্রী আছে।"[৩০]

---

[২৬] সূরা নিসা, আয়াত-২৪।
[২৭] সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত-৪৯।
[২৮] সূরা আর-রা'দ, আয়াত-৬৮।
[২৯] শাহ ওলীউল্লাহ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড ঃ পৃ. ৩০১।
[৩০] বুখারী।

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন– বিয়ে আমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের ওপর আমল করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে নয়।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল ﷺ-এর এ বাণী বর্ণনা করেছেন– "কুমারিত্ব ও অবিবাহিত নিঃসংগ জীবন যাপনের কোন নিয়ম ইসলামে নেই।" হযরত আয়েশা (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল– "রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, বিয়ে করা আমার আদর্শ ও স্থায়ী নীতি, যে লোক আমার এ সুন্নত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

বিয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে এক কথায় বলা যায় যে, নর ও নারীর উভয়ের বিয়ে করার অধিকার রয়েছে। এখানে দুজন দুজনকে দেখেই পছন্দ করারও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। নারী যেমন বরকে স্বচক্ষে দেখে পছন্দ করে মতামত দেয়ার অধিকার রয়েছে, সেরূপ অধিকার রয়েছে পুরুষেরও। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "অনন্তর তোমরা বিয়ে কর যেসব মেয়ে লোক তোমাদের জন্য ভাল হবে ও ভাল লাগবে।" বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পূর্ণ হালাল। রাসূল ﷺ বলেছেন– তোমাদের কাছে কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে, তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু দেখে নেয়া উচিত যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে।[৩১]

হযরত মুগীরা (র) বিয়ে প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেছেন– "কনেটিকে দেখে নাও। এটা তোমাদের মাঝে স্থায়ী সম্প্রীতি সৃষ্টির সহায়ক হবে।[৩২]

পুরুষদের যেমন কনে বাছাই করার অধিকার রয়েছে, সেই অধিকার নারীদেরও রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "বিধবার বিয়ে তার স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া হতে পারে না। আর কুমারীর অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! তার সম্মতি কিভাবে জানা যাবে? তিনি বললেন– "তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।[৩৩]

সুতরাং দেখা যায় কনেও পুরুষকে পছন্দ করে তার মতামত প্রদান করবে। পিতা কন্যার অনুমতি ছাড়াই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছেন এমন বিয়ে রাসূল ﷺ ভেঙ্গে দিয়েছেন, নতুবা ভাঙ্গা বা রাখার ইখতিয়ার কন্যাকে দান করেছেন। নাসায়ী শরীফে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে– "এক ব্যক্তি তার কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিয়ে দেন। বিয়ের পর মেয়েটি রাসূল ﷺ-এর কাছে সে অভিযোগ দায়ের করে। তিনি তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেন। এভাবে ইসলাম নর ও নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

---

[৩১] আবু দাউদ।
[৩২] তিরমিযী।
[৩৩] বুখারী, মুসলিম।

ঞ. ভালোবাসার সমতা

বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে নর নারীকে, নারী নরকে ভালোবাসার আদান প্রদানের মাধ্যমে পরিবারকে সুসংহত করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নর-নারীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি সৃষ্টি করা। ইসলাম উভয়ের প্রতি এমন কতগুলো নির্দেশ দান করেছে যাতে করে নর নারীকে, নারী নরকে ভালোবাসতে পারে। প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসায় ভরে উঠতে পারে তাদের পরিবার। সুখীময় হতে পারে তাদের দাম্পত্য জীবন। স্বামী আর স্ত্রী যদি দুনিয়াতে পরম সুখ-ভালোবাসায় এবং ঈমান ও আমল করে দিন অতিবাহিত করতে পারে তাহলে তারা পরকালীন জীবন বেহেশতেও অর্জন করতে পারবে। সেখানে নর ও নারীকে এ অধিকার প্রদান করা হবে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে বানিয়ে দেবো কুমারী। স্বামীদের প্রতি আসক্ত আর বয়সে সমকক্ষ।[৩৪]

উভয়ে যখন মুত্তাকী হবে, পরহেযগারিতা অর্জন করবে তখন তারা জান্নাতের পরস্পর বন্ধনে পরিণত হবে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– "দুনিয়ায় যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল, পরকালে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকীরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবে।[৩৫]

নর ও নারীকে সংসার সুখের জন্য, ভালোবাসা অর্জনের জন্য, সুখ, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য উভয়ের প্রতি উভয়ের কতিপয় দায়িত্ব রয়েছে যা পালন করলে পরিবারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করতে পারে। ভালোবাসা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার রয়েছে।

ঠ. উপহার বিনিময়ের সমতা

নর ও নারীর মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা গভীর করার জন্য উভয়কে উভয়ের প্রতি উপহার বিনিময় করার জন্যে ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে মাঝে মধ্যে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি উপহার দেয়া। তদ্রূপ স্ত্রীরও সে দায়িত্ব রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন– "তোমরা পরস্পর উপহার উপঢৌকনের আদান-প্রদান করো, দেখবে এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে– পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।" অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে– "তোমরা পরস্পরে হাদিয়া তোহফার আদান

---

[৩৪] সূরা আল-ওয়াক্বিয়া, আয়াত-৩৭।

[৩৫] সূরা যুখরুক : আয়াত-৬৭।

প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া তোহফা দিলের ক্লেদ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়।" দাম্পত্য জীবনের সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার জন্য রাসূল ﷺ এভাবে নর ও নারীকে উপহার বিনিময়ের অধিকার প্রদান করেছেন।

ড. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ক্ষেত্রে সমতা

নর ও নারীর মধ্যে মন মালিন্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি ধৈর্য অবলম্বন করা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, কোন অপরাধ করলে তা ক্ষমা করে দেয়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে সুখীময় করার লক্ষ্যে এ বিধানের প্রবর্তন। কুরআনে বলা হয়েছে– "তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালোভাবে ব্যবহার কর ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করেছ, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দিবেন।" রাসূল ﷺ বলেছেন– "কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম নারীকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে।" এভাবে স্ত্রীদেরকে সামান্য অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে সংসারে সুখ বিরাজ রাখা স্বামীর প্রধান দায়িত্ব। কুরআনে বলা হয়েছে– "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান। তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের ওপর বেশি চাপ প্রয়োগ না কর বা জোর জবরদস্তি না কর এবং তাদের দোষ ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে আল্লাহ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" রাসূল ﷺ এভাবে স্ত্রীদের প্রতি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার বিধান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে আদর্শ স্বামী হয়েছিলেন এবং স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে অগাধ ভালোবাসার মাধ্যমে সুখী রেখেছেন। নর ও নারীকে এভাবে ক্ষমা অথবা পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে সুখ-শান্তিতে ভরে দিতে পারে।

ঢ. পরামর্শের ক্ষেত্রে সমতা

পরিবারের যে কোন বিষয়ে একক সিদ্ধান্তের কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম কখনো পরিবারের বিবাদকে সমর্থন করে না। তাই নর ও নারী উভয়ে উভয়ের সাথে যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া আদর্শ পরিবারের জন্য অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এভাবে যে কোন কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে করা হলে সেখানে দাম্পত্য জীবনে কলহ বা বিবাদের পরিবর্তে সুখ ও শান্তি তথা ভালোবাসা বিরাজ করতে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে– স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশুসন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।" যে কোন

বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলে পরিবারের স্বৈরাচারী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তির কারণে সাহাবিদের পক্ষে তওয়াফ করা সম্ভব হয়নি। এ সময় রাসূল তাদেরকে এ জায়গাতে কুরবানী দেয়ার আদেশ দিলেন, কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। রাসূল অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে পরামর্শ নিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রথমে কুরবানী দেয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করার পরামর্শ দিলেন। রাসূল সে পরামর্শ মোতাবেক কাজ শুরু করলে সাহাবীগণ তাকে অনুসরণ করলেন এবং সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করলে পরিবারের কল্যাণ লাভ করা যায়। আবার স্ত্রীরও পরিবারের যে কোন কাজের ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ন. ইবাদতে পরস্পরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সমতা

আল্লাহর দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে নর ও নারী (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পরকে উৎসাহ প্রদান, সাহায্য করা, সহযোগিতা করা ইসলামে বৈধ একটি ব্যবস্থা। শরীয়ত মোতাবেক জীবন গঠন, শিশুদের শিক্ষা, চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করার যে অধিকার রয়েছে তা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। রাসূল বলেছেন– আল্লাহ যে পুরুষকে রহমত দান করবেন, সে রাতের বেলা জেগে উঠে নামাজ পড়বে এবং তার স্ত্রীকেও সে জন্য সজাগ করবে। স্ত্রী ঘুম ছেড়ে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন– "পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে রাতের বেলা জাগাবে এবং দু'জনেই নামাজ পড়বে– আলাদা আলাদাভাবে এবং দু'রাকাত নামাজ একত্রে পড়বে। আল্লাহ এ স্বামী স্ত্রীকে আল্লাহ ফিকরকারী পুরুষ-নারীদের মধ্যে গণ্য করবেন।" এভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে সার্বিক সহযোগিতা করা ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ত. দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমতা

দাম্পত্য জীবনকে সুখীময় করার লক্ষ্যে ইসলাম স্বামীদের প্রতি কতগুলো দায়িত্ব প্রদান করেছে এবং স্ত্রীদের প্রতিও কতিপয় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে যা উভয়ে পালন করলে ঐ সংসারে কোন বিবাদ সৃষ্টি না হয়ে সুখ ও শান্তি তথা কল্যাণ অর্জিত হবে। একজনকে অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আরেকজনকে দায়িত্বই দেয়া হয়নি, এরকম বিধান ইসলামে নেই। এখানে স্বামী ও স্ত্রীর যে দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে–

স্বামীর দায়িত্ব : প্রথমে স্বামীর দায়িত্ব হল স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তার অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। স্ত্রীদের সাথে কোন কঠোর আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে ইসলামে। রাসূল ﷺ বলেছেন– মেয়ে লোক পাজরের হাড্ডির ন্যায়। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, ভেংগে যাবে। আর যদি ব্যবহার করতে চাও তা হলে এ অবস্থাতে ব্যবহার করবে।[৩৬]

স্ত্রীকে কোন অবস্থায় অপ্রস্তুত করা যাবে না। হযরত জাবির (রা) বলেছেন– "আমরা এক যুদ্ধে রাসূলে করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। পরে যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করল। রাসূল ﷺ তখন বললেন– "কিছুটা অবসর দাও। রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। এ অবসরে তোমাদের স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা করে নেবে, গোপন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করবে এবং তোমাদের গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারবে।" এভাবে তাদেরকে সময় দিতে হবে স্বামীর জন্য প্রস্তুতি নিতে।" স্ত্রীদের ওপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, উপহাস, বিদ্রূপ করা, ধর্ষণ করা স্বামী হিসেবে নরের জন্য নিষিদ্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে– তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। "আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলার বস্তুতে পরিণত করো না।" স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করা আল্লাহর নির্দেশ। রাসূল ﷺ বলেছেন– "তোমার স্ত্রী-অঙ্গশায়িনীকে এমন নির্মমভাবে মারধর করো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।" স্ত্রীদেরকে মারধর করা, গালিগালাজ করা এবং তাদের সাথে কোনরূপ অন্যায়-জুলুম জাতীয় আচরণ করাকে নিষেধ করে রাসূল ﷺ বলেছেন– "তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধর করো না এবং তাদের মুখমণ্ডলকেও কুশ্রী ও কদাকার করে দিও না।" কুরআনে বলা হয়েছে– "আর যেসব স্ত্রীলোকের আনুগত্যহীনতা ও বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমরা ভয় কর তাদের তোমরা সদুপদেশ দিয়ে ভাল করে বুঝাবে। (এতেও যদি বিনয়ী না হয় তাহলে পরবর্তীতে) মিলন শয্যা থেকে দূরে রাখ। (তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে তাদের মারো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তোমাদের সাথে অসদাচরণের কোন পথ তালাশ করো না।[৩৭]

---

[৩৬] বুখারী।
[৩৭] সূরা নিসা : আয়াত-৩৩।

এজন্য স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহারের নির্দেশ ইসলামে দেয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে খুব ভালো ব্যবহার কর।" স্বামীকে সবসময় স্ত্রীর রোগ শোক ও বিপদ-আপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করা ইসলামের নির্দেশ। রাসূল ﷺ বলেছেন– "যে নিজে অন্যের ওপর দয়াপরবশ হয় না, সে কখনো অন্যের দয়া ও সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।" সুতরাং স্বামীদেরকে স্ত্রীদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রীর গোপন কথা স্বামীদেরকে প্রকাশ করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা তার দায়িত্ব। রাসূল ﷺ বলেছেন– "যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও যে স্ত্রী মিলিত হয় স্বামীর সঙ্গে, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রচার করে সে স্বামী আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"[৩৮]

এভাবে স্বামীদের কর্তব্য হচ্ছে কথায় ও কাজে স্ত্রীকে আনন্দ দান করা, নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে যেতে দেওয়া, স্ত্রীদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ না হওয়া, স্ত্রীকে খাটো না করা বা খোটা না দেয়া। দাম্পত্য জীবনে সুখ ও ভালোবাসা রক্ষার্থে স্বামীদেরকে এসব দায়িত্ব পালন করার বিধান ইসলামে প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়া খুব সহজ হয় এবং সংসারও সুখের হয়।

স্ত্রীর দায়িত্ব : স্বামীর প্রতি যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করলেই যে সচরাচর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এরূপ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। স্ত্রীদের প্রতি যেসব দায়িত্ব দেয়া আছে তাও তাকে পালন করা জরুরী। যখন নর ও নারী হিসেবে দুজনেই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবে তখন নর-নারীর মধ্যে অধিকার, মর্যাদা ও বৈষম্য থাকতে পারে না। স্ত্রীরা হলো স্বামীর ঘরের রাণী। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে "নারী তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী।" স্বামীর খেদমত করা, গোপন কথা প্রকাশ না করা, আনুগত্য থাকা, পরামর্শ গ্রহণ করা, উপঢৌকন প্রদান করা, হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা করা, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, যৌন মিলনের কামনা পূরণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব। ইবনে মাজায় উল্লেখ আছে– "আর স্ত্রীর প্রতি যখন স্বামী দৃষ্টিপাত করে তখন স্ত্রী তাকে আনন্দিত করে দেয়।"

সুখীময় দাম্পত্য জীবন, সুখ, শান্তি ও কল্যাণ ভোগের অধিকার নর ও নারী হিসেবে স্বামী ও স্ত্রীর সমভাব রয়েছে। এজন্য দুজনার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার জরুরী। ঈমান ও আমলের দিক থেকে স্বামী ও

---

[৩৮] মুসলিম।

স্ত্রীকে অত্যন্ত তাকওয়া অর্জন করাও দরকার। তাহলে স্বামী স্ত্রীর অধিকারে ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আর কোন বৈষম্য থাকবে না এবং নারীও নরের মত মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামের বিধান পালনের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এছাড়া ঈমান, বিশ্বাস, আকীদা, আমল, জ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইচ্ছাবোধ, প্রজ্ঞা, সজ্ঞা, বিবেক বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে নর ও নারীর মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয়নি। মৌলিক অধিকার, যৌন অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, বিয়ে করার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, জান, মাল, ইজ্জত নিরাপত্তার অধিকার, মতামত জ্ঞাপনের অধিকার, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ভালোবাসার অধিকার এবং স্বামীকে ভালোবাসা প্রদানের অধিকার, এগুলোর ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ হিসেবে নর ও নারীর মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য বা মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে তা বাস্তবায়ন বা ভোগ করার ক্ষেত্রে অধিকারের তারতম্য হয় না। তবে শারীরিকভাবে নর ও নারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ সৃষ্টিগত কারণে কর্মক্ষেত্রেরও পার্থক্য রয়েছে। তবে তাকওয়ার ক্ষেত্রে নর বা নারী হিসেবে কোন পার্থক্য নেই। তবে তাকওয়ার মানদণ্ডের ক্ষেত্রে নরের মধ্যে নরের, আবার নারীর মধ্যে নারীর, আবার নরের মধ্যে নারীর, আবার নারীর মধ্যে নরের পার্থক্য হতে পারে। শারীরিক তারতম্যের কারণে পুরুষদের কতিপয় অধিকার তৈরি হয়েছে নারীদের ওপর, আরব নারীদের কতিপয় অধিকার অর্জিত হয়েছে নরদের ওপর। নারী ও পুরুষের শারীরিক তারতম্য সম্পর্কে আলোচনা করার পর পুরুষদের অধিকার ও নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে আলোচনা করা হল।

২. ইসলামে নারীর মানবাধিকার

আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, অতীতের অনেক সভ্য সমাজেও তা ধর্মভিত্তিক হোক বা ধর্মহীন নির্বিশেষে নারীকে মানুষ বলে স্বীকার করা হবে কি না তা দস্তুর মতো তর্ক-বিতর্কের বিষয় ছিল। তারা এ ধরনের প্রশ্ন তুলতো যে, নারীও কি পুরুষের মতো উপাসনা করতে পারে? নারীও কি পুরুষের মতো পরকালীন জীবনে প্রবেশ করবে? একটি বিষয়ে তাদের মতৈক্য ছিল যে, নারী হচ্ছে এক অপবিত্র জীব। একে শুধু পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জনের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধরনের আরও অনেক অর্থহীন ও নোংরা ধারণার শিকারে পরিণত ছিল প্রাচীন পৃথিবীর পুরুষ সম্প্রদায়। এমন অমানবিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ যখন চরম সীমায় পৌঁছায় তখনই নারী তথা সমগ্র নির্যাতিত

মানবতার চিরমুক্তির পয়গাম নিয়ে দুনিয়ার বুকে ইসলামের শুভাগমন ঘটে। ইসলাম প্রথমেই নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে, তার পূর্ণ মানবিক অধিকার বহাল করে এবং নারীকে এত বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় যে, অন্যান্যরা তো রইলোই স্বয়ং সাহাবারা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। নারীজাতিকে হাজার হাজার বছরের শোষণ-নির্যাতন, অবিচার-বঞ্চনা ও অত্যাচার-অধীনতার নির্মম নাগপাশ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে ইসলামের এসব ঘোষণা ও ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। ইসলাম নারীর পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধিকার দিয়ে তাকে পুরুষের বরাবর অধিকার ও ক্ষমতা দান করে। এভাবে নারীকে শতাব্দীর নিষ্ঠুর শোষণের অক্টোপাশ থেকে স্বাধীন করে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুরুত্ব বহাল করে। এর চেয়েও বড় কথা, ইসলাম নারীকে সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশীদার গণ্য করে তার ওপর সমাজ সংস্কারের দায়িত্বও অর্পণ করে। তার কর্মক্ষেত্র ও তার ভূমিকা পালনে সীমা নির্ধারণও করে দেয়। নারী সমাজ যাতে তাদের উন্নত মর্যাদা বুঝে নিয়ে যথার্থ পথে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের হীনম্মন্যতা, পুরানো বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে তার জন্যে ইসলাম সঠিক ও বাস্তবানুগ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। এভাবে ইসলাম নারীকে সকল দিক ও বিভাগে পুরুষের সমমানে উন্নীত করে। কোনো ক্ষেত্রেই তাকে পুরুষের অধীনে বা পেছনে রাখা হয়নি। বলাবাহুল্য, নারীর অধিকার ও মর্যাদা পুনর্বহালের সাথে সাথে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যও পুরুষের সমান করে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত থেকেই নারী- পুরুষের সমতার বিধান স্পষ্ট হয়ে যায়– "মোমেন পুরুষ ও মোমেনা নারী, – এরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, (তারা) সততার আদেশ দেয় এবং মন্দের প্রতিরোধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।"[৩৯]

ইসলাম ওসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুরুষের সাথে সাথে নারীকে শামিল করে নিয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়কে এমনভাবে সমন্বিত করে দেওয়া হয়েছে যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উভয়ই হচ্ছে একই সত্যের দুটি রূপ ও নামমাত্র। আর এই উভয় সত্ত্বাকে পরস্পর মিলিয়ে রাখার জন্যে দুটি মজবুত ও স্থায়ী বুনিয়াদও সরবরাহ করেছে। (১) ঔরসজাত সম্পর্কের ভিত্তি । (২) মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি। এই উভয় বুনিয়াদের মধ্যে নারী ও পুরুষের স্থান ও মান সম্পূর্ণরূপে একই। পবিত্র কুরআনে এই উভয় সম্পর্কের বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– "হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী

---

[৩৯] সূরা তওবা : ৭১।

থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের জাতি ও গোত্র বানিয়েছি যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান সে-ই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।[৪০] এই পবিত্র আয়াতে পুরোপুরি বিশ্বমানবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে – তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ এক মাতা এবং এক পিতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। সামগ্রিকভাবে নারী-পুরুষ পরস্পর ভাইবোন। কারণ দুনিয়ার সব মানুষ একই আদি পিতার সন্তান। এদিক থেকে সব মানুষ পরস্পর আপন ভাই-বোনের মতোই। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইঙ্গিত করে বলেছেন– "নারী পুরুষের সঙ্গে সম-সম্পর্কযুক্ত।" বলাবাহুল্য, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব যখন একই তখন তাদের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। কেননা ছেলে-মেয়ে উভয়ই মাতা-পিতার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে সমান গুরুত্বের অধিকারী। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কেউ কারও চেয়ে বড়-ছোট নয়। কারও মর্যাদা কারও চেয়ে বেশি বা কম নয়। নারী কোনো ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে মানবিকতার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মতোই সমমানের মানুষ। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন– "হে মানবজাতি! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার জোড়া বানিয়েছেন এবং সেই দু'জন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের অধিকার দাবি কর এবং আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ককে নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।"[৪১] এই আয়াত সম্পর্ক আমরা তিনটি বিষয় বিশ্লেষণ করবো : (১) এই আয়াতে তাকওয়া বা খোদাভীরুতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর আগের আয়াতে লোকদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে তাদের সৃষ্টি করেছেন। 'তাকওয়া' বা খোদাভীরুতা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক গুণ। মানুষের ঔরসজাত সম্পর্ক বা অন্য কোনো মানবিক সম্পর্কের সাথে এর কোনো রকম মিল নেই। মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তারই ভিত্তিতে তাদেরকে খোদাভীরুতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের সমষ্টিকেই বলা হয়ে থাকে, এজন্যে খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বকে বাদ

---

[৪০] সূরা আল্ হুজুরাত : ১৩।

[৪১] সূরা নিসা : ১।

দেওয়া বা আলাদা করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। নিজের মানবিক গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের জন্য নারীকেও অন্যান্য মানুষ অর্থাৎ পুরুষের মতো খোদাভীরুতা অবলম্বনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

(২) "তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে"– প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বাক্যে ঔরসজাত সম্পর্কের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের অর্থই বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। কেননা ঔরসজাত সম্পর্কের জন্যে নারী ও নর দুজন মানুষের সমন্বয় একান্ত জরুরি। তাছাড়া আভিধানিকভাবে 'নফ্স' বা সত্তার অর্থ আত্মা অথবা মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণের দিককেই চিহ্নিত করে। এজন্যে এ থেকে অনর্থক বা নিছক ঔরসজাত সম্পর্কের অর্থ নেওয়া যেতে পারে না।

(৩) আল্লাহ তাআলার এই বাণী যে "সেই সত্তা থেকে তার জোড়া বানিয়েছি" প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বাক্যটিও সাবেক দু'টি কুরআনী বাক্যের মতো মানব ঐক্যের তাগিদার্থে বলা হয়েছে। কারণ প্রথম বাক্যে এটা বলা হয়েছে যে, পুরো বিশ্বমানবতাকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর তিনিই হচ্ছেন আদি পিতা হযরত আদম। আর এর পরের বাক্যে তাঁর স্ত্রী এবং মানুষের আদি মাতা হযরত হাওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সবাই তাঁরই সন্তান। বলাবহুল্য যে, সন্তানদের মতো মাও মহামানবতার ও মানব ঐক্যের বৈশিষ্ট্যে বরাবরের অংশীদার। এ ব্যাপারে আমরা স্থির নিশ্চিত যে, কুরআনের এই আয়াতে নারীর যে মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে তা দুনিয়ার সব জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের সামষ্টিক জ্ঞান-বুদ্ধির পক্ষেও সম্ভব নয় যা এতোটা তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিক থেকেও আয়াতটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনন্য– অসাধারণ।

এরপর এই মানবত্বের গুণ– যা আল্লাহ হযরত আদমের জন্যে নির্ধারিত করেছেন– তা একটি অদৃশ্য জিনিস, তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে না। আর এই গুণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে– আদমের সন্তান হিসেবে। তা সে পুরুষ কিংবা নারী, তাতে কিছু আসে যায় না। এভাবে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামই নারী ও পুরুষ উভয়কে একই মানবিক মর্যাদা দিয়েছে, এদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই যে, এরা কেউ নারী আর কেউ পুরুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম নারীজাতিকে এই মানবিক অধিকার ও মর্যাদা তখন দিয়েছে যখন খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতদের সাথে সারা দুনিয়ার পণ্ডিতেরা "নারী– মানুষ না অমানুষ" এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে– সব বুনিয়াদী ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমগুরুত্ব ও সমমর্যাদার অধিকারী। কেউ কারো থেকে খাটো নয়, হীন নয়। পুরুষ ও নারীদের মধ্যেকার এই সমতাপূর্ণ অবস্থানকে সামনে রেখেই ইসলাম

পুরুষদের মতো নারীদের জন্যেও আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা নারীসংক্রান্ত এসব ইসলামী শিক্ষা ও আইনবিধি নিয়ে আলোচনা করবো।

৩. নারীর ধর্মীয় মর্যাদা

আমরা পূর্বেই ঈঙ্গিত দিয়েছি যে, নারীর ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারটি খোদাভীরুতার উপদেশ দানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে তার মানবিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তার দায়িত্ব ঠিক পুরুষেরই মতো এবং এ ব্যাপারে তাকে পুরুষের মতোই যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ যখন আদিমানব হযরত আদমকে বেহেশতে থাকার জন্যে বলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে বারণ করেন তখন সেই আদেশ ও নিষেধের সম্বোধন আদিমাতা হযরত হাওয়ার প্রতিও ছিল, যেমনটি ছিল হযরত আদমের প্রতি। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে– "এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ই এই জান্নাতে থাক, সেখানে যে জিনিস তোমাদের মনে চায় খাও; কিন্তু ওই গাছের কাছে যেও না, নয়তো অত্যাচারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।[৪২]

এরপর যখন আল্লাহ তাআলা তাদের অবাধ্যতার জন্যে ভর্ৎসনা করেন তখনও উভয়কে একই সাথে সম্বোধন করেন–

"আমরা কি তোমাদের উভয়কে ওই গাছের নিকটে যাওয়া থেকে বাধা দিইনি?" তাছাড়া ইসলাম নারী-পুরুষের ক্ষমতার শুধু পয়গামই দেননি; বরং তাকে হাতে-কলমে বাস্তবায়ন ও তার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা দানের উদ্দেশ্যে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির উপলব্ধিও সৃষ্টি করেন। এর সাথে সাথে মহিলাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে একটি বিশেষ বাইয়াতের আয়োজনও করা হয় যেন তাদের এক পৃথক মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং তারা যেন নিছক বাপ, ভাই বা অন্য কোনো মানুষের চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ না করে। ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কেও নারীদের পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

"হে নবী! যখন তোমার কাছে মো'মেন নারী বাইয়াত করার জন্যে আসে এবং এ কথার শপথ নেয় যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করবে না, নিজ হাত-পায়ের সামনে কোনো মিথ্যা অভিযোগ আনবে না, ব্যভিচার করবে না এবং কোনো সৎকর্মের আদেশে

---

[৪২] আ'রাফ–১৯।

তোমার অবাধ্যতা করবে না– তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"[৪৩]

মনীষী মোহাম্মদ সাতুত্ তাঁর গ্রন্থ 'নারী ও কুরআন'– এ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন– "নারীদের কাছ থেকে আলাদাভাবে বাইয়াত গ্রহণের অর্থ হচ্ছে ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে পৃথক এক স্থায়ী মর্যাদা দান করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লার দরবারে নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।[৪৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে তাদের দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আখেরাতে একইভাবে জবাবদিহি করতে হবে এবং উভয়ই পাপ বা পুণ্যের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার অর্জন করবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে অতি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

"আর যে সৎকর্ম করবে– তা সে পুরুষ হোক বা নারী– যদি সে মো'মেন হয়, তাহলে এমন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের অণু পরিমাণ অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারবে না।"[৪৫] আল্লাহ্ আরো বলেছেন–

"মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। সেটাই তাদের জন্যে উপযুক্ত (স্থান)। তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ রয়েছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"[৪৬]

৪. অর্থনৈতিক অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বিষয়ে ইসলামের কথা হচ্ছে, সব রকমের ধনসম্পদ বা সম্পত্তিতে তার সমান মালিকানার অধিকার এবং তার ইচ্ছেমতো ওসব ধনসম্পদ বা সম্পত্তি ব্যয় বা ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা আগেই বলেছি যে, নারী বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই আল্লাহর ইবাদত করার যোগ্য এবং সৎকর্মে তার ভূমিকা ও সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং এই অযোগ্যতার প্রমাণ পেশ করার জন্য এবং সৎকর্মে ভূমিকা পালন ও সহযোগিতা দানের জন্যে তার অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা একান্তই জরুরি। অবশ্য এই উভয়াদি অধিকারের জন্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোনো পার্থক্যই নেই। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রোমান সমাজে নারীর

---

[৪৩] সূরা মুমতাহেনা–১২।
[৪৪] দ্রষ্টব্য : নারী ও কুরআন, পৃ.-৩।
[৪৫] সূরা আন নিসা–১২৪।
[৪৬] সূরা তওবা–৬৮।

নারীত্বের জন্যেই তার সবরকমের অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হতো। এভাবে আরব এবং অন্যান্য সভ্য ও অর্ধসভ্য সমাজেও নারীর সব রকম অধিকার এবং মর্যাদা হরণ করা হয়। তাদের দৃষ্টিতে নারী হয়ে জন্মানোটাই ছিল একটা বিরাট অপরাধ। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই নারী জাতিকে সবরকমের অধিকার ও মর্যাদা দানের সাথে সাথে ক্রয়-বিক্রয় এবং সম্পদ ও সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা লাভের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হয়। ইসলাম নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ বা সম্পত্তি থেকে কোনো পুরুষকে, এমনকি স্বামী, পিতা বা ভাইকেও অনধিকার হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলাম নারীকে তার নিকটাত্মীয়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী অংশীদারিত্বও দান করেছে। অথচ পৃথিবীর অন্য সব জাতি নারীর এই অধিকারকে অস্বীকার করে, ফলে তারা কোনো মৃত নিকটাত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। নারীসমাজকে এই বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচিয়ে তার উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন–

"পুরুষদের জন্যে সেই ধনসম্পদে অংশ রয়েছে যা মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং নারীদের জন্যেও সেই ধনসম্পদে অংশ রয়েছে যা মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে– কম হোক বা বেশি, আর এই অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকেই) নির্ধারিত রয়েছে।"[৪৭]

কুরআনের এই আদেশ মোতাবেক নারীরাও তাদের মাতা-পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়া ধন-সম্পদের অংশ পেতে শুরু করে। একইভাবে ইসলাম-পূর্বযুগে নারীদেরকে তাদের বিয়ের দেনমোহর থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হতো। বাপ, ভাই, স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষ তার দেনমোহরের প্রাপ্য হজম করে যেতো। তার যৌতুক এবং উপহারগুলো সরাসরি স্বামীর দখলে চলে যেতো। মোটকথা, কোনো উপায়েই নারীকে ধনসম্পদের মালিক হতে দেওয়া হতো না।

ইসলাম নারীর ওপর পরিচালিত এই অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটায় এবং তাকে তার ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কোনো বাপ-ভাই বা স্বামীর জন্যে এখন নারীর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আর কোনো অবকাশ নেই। মেয়েদের বিয়ের দেনমোহর সম্পর্কেও কুরআন স্পষ্ট বলেছে–

"নারীদেরকে তাদের মোহর– যা তাদের অধিকার, দিয়ে দাও"।[৪৮]

---

[৪৭] সূরা আন নিসা-৭।
[৪৮] সূরা নিসা-৪।

মনীষী ইবনে হাযম বলেন– "শরীয়তের আইন মোতাবেক স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে বা প্রতারিত করে তার যৌতুক বা মোহর ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কোনো স্বামীর নেই। এমনকি স্ত্রীর যৌতুকের সামান্যতম অংশ ভোগ করাও তার জন্যে বৈধ নয়। যৌতুক ও মোহরের ওপর পুরো অধিকার একচ্ছত্রভাবে শুধু নারীরই রয়েছে। নারী তার সম্পদ স্বামীর বিনা অনুমতিতেই যেমন ইচ্ছা ব্যয় বা ব্যবহার করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বামীর আপত্তি করার কোনো অধিকার নেই। তিনি আরো বলেন, "কোনো মেয়ের পিতা, তা সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক, স্বামীর ঘর করুক বা না করুক– এই অধিকার নেই যে সে, তার মেয়ের মোহর থেকে কিছু অংশগ্রহণ করবে। পিতা বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় যদি মেয়ের মোহরের কোনো অংশগ্রহণ করে তাহলে তা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য হবে। মেয়ে তার মোহর বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ যেখানে মর্জি, যেভাবে ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারে; এ ব্যাপারে পিতা, ভাই বা স্বামীর বলার কোনো অধিকার নেই।"[৪৯]

স্থাবর-অস্থাবর সবরকমের সম্পদের ওপর নারীর পূর্ণ স্বাধীন অধিকার রয়েছে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদ আয় উপার্জন করার পূর্ণ স্বাধীনতাও নারীর আছে। নারীর জামানত দান বা প্রদানের অধিকারও আছে; নারী উপহার দিতে বা নিতেও পারে। সে তার সম্পর্কের আপন বা তার নিকটাত্মীয় বা তার ইচ্ছেমতো অপর কোনো মানুষকেও দান করার ব্যাপারে স্বাধীন। সে তার ধনসম্পদ যেকোনো মানুষের জন্যে অসিয়ত করে যেতে পারে। ইসলামের আইন মোতাবেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী সুবিচারের জন্যে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকারও রাখে। মোটকথা, ইসলাম নারীকে সব রকমের পূর্ণ অধিকার ও মানবিক মর্যাদা দান করে। ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নারীর এই অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত নয়। ইসলামের আগে নারী এসব অধিকার ও মর্যাদা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল।

ইমাম মোহাম্মদ আবদুহু বলেন– "ইসলাম নারীকে এমন উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে যে অধিকার দান করেছে তা অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন। এতো অধিকার ও মর্যাদা যেমন জগতে নারী পায়নি তেমনি ইসলামী সমাজ ছাড়া বর্তমানে অন্য কোনো সমাজেও নারীর এতো অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত নয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নারী ভবিষ্যতেও তার এতো মর্যাদা বা অধিকার পাওয়ার আশা করতে পারে না। ইসলাম শত শত বছর আগে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে বিধান বাস্তবায়ন করেছে তা এতো উন্নতমানের যে, কোনো মানুষের পক্ষে তা চিন্তা করাটাও মুশকিল।"

---

[৪৯] আলমুহাল্লা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫১১।

"আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ যেখানে নারীশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী প্রগতির বুলি আওড়ানো হয় সেখানেও নারীর যথার্থ অধিকার ও মর্যাদার আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, যা ইসলাম অনেক আগেই নারীকে দিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আজও এমন সব নারী-বিরোধী আইন ও প্রথা প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে নারীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শোষণ করা হচ্ছে। গত ৫০ বছরে পাশ্চাত্য জীবনের সর্বত্র নারী-সংক্রান্ত এমনসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ পাশ্চাত্য সমাজে নারীর অবস্থা এমন করুণ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যা সম্ভবত অন্ধকার যুগেও ছিল না।"

এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার অন্য এক জায়গায় লিখেছেন– "পাশ্চাত্যের বর্তমান পণ্ডিত সমাজ যারা নিজেদের দাবি মতো নারীকে অনেক বড় স্থান দিয়েছে বলে গর্ব করে আর উল্টে আমাদেরকেই সংকীর্ণমনা বলে কটাক্ষ করে; আজ ইসলাম থেকে আমাদের দূরে সরে পড়ার কারণে আমাদের যে অধঃপতন– এই জ্ঞানপাপীরা তাকে আমাদের দ্বীনের ফলাফল বলে দোষারোপ করছে।"

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী ব্যক্তিরা, যারা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ তারা পশ্চিমা জ্ঞানপাপীদের সুরে সুর মিলিয়ে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে নানারকম ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে থাকে। ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাপারেও এসব অন্ধ অনুসারীরা অভদ্র উক্তি প্রকাশ করে থাকে– তারা আসলে নিকৃষ্ট পর্যায়ের আহাম্মক। পাশ্চাত্যের ঠুনকো চাকচিক্য তাদের দৃষ্টি ও বিবেকশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

৫. সামাজিক অধিকার

ইসলাম নারীর সামাজিক অধিকারও দিয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত আইনবিধি প্রবর্তন করেছে–

(ক) মেয়ে যখন অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছায় এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে সব বিষয় ও ব্যাপার ভালো করে বুঝতে শুরু করে তখন তার ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় অধিকার অর্জিত হয়ে যায়। এখন সে চাইলে পৃথক কোনো বাসগৃহেও থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তার আত্মীয়স্বজনের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই, তাকে কেউ নিজেদের সাথে থাকার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। অবশ্য শর্ত হচ্ছে– সে যেন সচেতন ও সজ্ঞান হয় যাতে নিজেই তার জানমাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আহমদ ইব্রাহীম বলেন– "মেয়ে যখন যৌবন প্রাপ্ত হয়, তা সে বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা– তার অবস্থা যদি অসন্তে

াষজনক হয় তাহলে তার পিতা কিংবা অন্য কোনো দায়িত্বশীলের এই অধিকার থাকবে যে, সে তাকে নিজের কাছেই থাকার জন্যে বাধ্য করবে। কিন্তু মেয়ে যদি জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী ও মর্যাদাবান হয় তাহলে তাকে কাছে রাখার জন্যে বাধ্য করার অধিকার কোনো দায়িত্বশীলেরই থাকে না। অবশ্য বিয়ের পর মেয়ের এই অধিকার স্বভাবতই শেষ হয়ে যায় এবং তার পক্ষে স্বামীর সাথে অবস্থান করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায় যেন সে তার দাম্পতের অধিকার ও দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারে। এটা এমন এক স্বাভাবিক কথা যার ব্যখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো দরকার নেই।"

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করার অধিকার রাখে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও বিয়ে দেওয়ার অধিকার অন্য কারোর নেই। যদি সে কোনো চরিত্রবান ব্যক্তির সাথে বিয়ে করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার অধিকারও কারো নেই, কারণ তা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই অধিকার সে প্রকাশ্য পন্থায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা রাখে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন–

"কোনো অলীর (দায়িত্বশীল) পক্ষে মেয়ের (ব্যক্তিগত) ব্যাপারে (হস্তক্ষেপ করার) কোনো অধিকার নেই।"[৫০] প্রিয়নবী আরো বলেছেন–

"বিবাহিতা নিজের ব্যাপারে 'অলী' থেকে বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অবিবাহিতার ব্যাপারে অলী তার কাছে অনুমতি চাইবে এবং তার নীরবতাই অনুমতি।"[৫১]

আল্লামা ইবনে কাইউম এই হাদিসের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন– "বালেগা, বুদ্ধিপ্রাপ্ত ও জ্ঞানী মেয়ের ধনম্পদেও যখন তার পিতা মেয়ের অনুমতি ছাড়া ব্যয়ের অধিকার রাখে না সেখানে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার মর্জি ছাড়া তিনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? অথচ, ধনসম্পদ ব্যয়ের অধিকার, কোনো অবাঞ্ছিত পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়ার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার।"[৫২] কিন্তু এসব বিধি-নিষেধের পরও যদি কোনো দায়িত্বশীল নিজের মেয়েকে কোনো অবাঞ্ছিত পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে মেয়ে সে বিয়েকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখবে। হাদিসে আছে যে– খান্‌সা বিনতে জুযাযকে তার পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়ে দেন– যাকে তিনি পছন্দ করতেন না। (উল্লেখযোগ্য যে, তার প্রথম স্বামী ইন্তেকাল করেন)। প্রিয়নবী এই বিয়েকে নাকচ করে দেন।[৫৩]

---

[৫০] আবু দাউদ।
[৫১] বুখারী ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ।
[৫২] জাদুল মায়াদ, চতুর্থ খণ্ড।
[৫৩] আল্ আহকাম আস্ শারয়ীয়াহ।

এজন্যে বিয়ের সময় মেয়ের উপস্থিতি একান্তই উত্তম। আহমদ ইব্রাহীম তাঁর আল আহকাম আস শরয়ীয়াহ গ্রন্থে আরো লেখেন যে, বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে পাত্র-পাত্রী উভয়ই স্বাধীন ও বুদ্ধিমান হবে। বিয়ের সময় উভয়েই উপস্থিত থাকবে অথবা উভয়ের উকিল অথবা উভয়ের মধ্যে একজন স্বয়ং উপস্থিত এবং অন্য জনের উকিল উপস্থিত থাকবে।[৫৪]

শায়খ আল্লামা মাহমুদ শাতুত এ বিষয় সম্পর্কে বলেন– "এ সম্পর্কে আমরা যখন কুরআনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন দেখি যে, ইসলাম নারীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমর্থক। যেমন সূরা আহযাবের এই আয়াতে বলা হচ্ছে–

"আর সেই মো'মেন মহিলা যে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করে দিয়েছে নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায়। এই বিশেষ সুবিধা শুধু তোমার জন্যে অন্যান্য মোমেনদের জন্য নয়।"[৫৫] সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–

এর পর যদি (দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী তৃতীয়বার) তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেই মহিলা এরপর তার জন্যে আর বৈধ থাকবে না। অবশ্য যদি তার বিয়ে অন্য কোনো পুরুষের সাথে হয় (এবং সে যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়)। একই সূরায় এরপর বলা হচ্ছে–

"এরপর যখন তাদের ইদ্দত পুরো হয়ে যায় তখন ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রকাশ্য পন্থায় যা মর্জি তা করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে।"[৫৬]

এসব আয়াতে স্পষ্টভাবে বিয়ের বিষয় নারীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের ভূমিকাকে গৌণ করা হয়েছে। এরপর একথা একেবারে বিবেকবর্জিত ও শরীয়ত বিরোধী মনে হয় যে, কোনো ব্যাপারে অধিকার ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনের উপস্থিতি জরুরি হয় ঠিকই; কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় কোনো বিষয়ের মীমাংসা করতে চায় তাহলে তাকে অবৈধ গণ্য করা হবে। আর এতেও কোনো সন্দেই নেই যে, শরীয়তের আইন মোতাবেক যেকোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের রয়েছে। আর ঠিক একই অবস্থা যদি নারীর বেলায় হয় তাকে অবৈধ বলার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এছাড়া এটাও সন্দেহাতীত ব্যাপার যে, বিয়ের পুরো সম্পর্কটাই স্বামী-স্ত্রীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল আর এটা

[৫৪] আহকাম আস শরয়ীয়াহ, পৃ. ৯।
[৫৫] সূরা আহযাব-৫০।
[৫৬] সূরা বাকারা-২৩৪।

সর্বজনস্বীকৃত নীতি যে, যেকোনো ব্যাপারে পুরো ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক হতে পারে কেবল বিষয় সংশ্লিষ্ট নরনারী।[৫৭]

তাঁর বক্তব্য অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এরপর আরো কিছু বলার মানে হবে সূর্যের সামনে বাতি জ্বালানোর মতো। উপরের বক্তব্যের মাধ্যমে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম নারীর স্বাধীন অভিমতকে কতটা গুরুত্ব দেয় এবং ইসলাম নারীর মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি করেছে।

(গ) সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অন্য যে অধিকারটি দিয়েছে তা সত্যিই অনন্য ও অভূতপূর্ব। আজকের তথাকথিত প্রগতিবাদীরাও নারীকে এতবড় অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়। অথচ এরাই নারীমুক্তির ব্যাপারে নিজেদেরকে ঠিকাদার মরে করে। নারীর এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারটি হচ্ছে– শান্তি বা যুদ্ধের যেকোনো সময় নারী ইচ্ছা করলে শত্রুপক্ষের যেকোনো লোককে আশ্রয়দান করতে পারে।

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর আবু তালিবের মেয়ে এবং হযরত আলীর সহোদরা বোন উম্মে হানী এক মুশরিক ব্যক্তিকে নিজ গৃহে আশ্রয়দান করেন। হযরত আলী বোনের দেওয়া এই আশ্রয়কে অগ্রাহ্য করে শত্রুটিকে হত্যা করার জিদ ধরেন। এমতাবস্থায় হযরত উম্মে হানী শীঘ্রই প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল, আলী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছে যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি।' একথা শুনে প্রিয় নবী বলেন–

'উম্মে হানী! আমরাও তাকে আশ্রয় দিচ্ছি, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছে।'[৫৮]

এ সম্পর্কে প্রিয় নবীর আরও একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য। প্রিয় নবী বলেছেন– "সব সবল মুসলমান দুর্বল মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক। তাদের রক্ত সমগুরুত্বপূর্ণ এবং (কাউকে) আশ্রয় দেওয়ার অধিকার তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

'মুসলমান' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো মানুষই মুসলমান হতে পারে। বলাবাহুল্য, উম্মে হানী সম্পর্কিত হাদিসের মতো এই হাদিসটিতে দেওয়া অধিকারও নারী-পুরুষ সবাই সমানভাবে পাবে। এখানে প্রিয় নবীর আর একটি হাদিসে নারীসমাজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণবৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রিয় নবী বলেছেন– "নারী পুরো জাতির দায়িত্ব নিতে পারে।"[৫৯]

---

[৫৭] কুরআন ও নারী, পৃ.-১২-১৩।
[৫৮] বুখারী, মুসলিম।
[৫৯] তিরমিযী।

'আলমুলতাকা'র গ্রন্থকার এই হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন– "নারী মুসলমানদের পক্ষে থেকে শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারে।" এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার হাদিসটিও সিদ্ধান্তমূলক। তিনি বলেন– "যদি কোনো মহিলা মুসলমানদের পক্ষ থেকে (শত্রুকে) আশ্রয় দিতে চায়, তাহলে দিতে পারে।" এই অনুমতির স্পষ্ট অর্থ এই যে, ইসলামী সমাজে নারীর এই কর্মকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং যেকোনো মুসলিম মহিলা এই অধিকার ব্যবহার করতে পারে। কোনো ব্যক্তি মহিলাদের এই অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। যদিও এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সামান্য অসতর্কতাতেও ভীষণ ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম এক্ষেত্রেও নারীর অধিকারকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ইসলামী সমাজে নারীকে কতোটা দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত মনে করা হয়। নারীকে এত বেশি মর্যাদা দেওয়া এবং বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল কেবল ইসলামই মনে করে। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ নারীমুক্তির শ্লোগান তো খুব দিচ্ছে; কিন্তু তারা নারীর বিবেক-বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততায় কখনও আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিক গুণবৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে। ফলে সেখানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। সেখানে প্রতিটি নর-নারী অপরাধে অভ্যস্ত এবং তারা সবাইকে নিজেদের মতো অপরাধী ও অবিশ্বাসী বলে মনে করে। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজে নারীর ওপর পুরুষের এবং পুরুষের ওপর নারীর আস্থা স্থাপনেও বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এভাবে পাশ্চাত্য সমাজে পাক-পবিত্রতা, লজ্জা-শালীনতা ও নিঃস্বার্থ সেবার কোনো অস্তিত্ব নেই, আর পারস্পরিক বিশ্বাসের তো সেখানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো পারস্পরিক বিশ্বাস, সদ্ভাব, শালীনতা, নিঃস্বার্থ সেবা ও অকপট মানবিকতা। ইসলামী সমাজে পারস্পরিক মর্যাদা ও বিশ্বাসের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা পাশ্চাত্য সমাজে একান্ত অকল্পনীয় ব্যাপার। এর একটি কারণ হচ্ছে, ইসলামী সমাজে উন্নতি ও মান-মর্যাদার মান, ধন-সম্পদ বা বংশভিত্তিক নয়; বরং এখানে নারী-পুরুষ ছোট-বড় সব মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। কারো যদি বেশি মর্যাদা হয়, তাহলে তা হয় কেবল খোদাভীরুতার জন্যই। এখানে প্রত্যেকের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই, একই মঞ্জিলের দিকে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের পথ অতিক্রম করছে। এ পথে যদি কোনো আপদ-বিপদ আসে তাহলে তারা সম্মিলিতভাবে তার মোকাবিলা করে সবাই জান-মালের ত্যাগ-তিতিক্ষায় এগিয়ে আসে।

ইসলামী সমাজে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই সমান। এখানে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমতাবোধ, পারস্পরিক বিশ্বাস ও

আস্থা, সম্প্রীতি ও সদ্ভাব এবং নিঃস্বার্থ সেবা হচ্ছে মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য গুণ-বৈশিষ্ট্য। এজন্যে ইসলামী সমাজের কোনো নারীও যদি কারো জান-মালের দায়িত্ব নেয় তখন গোটা সমাজ তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় এবং প্রত্যেকের মনেই তার জন্যে বিশেষ সম্মান ও সম্প্রীতি ভাব জাগে।

উপরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এটা ভালো করে জানা গেল যে, ইসলামী সমাজে নারীর অধিকার কতটুকু। ইসলামী সমাজে নারীর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এবং এখানে নারী পুরো মানবিক সন্তুষ্টির সাথে মুক্ত মন ও স্বাধীন বিবেক নিয়ে জীবনযাপন করে। উল্লেখযোগ্য যে, এসব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া অধিকার যা তিনি নির্ধারিত উদ্দেশ্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকেই দান করেছেন। এথেকেও এই নীতি-যুক্তির বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ পৃথিবীতে কোনো জীব বা কোনো পদার্থকেই অকেজো বা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি এবং পৃথিবীতে উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি জিনিসেরই মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে সেই মূল সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

"মোমেন পুরুষ ও মোমেনা নারী– এরা সবাই একে অপরের বন্ধু, সৎকর্মের আদেশ দেয়, মন্দকর্মের প্রতিরোধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। এরা সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। নিশ্চয়ই, আল্লাহ সবার উপরে বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।"[৬০]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে মানবজীবনের সব দিক ও বিভাগকে সামনে রেখেই স্পষ্ট দৃষ্টিকোণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ধরনের বিশেষ গুণাবলির সমন্বয় হলেপরে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যথার্থ উন্নতি অর্জন করতে পারে। এসব মহৎ গুণাবলির অর্জন ও সংরক্ষণ করা প্রতিটি মুসলমানের বুনিয়াদি কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু আমরা নারী সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করছি তাই এই আয়াতের আলোকে নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

(ক) এ আয়াতে একটি দৃষ্টান্তমূলক সমাজ যথার্থ ইসলামী সমাজের লোকদের গুণ, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

উল্লেখ যে, একটি ইসলামী সমাজের সদস্যদের মধ্যে অবিভাজ্য সম্পর্ক মওজুদ থাকে। এখানে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বা সমাজকে ব্যক্তি থেকে পৃথক করে দেখার বা কোনো একটাকে গৌণ মনে করার কোনো অবকাশ নেই। আর

---

[৬০] সূরা তওবা : ৭১।

এ সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ যার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেই কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে। এর মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এ বিশ্বাসই হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের সবরকম সম্পর্ক, আবেগ ও উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। আর এসব ইসলামী মূল্যবোধের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের পরই এ সম্পর্ক হয় মজবুত ও স্থিতিশীল। এ সম্পর্ক এতই মজবুত যে, তাকে ইস্পাত-কঠিন দেওয়ালের সাথেই কেবল তুলনা করা যেতে পারে। সম্পর্কের এই দৃঢ়তা আসলে ঈমানেরই ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত হয়। একে মেনে নেওয়ার পর ব্যক্তি সমাজের এক দায়িত্বশীল সদস্যের মর্যাদা লাভ করে। এরপর ব্যক্তি তার ভালোমন্দ সব কর্মের জন্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এরই মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। বস্তুত এটা জীবনের মহত্তম লক্ষ্যস্থান, যেখানে পৌঁছানোর জন্যে যেকোনো মানুষ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে। এ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ বলেছেন–

"মোমেন পুরুষ ও মোমেনা নারী সবাই একে অন্যের বন্ধু।" এতে পরিষ্কারভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হলো যে, ইসলামী সমাজে নারী ও পুরুষের মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান এবং এই ঈমানই হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি।

(খ) যখন কোনো সমাজের ভিত্তি হয় 'ঈমান' তখন তার জনগণের মধ্যে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ গুণাবলির সৃষ্টি হয়। আর তা হলো তারা সৎকর্মের আদেশ দেয়, মন্দকর্মের প্রতিরোধ করে। নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এখানে আমরা কুরআনী আয়াতের শুধু সেই অংশের ব্যাপারে আলোচনা করবো যাতে নারীদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

"তারা সৎকর্মের উপদেশ দেয় এবং অসৎকর্মের প্রতিরোধ করে, এই খণ্ড আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা করলে জানা যায় যে, আল্লাহ্ সমাজকে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর একটি পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্বের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কাউকেই নিষ্কৃতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহ পুরো বিশ্ব-মানবতাকে সামনে রেখেই সম্বোধন করেছেন– তাতে নরনারীর পৃথক সত্তার কোনো গুরুত্ব নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একটা বিরাট ও মহত্তম দায়িত্ব– যা নর-নারী উভয়কেই অবশ্য কর্তব্য হিসেবে পালন করতে

বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো সমাজে নারীকে এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করা হয়নি।

(গ) "তারা সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দকর্মের প্রতিরোধ করে" এই কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম নর-নারীর দায়িত্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোকে সর্বোতভাবে মজবুত ও স্থিতিশীল করা এবং যুলুম-অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা, প্রতারণা, অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা ইত্যাদি ঘটানো তাদের বুনিয়াদি কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, সেখানে কোনো একটি ব্যক্তিও যেন তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কেউ যেন কোনোভাবে কারো হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; বরং প্রত্যেকেই যেন পরস্পরের সহযোগী ও কল্যাণকামী হয়। তারা এমন সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি অত্যাচারের উচ্ছেদ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজকে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এই মহত্তম দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারীও তার ক্ষমতা মোতাবেক সংগ্রামী ভূমিকা পালন করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম নারীকে তার কর্ম-সীমার আওতায় থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এর জন্যে সে তার সমাজ ও পরিবেশকে ভালো করে জেনে ও বুঝে নেবে এবং সমাজ ও পরিবেশের সব রকম ভালো-মন্দ সম্পর্কে তাকে অবহিত থাকতে হবে। এভাবেই মুসলিম নারীসমাজের বৃহত্তম অঙ্গনে নিজেদের বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ সম্পর্কে প্রিয় নবীর একটি বাণী অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে সম্বোধন করে বলেছেন–

"যে মুসলমানদের বিষয়াদি বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং স্থান ও সময়ের দিক থেকে তার পরিবর্তন পরিবর্ধনও ঘটতে পারে। কোনো কোনো মুসলমান চাষাবাদ ও কৃষি তৎপরতায়, কেউ কল-কারখানা বা শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা সরকারি দায়িত্ব পালনে, কেউ ক্ষুধা দারিদ্র্যের অবসান প্রচেষ্টায়, কেউ সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কারে, কেউ কেউ সামষ্টিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়, কেউ বিশেষ বা সীমিত পর্যায়ে, কেউ বৃহত্তম ও ব্যাপক পর্যায়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। আর কর্ম ও দায়িত্ব পালনের সবগুলো ক্ষেত্রেই নারীর কর্তব্যও ততটুকু যতটুকু পুরুষের। এভাবে সমাজের উন্নতির সাথে সাথে যদি আরো নতুন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তাহলে পুরুষের মতো নারীও সেসব ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

এখানে মহিলাদের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করা এবং তার ব্যবহারিক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইসলামের আলোকে,

বিভিন্ন ক্ষেত্রের দাবি ও চাহিদা মোতাবেক নারী নিজেই তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। কারণ সময় ও পরিবেশের সাথে সাথে কর্মপন্থারও পরিবর্তন ঘটতে পারে। নীতি ও আদর্শ অপরিবর্তনীয় থাকলেই হলো।

অবশ্য এখানে আমরা নারীর স্বাভাবিক কর্মসীমা এবং তাদের তৎপরতার বিভিন্ন পর্যায়ের দিকনির্দেশ করবো যা তারা তাদের কর্মসীমায় থেকে গ্রহণ ও পালন করতে পারে। কিন্তু মূল আলোচনা শুরু করার আগে এখানে এমন একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করি, তাতে করে সামনের অনেক প্রশ্ন ও জটিল সমস্যাবলির সমাধান সহজ হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী সমাজে নারীর কর্মক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারিণ করা হয়েছে। এখানে নারীকে পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া এমনি অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং নারীদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসীমা নির্ধারণের পেছনে গভীর এবং ব্যাপক ভাবনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা ছাড়া সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি চিন্তাই করা যেতে পারে না। এ জন্যে, কেউ যদি বলেন যে, নারীর এই কর্মক্ষেত্রে ও সীমা নির্ধারিণ নিস্প্রয়োজনীয় যাতে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে– তাহলে তিনি ভুল ও যুক্তিহীন কথাই বলবেন। নারীদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রকৃতি এবং তাদের দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে সামনে রাখলে যে কেউ– নারীদের ব্যাপারে ইসলামের বাস্ত বভিত্তিক কর্মপন্থা নির্ধারণের যৌক্তিকতা বুঝতে সক্ষম হবেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম নারীদের গঠনমূলক ও বিপ্লবী ভূমিকা সামনে রাখলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতীতের মুসলিম নারীসমাজ ও আজকের তথাকথিত আধুনিক নারীসমাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, ইসলাম তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন বিকাশে কি বিরাট অবদান রেখেছে। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ এবং জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে তাদের ভূমিকা ছিল গঠনমূলক এবং বিপ্লবাত্মক। বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত দিক থেকেও মুসলিম মহিলারা বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। আর তাঁরা এসব কিছু করেছেন ইসলামের নির্ধারিত কর্মক্ষেত্র ও কর্মসীমার পর্দার অন্তরালে থেকেই। পর্দার অন্তরালে থেকেও তাঁরা কখন তাঁদের জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমস্যাবলির সমাধানে নিজেদের বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবহেলা করেননি; বরং দুনিয়ার ইতিহাসে কেবল ইসলামী সমাজই একমাত্র উদাহরণ যেখানে মুসলিম নারীজাতির সাধারণ ও বিশেষ সমস্যাবলির সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে, পারিবারিক, সামাজিক, যুদ্ধ, সন্ধিতে, শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁরা

তাদের এক একটি দায়িত্ব পালন করেন। সব ক্ষেত্রেই তাঁরা পর্দার মধ্যে থেকেই পুরুষের পাশাপাশি যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম মহিলাদের এই সক্রিয় তৎপরতা, বীরত্বের সত্যতা ইসলামের চরমশত্রু এবং সমালোচকরাও অস্বীকার করেনি। ইতিহাস এই সত্যতার স্বার্থে নিজেদের প্রিয়তম স্বামী এবং যুবক ছেলেদেরকেও জেহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজেদের সব ধনসম্পদ জেহাদের তহবিলে দান করে দিয়েছেন এবং স্বয়ং নিজেরাই রণাঙ্গনে গিয়ে মুজাহিদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবা করেন। আহতদের সেবা ও চিকিৎসার দায়িত্ব তাঁরাই পালন করেন। এভাবে শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ময়দানেও মুসলিম নারী তাঁর দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেন। আজকের যুগের মুসলিম নারী ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বলে এবং তথাকথিত আধুনিক চাকচিক্যের প্রতারণায় বিভ্রান্ত বলে আজ এতটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আজকের মুসলিম নারী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাদের সঠিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে একান্তই অজ্ঞাত এবং একই কারণে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে।

অতীতের মুসলিম মহিলারা ইসলামী জ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন বলে তাঁরা ইসলামী শিক্ষার আলোকে পর্দার অন্তরালে থেকে সমাজ ও জাতি গঠনমূলক কাজ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দুনিয়ার ইতিহাস তার দ্বিতীয় কোনো নজির প্রদর্শন করতে অক্ষম।

আজকের যুগের নারী সমাজ যদি তাদের হারানো অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেতে চান তাহলে তাদেরকে তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ, তার লাগামহীন বেলেল্লাপনা, অশালীন ও অশ্লীল কার্যকলাপ, দেহ-প্রদর্শনী, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং এ ধরনের অন্যান্য নোংরা তৎপরতা বর্জন করে ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে হারানো অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বস্তুত, ইসলামী আদর্শের অনুসরণ তথা আল্লাহর নির্দেশিত কর্মপন্থার অনুসরণ করার মধ্যেই নারী-পুরুষ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেদিন আমাদের মহিলা সমাজ এই বাস্তব কথা ও এই সত্য কথা অনুভব করে সামনে এগিয়ে আসবেন সেদিনই সত্যিকার অর্থে তাদের মুক্তির পথ সুগম হবে। সেদিন তারা আর পুরুষের সাথে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামতে না এসে নিজেদেরই কর্মক্ষেত্র এবং কর্মসীমায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন এবং সেই পথ ধরেই তাঁরা তাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেন।

নারী-পুরুষের কতিপয় মৌলিক পার্থক্য

মহান আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে নর ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন। মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নর ও নারী মানুষ। মানুষ হিসেবে সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাসহ সকল ইসলামী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা; কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন এক বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যার কারণে নর নারীকে ভালোবাসে, নারীর জন্য নরের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। শুধু মানুষ নয় সকল জীব-জন্তু বা প্রাণীর মধ্যে ঐ জাতির বিপরীত লিঙ্গের প্রাণী রয়েছে। পৃথিবীতে বংশ বিস্তার, পৃথিবীকে আবাসস্থল হিসেবে মেনে নেবার প্রবণতা সৃষ্টির জন্য একজনের প্রতি আরেকজনের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ তা'আলা এ আকর্ষণ মিটানোর জন্যে এক জাতির মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী লিঙ্গের প্রাণী বা জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। নর অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর এ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা একই সত্ত্বা দিয়ে বিপরীত লিঙ্গের নারী সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে পৃথিবীতে পদার্পণ করলেন। এ বিপরীতধর্মী নর ও নারীর বৈশিষ্ট্যের কারণে বা অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে শারীরিক তারতম্য, রুচির তারতম্য, মেধার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আর আল্লাহ তা'আলাও তাদের অর্থাৎ নারীদের স্বভাব ও চরিত্রের কারণে ঐ ধরনের নির্দেশ ও আদেশ জারি করেছেন তাদের জন্য। মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য নেই। তবে পালনের পদ্ধতিগত দিক থেকে মেয়েলী স্বভাবের কারণে নারীদের জন্য এক রকম পদ্ধতি, নরের পুরুষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের ইবাদতের পদ্ধতি অন্য রকম। এ পার্থক্য সামান্য। তবে পালনের মৌলিক পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে আবার কোন তারতম্য নেই। মৌলিক কথা হল নরকে তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে এক রকম স্বভাব এবং নারীদের মেয়েলী চরিত্রের কারণে আরেক রকম স্বভাব বিদ্যমান। নর ও নারীর এ প্রভেদমূলক অবস্থানকে সকল স্তর থেকে একবাক্যে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। অবস্থানের মৌলিকত্বকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। এ অবস্থানের প্রাপ্ত অধিকার হরণ করাকে মর্যাদা বিপন্নের পর্যায়ে পড়ে; কিন্তু অবস্থানকে অস্বীকার করে আরেকটি অবস্থানে গিয়ে অধিকার দাবী করা অগ্রাহ্য। কারণ অবস্থানের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে তা নরের জন্য যেমন সুবিধাজনক, তেমনি নারীর ক্ষেত্রেও তা সহজতর। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল করে জানেন নরের জন্য কি রকম আইন তৈরি করা হলে তার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। নারীর জন্যও তাদের সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে নরের পাশাপাশি তারা মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। তাই নারী ও নরের যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় তা অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. নারীর শারীরিক পার্থক্য

বিজ্ঞানীদের মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। নারীর আকৃতি, অবয়ব, অংগ-প্রত্যংগ হতে আরম্ভ করে শারীরিক অণু পরমাণু পর্যন্ত পুরুষ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। শরীরতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীর তুলনায় পুরুষের শারীরিক অবস্থা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী। মাতৃগর্ভে সন্তানের নারী বা পুরুষ আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের শারীরিক গঠন লাভ করে। নারীর দৈহিক গঠন এমনভাবে গঠিত হয় যাতে করে নারী সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করতে পারে। এজন্য দেখা যায় নারীর জরায়ূ গঠন হতে আরম্ভ করে প্রাপ্তবয়স্কা পর্যন্ত তার দেহের পূর্ণ বিকাশ জেনেটিক প্রভাবে হয়ে থাকে। নারীর স্তনযুগল থাকে যা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ সন্তান লালন-পালনের জন্য তাকে যুগল স্তন দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীদের দেহে ডিম্বকোষ থাকার ফলে মাসিক ঋতুস্রাব হয়ে থাকে। এ সময় তার দেহের তাপ সংরক্ষণ হ্রাস পায়, রক্তে চাপ কমে যায়, হজম শক্তি ব্যাহত হয়, স্বাধ অবসন্ন, স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। এ বিষয়গুলো পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নারীর ভিতরে হরমোনজনিত কারণে লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে এবং তাদের শারীরিক গঠন কিছুটা নরম। শরীর বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এমিল নুডিক, ডাক্তার ক্রেগার গীব হার্ডদের মতে ঋতুবর্তী নারীদের মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কে রোগ বেশি বিদ্যমান। অধ্যাপক লাপিনস্কি বলেন– "মাসিক ঋতুকালে নারীদের কর্মাধীনতা নষ্ট হয়ে পড়ে এবং একটা প্রভাবশালী ক্ষমতা তাকে বাধানুগত করে ফেলে। স্বেচ্ছায় কোন কাজ করা বা না করার শক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে পড়ে। ডাক্তার ক্রাফটের মতে ভদ্র, বিনয়ী, প্রফুল্লাচিত্ত নারীদের মধ্যে ঋতুস্রাবের সময় পরিবর্তন দেখা দেয়। এ ডাক্তারের মতে এ সময় নারীরা হঠাৎ রুক্ষ, ঝগড়াটে ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওয়েনবার্গ মন্তব্য করেন– "আত্মহত্যাকারী নারীদের শতকরা ৫০ জন ঋতুকালেই আত্মহত্যা করে থাকে।" ডাক্তার রিপ্রেসেভ মতে নারীদের অতিরিক্ত দৈহিক উপাদানসমূহ ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে পরিমাণে বের হয়, গর্ভাবস্থায় তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়ে থাকে। ডাক্তার ফিশার, মোল, হিউলাক, এলবার্ট, ইলিয়াস প্রমুখের মতে গর্ভকালীন মাসে নারীদের দৈহিক ও মানসিক শ্রম করার যোগ্যতা থাকে না। ফ্রান্সের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ডঃ জলেকিস ক্যারেল-এর মতে নারী পুরুষে যে বৈষম্য বিরাজমান তা মৌলিক ও বুনিয়াদী ধরনের। এ বৈষম্য তাদের দেহে সৃষ্ট স্নায়ুমণ্ডলীতে বিদ্যমান। নারীদের সম্পূর্ণ দৈহিক অবয়বই ভিন্ন ধরনের। তাদের

জীবনকোষ হতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয় যা গর্ভ ধারণের উপযোগী করে সৃজন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নারী দেহের প্রতিটি কোষ নারীত্বের নিদর্শন বহন করে। নারী আর পুরুষের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণেই একজনকে আরেকজন ভালোবাসা দিতে পারে, নিতে পারে এবং শান্তি লাভ করতে পারে। একজনের শরীর নরম, আরেকজনের শরীর থাকে শক্ত। একজনকে সন্তান উৎপাদন ও লালনপালন উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, আরেকজনের দৈহিক গঠন করা হয়েছে ব্যাপক পরিধিতে কাজকর্ম করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে নারী আর পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভবপর নহে। এটি আল্লাহর সৃষ্টিগত পার্থক্য। নারীরা নরের চেয়ে দুর্বল। শক্তির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। একটি নরের যে পরিমাণ শক্তি বা সামর্থ্য থাকে নারীদের ততটা নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। নরের লিঙ্গের আকার ও আকৃতি এক রকম; নারীদের লিঙ্গ অন্য রকমের। এ লিঙ্গের পার্থক্যগত কারণেও স্বভাব-চরিত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। দৈর্ঘ্য বা উচ্চতার দিক থেকে নারীরা নরের চেয়ে সামান্যতম ছোট হয়। অনেকে প্রমাণ করে বলেছেন স্বাভাবিক নারীর দৈর্ঘ্য থাকে বার সেন্টিমিটারের অধিক। এ পার্থক্য পরিবেশগত কারণেও পার্থক্যের হার সব দেশে বা অঞ্চলে একই রকম থাকে না। ওজনের ক্ষেত্রেও নারীরা নরের চেয়ে অনেক কম থাকে। নারীদেহের ওজনে যে কোন স্বাভাবিক পুরুষের চেয়ে পাঁচ কিলোগ্রাম কম। শিরা উপ-শিরার গতি ও শক্তির দিক থেকেও নারী জাতি পুরুষের চেয়ে অনেক দুর্বল। নারীদের শিরা-উপশিরা নরের চেয়ে স্বতন্ত্র। নারীর শিরার স্পন্দনের দ্রুততাও ধীরতার ক্ষেত্রে অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। নরের শিরাগুলো নারীদের শিরা থেকে দৃঢ়তর, তেমন দ্রুততর। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা ও শক্তির দিক থেকেও নর-নারীর ভেতরে বড় রকমের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিঃশ্বাসের ভেতর দিয়ে যে কার্বলিক এসিডের রেণুগুলো বেরিয়ে আসে, তা দেহের ভেতরকার তাপের প্রভাবে গরম হয়ে যায়। নিঃশ্বাসের সময় নর প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১১ড্রাম কার্বন জ্বালিয়ে দেয়।

পক্ষান্তরে নারী ঘণ্টায় ৬ ড্রাম জ্বালায় মাত্র। এতে প্রমাণিত হয় যে, নারীদেহের শক্তিজাত তাপ পুরুষের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। নরের মগজ সাধারণত গড়ে ৪৯.১০ আউন্স, আর নারীর ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স। এ ওজনের তারতম্যের কারণেই বুদ্ধি প্রখরতা ও মন্থরতা নির্ভরশীল। তাই বলা যায় নর ও নারীর মগজের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের মগজের ওজন নারীর মগজের চেয়ে সাধারণত ১ ড্রাম বেশি। নারীদের মগজে শিরা ও প্যাচ খুব কম। তার আবরণ ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ। এ সব কারণে নর-নারীর মধ্যে এ সৃষ্টিগত পার্থক্যকে কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না।

এভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের চেয়ে, নারীদের শারীরিক শক্তি, দৈহিক কাঠামো ও গঠন এবং মেধার দিক থেকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদেরকে সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্যতম করে তৈরি করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের শারীরিক কাঠামো, দৃঢ়তা, সুস্থতা, ঋতুস্রাব, গঠন এবং হরমোনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নর ও নারীর জন্য একই ধরনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেনি। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, নর ও নারীর যৌন অনুভূতি, জীববিজ্ঞানের বাস্তবতা ও সামাজিক পরিবেশ হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাদের দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও অধিকার সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

২. নারীর মানসিক পার্থক্য

মেধাগত এবং মানসিকগতভাবেও তারা নরের চেয়ে পেছনে আছে। নারীর জ্ঞানশক্তি নরের জ্ঞানশক্তি থেকে যতদিন দুর্বল ঠিক ততখানি পার্থক্য দেখা দেয় তাদের রুচিবোধের ভেতর। তাদের স্বভাব সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তাই দেখা যায় তাদের ভাল-মন্দ বিচার পুরুষের ভাল-মন্দ বিচারের সাথে সাধারণত এক হয় না। তাই নারীর ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। নারীরা হাল্কা ব্যাসিক এসিডের ঘ্রাণ বিশ হাজারের এক ভাগ হলে অনুভব করতে পারে। পক্ষান্তরে নর এক হাজার ভাগের একভাগ হলেই অনুভব করতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের ঘ্রাণশক্তি নরের চেয়ে দুর্বল। স্বাদ ও ঘ্রাণে এবং স্মরণশক্তির দিক দিয়ে নরেরা নারীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

৩. নারীর অঙ্গের পার্থক্য

নারীরা গর্ভধারণ করতে পারে। নরেরা তা পারে না। নারীরা সন্তানকে দুধ খাওয়ানের কারণে তাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকে। তাদের ভিতরের অঙ্গে জরায়ু আছে। এ অঙ্গগুলো তাদের বেশি। আর এ কারণে তারা নারী। এ বৈশিষ্ট্য নারীদের সম্পূর্ণভাবে রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের ওপরই নির্ভর করে তাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন আলাদা, স্বভাব আলাদা। তাদের অনুভূতি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। যে কোন প্রভাব অতি সহজেই তাদের মনে দাগ কাটে। তারা নরের তুলনায় বেশি দুর্বলমনা। তাদের যৌন ক্ষুধা উপশমের পদ্ধতিও আলাদা। পুরুষ যেভাবে যৌন-সুখ ভোগ করে তারা অন্যভাবে ভোগ করে। উত্তেজনাও তাদের বহু দেরীতে আসে। নর নারীকে দেখামাত্র উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নারীকে অনেক নিয়ম-কানুন পালন করে উত্তেজিত করতে হয়। এসব কারণে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

৪. নারীর সামাজিক দায়িত্ব পালনে পার্থক্য

মানুষের রূহ অনন্তকালের জন্য স্থায়ী। তবে এ রূহকে স্বল্পতম সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে সৎ কল্যাণ করার জন্য। এ কর্মের ওপরই নির্ভর করে পরকালীন জীবনের অনন্ত সুখ। এ পৃথিবীতে মানুষের কর্মের স্থল দুটি। একটি পরিবারে, অন্যটি পরিবারের বাইরে। নর ও নারীর এ দায়িত্ব পালনের ভিন্নতা রয়েছে। নর ও নারী মিলেমিশে এ সংসার জীবনকে সুন্দরময় করার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ইসলামে। নর কাজ করবে বাহিরে, নারী থাকবে ঘরে। দুজনই যদি একই করে তাহলে আরেকটি কাজ সমাধান হওয়ার সুযোগ নেই। বলা যায় নারী যদি পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে বাইরে চলে যায় তাহলে পরিবারের যাবতীয় কাজ কে করবে? হয়তো কে ঘরে করবে, আর কে বাইরে করবে– তার দায়িত্ব অধীনস্থ করে দেয়নি। এটা নির্ধারণ করে, মুক্ত করে বা স্বাধীন করে নর বা নারীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই এ দায়িত্ব নিয়ে নারীরা আজ সংশয়ে আছে; কিন্তু গর্ভে সন্তান ধারণ তো আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ দায়িত্ব থেকে নারী তো ইচ্ছা করলে মুক্ত হতে পারে না। কই এ দায়িত্ব নিয়ে তো তাদের অমনোযোগিতা নেই। কারণ এটা তাদের স্বাধীন মনের বাইরে। এর ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহলে ঘরের কাজ করতে এত আপত্তি কেন? এটা তো আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই নারীদের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে প্রথমে তারা সন্তান গর্ভে ধারণ করে। এ দায়িত্ব নরের নেই। সন্তানকে লালন-পালন করা, স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে তা আঁকড়িয়ে রাখা, দুধ খাওয়ানো হল নারীর প্রথম দায়িত্ব। এ দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব সংসারে রাণী হিসেবে সংসার পরিচালনা করা। "সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে" প্রবাদ বাক্যটি যথার্থ সার্থকতায় রূপ দেয়াও তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। মসজিদে ইমামতি তারা করতে পারে না। এ দায়িত্ব নরের। সাক্ষীর ক্ষেত্রে তাদের ২ জন নারীকে একজন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– "এবং নারী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণারেক্ষণকারিণীর কর্ত্রী।" নর ও নারীর জ্ঞান বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও দৈহিক আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারতম্য করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনে নর ও নারীর মধ্যে কর্ম বণ্টনের নীতি পূর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই রোজগার ও শ্রম মেহনতের জন্য দায়িত্বশীল আর নারীকে করা হয়েছে ঘরের পরিচালিকা। এজন্যে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– "তাদের ঘরই তাদের জন্যে সুখ শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের আকর।" নারীরা ঘরে বসেই আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। মহানবী ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন– "যে মেয়েলোক তার ঘরে অবস্থান করলো, সে ঠিক আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মত কাজ সম্পন্ন করতে পারলো।" ইমামতি করা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের নামাযের স্থান সম্পর্কে

রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– "আল্লাহর কাছে মেয়েলোকের সে নামায সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়, যা সে তার ঘরের অন্ধকারতম কোণে পড়েছে। এভাবে নর ও নারীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্বে প্রভেদ করেছেন। জানাযায় যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত উম্মে আতীয়া (রা) বলেছেন– "রাসূলে করীম ﷺ আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু নরের জন্য এটা স্পষ্টভাবে বৈধ। প্রয়োজনের তাগিদে, না গেলেই নয় এরূপ ক্ষেত্রে নারীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে যাওয়া শর্ত দেয়া হয়েছে। নিরুপায় হলে তারা অবশ্য ঘরের বাইরে যেতে পারে। নবী করীম ﷺ বলেছেন– "তোমরা আল্লাহর বাদীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো।"

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে– "আল্লাহর বাদীদেরকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করো না।" নারীদের একা সফর করার বিধান রাখা হয়নি। যেতে হলে মুহাররম পুরুষকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। নবী করিম ﷺ বলেছেন– "মেয়েলোক আদৌ বিদেশ সফর করবে না, তবে কোন মুহাররম পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে করতে পারে।" নরের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে নারীদের জন্য অলংকার পরা জায়েয আছে। সুগন্ধি ছাড়া প্রসাধন ব্যবহার নারীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে নরের জন্য প্রযোজ্য নয়। জুমআর নামায পড়াও নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– "জুমআর নামায জামায়াতের সাথে পড়া সব মুসলমানদের ওপরই ফরয। তবে চার শ্রেণীর লোকদের তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে ঃ ক্রীতদাস, মেয়েলোক, লেংড়া ও রোগী।"

নারী ও নরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে তাদের অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য বিদ্যমান। নারীদের প্রকৃত স্থান এবং আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর। এখানে থেকেই তারা প্রতিটি মৌলিক অধিকার অর্জন, সম্মান লাভ এবং আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। এতে কোন অসুবিধে হয় না। মানুষের মধ্যে নর ও নারী – এ শ্রেণীবিভাগের কারণে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। যার যার দায়িত্ব থেকে সে সে ইবাদত করবে, সমাজে সুখ ও শান্তি আনয়ন করবে এবং নর ও নারী উভয়কে সহযোগিতা করবে। নরকে দেওয়া হয়েছে বাহিরে কাজ আর তা সম্পন্ন করার জন্য যে যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও কাঠিন্য, অনমনীয়তা, কষ্ট, সহিষ্ণুতা, দুর্ধর্ষতার প্রয়োজন, তা কেবল পুরুষদেরই আছে। আর মেয়েদের আছে স্বাভাবিক কোমলতা, মসৃণতা, অসীম ধৈর্যশক্তি, সহনশীলতা, অনুপম তিতীক্ষা ঘরের অংগনকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলা, মানব বংশের কুসুম কোমল লোকদের গর্ভে ধারণ, প্রসবান্তে স্তন দান ও লালন-পালন করার দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও আল্লাহর মৌলিক ইবাদত করা হল তাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়
পারিবারিক জীবনে নারী

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিবাহ

"এবং প্রতিটি জিনিসের আমরা জোড়া বানিয়েছি। সম্ভবত তোমরাই তা থেকে শিক্ষা নেবে।"[৬১]

বিবাহ এবং প্রকৃতির বিধি

বিয়ে-শাদী, স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দ মানবস্বভাবের যৌন প্রবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে, এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা যা আল্লাহ মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখানে আমরা যৌন-বিজ্ঞানের কোনো পরিভাষা বা বিভিন্ন যৌন পর্যায়ের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিনে; বরং এর পেছনে সুপ্ত প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করবো এবং সহজ ভাষায় এটাকে আমরা 'মানবস্বভাব' বলেই অভিহিত করবো। বিবাহবিধি আসলে সেই বিশ্বপ্রকৃতির বিধান যার বন্ধনে আমাদের গোটা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আবদ্ধ রয়েছে। আর এর ওপরেই নির্ভরশীল রয়েছে মানব-বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

"এবং সব জিনিসেরই আমরা জোড়া বানিয়েছি, সম্ভবত তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।"[৬২]

আমাদের বিশ্বাস 'সব জিনিসের' জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। অবশ্য আমাদের ভাষা, জ্ঞান ও পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট সব প্রাণী ও জড় এবং আমাদের জানা ও অজানা, বাক্শীল ও বাক্হীন সব জিনিসই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ আরো বলেছেন–

"পবিত্র সেই যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা সে পৃথিবীর বৃক্ষলতা হোক বা স্বয়ং তাদের নিজ অস্তিত্ব (অর্থাৎ মানবজাতি) অথবা ওসব জিনিস যে সম্পর্কে এদের ধারণা নেই।"[৬৩]

---

[৬১] আল কুরআন : আয যারীয়াত-৪৯।
[৬২] আয-যারীয়াত-৪৯।

মোটকথা, এই বিবাহবিধি কোনো একশ্রেণি বা জাতির বিধানই শুধু নয়; বরং দুনিয়ার সব মানুষ, জীবজন্তু-পশুপাখি, বৃক্ষলতা-গুল্ম, জড়-পাথর সব কিছুই এই বিধানের আওতাধীন রয়েছে। এ হচ্ছে গোটা দুনিয়ার স্বাভাবিক চাহিদা। এজন্যে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক জোড়াকে এমন ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার সাথে অন্য কোনো জাত বা শ্রেণির কোনো মিল নেই। এভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে প্রতিটি জাত ও শ্রেণির প্রকার বিন্যাস করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে পজেটিভ ও নেগেটিভ ব্যবস্থার মাধ্যমেও আমরা বিষয়টির বাস্তবতা অনুভব করতে পারি। নেগেটিভ ও পজেটিভ তাদের একতার মিল। উভয়ের মিলনের ফলেই আলোকের সৃষ্টি হয়। আর প্রাকৃতিক বিধির অনুসরণ ছাড়া এই দুয়ের মিল কখনও সম্ভব নয়। যদি এ দুয়ের মিল না হয় তাহলে তা থেকে উপকৃত হওয়ার কোনো আশা করা যায় না। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য জিনিসের উদাহরণও একই রকম।

বিয়ে ও মানবস্বভাব

মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তি– সে নর হোক বা নারী, স্বাভাবিক নিয়মে যৌনপ্রবণ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সঙ্গম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবিক পূর্ণতা অর্জিত হতে পারে না। এই সত্যতার ওপর আলোকপাত করেই আল্লাহ বলেছেন :

"আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীসমূহের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং (তিনি) তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে সেসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা–ভাবনা করে।"[৬৪]

উপরের কুরআনী আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যতা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। প্রথম কথা যে, স্ত্রীদের সৃষ্টি হয়েছে আমাদেরই নিজ অস্তিত্ব থেকে, অর্থাৎ উভয়কে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে– এভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েই অর্ধেক মানুষ। উভয়ের মিলনই উভয়কে পূর্ণতা দান করে। দ্বিতীয় কথা হলো– স্বামীর শান্তির উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছে শান্তির প্রতীক। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, বিয়ের আধ্যাত্মিক

---

[৬৩] ইয়াসীন : ৩৬।

[৬৪] সূরা রুম, আয়াত-২১।

ও মানবিক উপকার হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া। এই তিনটি সত্যতার ওপর চিন্তা করলে আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যের বিভিন্ন দিক যেভাবে পরিলক্ষিত হয় তাতে আমাদের মন-মগজ ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং আমরা এসব উপলব্ধির ইতি টানতে পারি বাক্যাংশটির মাধ্যমে–

"নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে সেসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।"[৬৫]

এমনিতে বিধিসম্মত বিয়ের প্রচলন দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ বিশ্বজাহানের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান ও চরিত্র, চেতনা ও উপলব্ধির অসাধারণ শক্তিও দান করেছেন। আসলে এটাই হচ্ছে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরই ফলে প্রেম-ভালোবাসার, আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ একদিকে যেমন জৈবিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তির অধিকারী তেমনি তাকে আধ্যাত্মিক গুণবৈশিষ্ট্য দান করে বিশেষ উন্নত মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বও দান করা হয়েছে। এই বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা দানের মাধ্যমে তাকে সৎকর্ম বা অসৎকর্মের মধ্যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধিও দেওয়া হয়েছে। মানবতার ওপর আল্লাহর এটা বিশেষ দান যে, তাকে একই জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ জৈবিক দিক থেকে মানুষকে নারী ও পুরুষে বিভক্ত করেছেন এবং সামান্য দৈহিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়কে প্রায় একই ধরনের দৈহিক ও মানসিক কাঠামো দান করেছেন যাতে তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখ বুঝতে পারে। আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়কেই উন্নত ও মহত্তর গুণবৈশিষ্ট্য দান করে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে নারী ও পুরুষ হিসেবে কাঠামোগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা বৈপরীত্য নেই। নারী ও পুরুষ উভয়ে একই গুণ ও মর্যাদার অধিকারী। দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে নারী ও পুরুষ বৈদ্যুতিক তারের পজেটিভ ও নেগেটিভের মতো স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে নারী এবং পুরুষের গুরুত্ব অভিন্ন ও সমান।

আমরা ইতোমধ্যেই নারী ও পুরুষের 'জৈবিক বৈশিষ্ট্যে'র পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছি যে, মানুষের মানবিকতার অপরিহার্য দাবি হচ্ছে নারীর কাছ থেকে শান্তি অর্জন করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

"তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীসমূহের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা শান্তি অর্জন কর।"[৬৬]

---

[৬৫] সূরা রুম, আয়াত-২১।

এস্থানে শান্তিটাকে পুরুষদের প্রাপ্য বিষয়ে পরিণত করার ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এর অর্থ যৌনতৃপ্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভাষাগত ধারার দিক থেকে এই অর্থ নেওয়া যেতে পারে না।

বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী এই 'শান্তিকে' আধ্যাত্মিক ও আন্তরিক শান্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া নিছক যৌনতৃপ্তিই যদি এর অর্থ হতো তাহলে তা কেবল পুরুষের প্রাপ্য বিষয়ই হবে কেন? কারণ যৌনতৃপ্তি তো নর-নারী উভয়েই অর্জন করে থাকে। কিন্তু আয়াতে শুধু এক পক্ষকে অন্য পক্ষের কাছ থেকে শান্তি অর্জনের কথা বলে আসলে আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জনের ব্যাপারই স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে দৈহিক যৌনতৃপ্তি অর্থ অপ্রাসঙ্গিক। এটা এজন্যেই বলা হয়েছে যাতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, তাহলো স্বামী-স্ত্রীর যৌবন ঢলে পড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে এক অনবদ্য আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীবনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে যখন উভয়ের মধ্যে সবরকম যৌনকামনা-বাসনার সমাপ্তি ঘটে তখন তাদের মধ্যে এক নতুন হৃদ্যতা গড়ে ওঠে যা স্বামী-স্ত্রীর শেষ জীবনকে করে তোলে প্রশান্ত-মধুর, আর এই সম্পর্ক এতই স্থিতিশীল হয়ে ওঠে যে, দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে না। এছাড়া আয়াতে বর্ণিত শান্তি অর্জনের যে ফলাফল দেখানো হয়েছে তা বংশবিস্তার নয়; বরং ভালোবাসা ও দয়া। এথেকেও তার আধ্যাত্মিক দিক ভেসে ওঠে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা, বিবাহের উপকারিতায় বুঝিয়েছেন যে, এতেকরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা এবং দয়া-সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। এভাবে আল্লাহ মানুষকে মানবিকতার সাথে মিলাতে চান এবং তাদের মধ্যে এতটুকু নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, তারা চিন্তা-ভাবনা ও মন-মানসিকতার দিক থেকে একাত্ম হয়ে যাবে। আর এভাবেই তাদের মধ্যে সত্যিকার প্রেম-ভালোবাসা ও দয়া-সহানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহর এই বাণী মোতাবেক মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থেকে উৎসারিত এই প্রেম-ভালোবাসা এবং দয়া ও সহানুভূতি একান্তই অপরিহার্য।

এটা একটা স্পষ্ট বাস্তব কথা যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও মিলন একান্তই জরুরি। একাকী তাদের কেউই সেই স্নেহ-মমতা ও উদার মননশীলতার অধিকারী হতে পারে না যা সন্তান লালন-পালনের জন্যে সহায়ক প্রমাণিত হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। তাই আল্লাহ এটাকে

---

[৬৬] সূরা রুম, আয়াত-২১।

বৈবাহিক বিধির আকারে আমাদের এখতিয়ারাধীন করেছেন। এথেকে সেই শান্তি অর্জিত হয় যা পূর্ববর্ণিত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা এমন এক বাস্তব সত্য যাকে ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করেছে এবং প্রত্যেকের জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, বর্ণিত উপকার লাভের জন্যে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবে যার দিকে আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তা মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানজনক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতেকরে সমাজে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে- কোনো কোনো লোক স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আপত্তিও তুলে থাকে; অথচ সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে এধরনের আপত্তির মূলে মূর্খতাই সংগোপন থাকে। কারণ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌন তৃপ্তি অর্জন করাই নয়; বরং এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে এক ধরনের আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা প্রেম-প্রীতির বন্ধনে একাত্ম হয়ে যায়। এটাই সৌন্দর্য, এটাই শান্তি এবং এটাই তৃপ্তি; কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে এই সত্যের বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে।

বিয়ে ও সামষ্টিক স্বভাব

মানুষ এক সামাজিক জীব; কিন্তু তার আত্মা ও ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি তাকে সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। মানুষের মধ্যে সামষ্টিক জীবনযাপনের এবং সমাজকে সংগঠিত ও অগ্রগতির দিকে টেনে নেওয়ার অসাধারণ আবেগ কার্যকরী থাকে যা অন্য কোনো জীবের মধ্যে দেখা যায় না। মানুষের এই আবেগ-অনুভূতিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ নবী রাসূল ও সংস্কারকদের পাঠিয়েছেন। এঁরা ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে সঠিক পন্থায় সুদৃঢ় করেন। আর প্রাচীনকাল থেকে আজকের এই আধুনিককাল পর্যন্ত এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সঠিক পন্থায় সুদৃঢ় করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। পারিবারিক সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ইতিবাচক প্রভাব রাখে এবং এটাই হচ্ছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ব্যবস্থা।

বিয়ের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ তার যৌন-বাসনা পূরণের জন্যে একটি সীমারেখা তৈরি করে নেয়। এরপর সে অন্যের সীমায় যায় না। এভাবে সে তার স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে এক নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করে এবং নিজেকে কিছু বিধি-নিষেধের আওতাধীন করে নেয় যাতে অন্যের মানমর্যাদা অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ থাকতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে এক পবিত্র কর্ম। এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন করে সে নিজের সামাজিক জীবনকে করে সাফল্যমণ্ডিত।

বিয়ের দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও সহযোগিতার বিকাশ। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তাদেরকে পরস্পরের সাথে সাহায্য সহযোগিতার বন্ধনকে করে মজবুত। দয়া-প্রেম ও সাহায্য-সহযোগিতার অনুভূতির মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার ভাব উন্মিষিত হয়।

বিয়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রেমের আবেগে উদ্বেলিত স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরের সাথে মেশে তখন তাদের মধ্যে কোনো রকমের লৌকিকতা বা ইতস্ত ত বোধ অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তারা অকৃত্রিম প্রেমের অন্তহীন অন্তরীক্ষে মুক্ত কপোত-কপোতীর মতো বিচরণ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে যে সন্তানের জন্ম হয় তার প্রতি তাদের যৌথ ভালোবাসার কোনো সীমা থাকে না। তারা তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার ফসলের জন্যে জীবনের যেকোনো ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্যেও প্রস্তুত থাকে। এভাবে স্বাভাবিক ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে গড়ে ওঠা সন্তানই সমাজের সৎ ও সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়। এভাবেই সুন্দর ও শান্তি পূর্ণ সমাজের গোড়াপত্তন হয়– যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতা করে ও সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে কাজ করে।

পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য আরেক উপকার হচ্ছে– ব্যক্তি বিয়ের আগে নিজের স্বার্থেই আয় ও ব্যয় করে। বিয়ের পর এবং সন্তান অর্জনের পর তার মনে উদারতার সৃষ্টি হয়। এখন সে শুধু তার নিজের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে না; বরং পত্নী ও সন্তানের সুখ-শান্তির কামনায় সে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে, এতে তার মধ্যে ইতিবাচক ও গঠনমূলক আবেগ ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়। আর এই জিনিসটাই হচ্ছে সুস্থ ও সুন্দর সামাজিক জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর।

বিয়ে ও যৌন প্রবৃত্তি

পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার দৈহিক গঠন পার্থক্যের বিশ্লেষণ করলে বিশেষকরে নারীর প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্রষ্টার আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানববংশ বিস্তারের ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং তা এমন পন্থায় ক্রমবিকাশ দান করা যাতে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। আর যৌন প্রবৃত্তি হচ্ছে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এক পরিতৃপ্ত অনুভূতি লাভের উপায় মাত্র। এটাও একটা বাস্তব সত্য কথা যে, মানুষ বিশেষকরে নারীকে সন্তান প্রজনন ও তার লালন-পালনে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। নারী-সমাজের এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলেন–

"আমরা মানুষকে উপদেশ দিয়েছি যে, তারা তাদের মাতা-পিতার সাথে সততাপূর্ণ ব্যবহার করবে। তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে ধারণ করেছে

এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে জন্ম দিয়েছে এবং তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস লেগে গেছে।"[৬৭]

মানুষ স্বাভাবিকভাবে আরামপ্রিয়, এ কারণেই সে দুঃখ-কষ্টকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলতে চায়। যদি কর্মে তার জন্যে আনন্দের আকর্ষণ না থাকতো তাহলে তার প্রতি চিরবিমুখ হওয়ার জন্যে তার প্রথম অভিজ্ঞতাই ছিল যথেষ্ট। এজন্যে আল্লাহ নর-নারীর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন এবং মিলনের ভাবনাই তাদের মধ্যে আনন্দঘন উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মিলনের তাড়নায় তারা অস্থির হয়ে উঠে। যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ এই বিশেষ আকর্ষণ ও আবেগ-উত্তেজনার সৃষ্টি না করতেন তাহলে বংশবিস্তারের ধারা ব্যাহত হয়ে পড়তো। এজন্যে আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলে দিয়েছেন যে–

"এখানে তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে রাতযাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা বৈধ করে দিয়েছেন তা অর্জন কর।"[৬৮]

এখানে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার 'অর্জন করার' অর্থ বংশবিস্তারের অর্থে গ্রহণ করেছেন। (প্রমাণের জন্যে তাবারী, কুরতুবী ও বায়জাবী শরীফ দ্রষ্টব্য)

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মহাপ্রকৃতি ও মানবসমাজের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ভিত্তিক আলোচনা করেছি। এবার আসুন, আমরা বিয়ে-শাদী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও নীতি-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এ ব্যাপারে কুরআনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন বিয়েকে পরিবার ও সমাজের বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং এটাকে মানুষের যৌনতৃপ্তি অর্জনের সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর উপায় বলে অভিহিত করে। এ সম্পর্কে কুরআনের একটি বাণী হচ্ছে–

"তোমাদের আগেও আমরা অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী ও সন্তানের অধিকারী বানিয়েছি।"[৬৯]

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

"চারটি বিষয় হচ্ছে নবীদের ঐতিহ্য– এর মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে।"[৭০]

প্রিয়নবী বিয়েকে 'দ্বীনের অর্ধেক' বলে তার গুরুত্বকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

---

[৬৭] সূরা আহ্‌কাফ : ১৫।
[৬৮] সূরা বাকারা : ১৮৭।
[৬৯] সূরা রায়াদ : ৩৮।
[৭০] মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী।

"যখন বান্দা বিয়ে করে তখন এভাবে যেন সে তার দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে।" পবিত্র কুরআনে আরো ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে–

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে করিয়ে দাও।"[৭১]

বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–

"যার বিয়ে হয়নি তার বিয়ে করিয়ে দাও কারণ লজ্জাস্থানের নিরাপত্তার জন্যে এটাই পবিত্র ও উত্তম উপায়।"

নবীন যুবকদের প্রতি বিয়ের আহ্বান জানিয়ে প্রিয় নবী বলেন–

"হে নবিনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তাদের বিয়ে করে নেওয়াই উচিত, আর যারা তার ক্ষমতা রাখে না তারা বেশি করে যেন রোযা রাখে কারণ রোযা যৌনবাসনা খর্ব করার উত্তম উপায়।"[৭২]

এ হাদিসের মর্মার্থ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি অতিশয় যৌন উত্তেজনা অনুভব করে এবং তার বিয়ে করার মতো ক্ষমতাও থাকে– অর্থাৎ স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব নিতে পারে তাহলে সে যেন বিয়ে করতে বিলম্ব না করে। কিন্তু এমন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে বেশি বেশি রোযা পালনের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এতেকরে তার স্বাভাবিক যৌনবৃত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইমাম ইবনে হাজম ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে সক্ষম ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ফরয, যদি কোনো সচ্ছল সক্ষম ব্যক্তি বিয়ে না করে থাকে তাহলে সে ফরয কর্তব্যে অবহেলার জন্যে পাপের ভাগী হবে। অন্য এক পক্ষের মতে বিয়ে ঠিক ফরয না হলেও ওয়াজিব অবশ্যই।

ইসলামে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন ও তাগিদে বিয়ের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতো জানা হলো। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মগুরু 'সেন্ট পল' কি অস্বাভাবিক কথা বলেছেন একটু ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, "আমি চাই বিশ্বের সব মানুষ আমারই মতো জীবনযাপন করুক (অর্থাৎ সবাই অবিবাহিত থাকুক)। অবিবাহিত বা বিধবা মহিলাদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে বিয়ে না করাই তাদের জন্যে উত্তম।" এর কারণ দর্শাতে গিয়ে সেন্ট পল বলেন– "অবিবাহিত ব্যক্তি সবসময় তার প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে আর বিবাহিত ব্যক্তি সবসময় নিজের স্ত্রীর চিন্তাতেই বিভোর থাকে।" আর একই যুক্তি তিনি বিবাহিত বা অবিবাহিত মহিলাদের প্রসঙ্গেও দিয়েছেন যে, "বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীকেই প্রধান গুরুত্ব দেয়, এবং প্রভুকে গৌণ গুরুত্ব দেয়; অথচ প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকেই

---

[৭১] সূরা নূর : ৩২।
[৭২] বোখারী ও মুসলিম।

তার প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।" সেন্ট পলের মতে পুরুষ যদি তার যৌন প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে বিয়ে করতে পারে; কিন্তু তা উত্তম নয়। সেন্ট পল বলেন– "কোনো নারীকে পাওয়ার ইচ্ছাই মনে পোষণ করো না। কিন্তু যদি তুমি বিয়ে করেই ফেল তা যেকোনো উর্বশীর সাথেই করনা কেন তাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাদের জীবন আবর্জনাময় হয়ে যায় এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে সেই আশঙ্কাই করি।"

এর অর্থ হলো, সেন্ট পলের মতে বিয়ে করার ইচ্ছে করাটাই অনুচিত, কারণ তাতে খোদার স্মরণে অবহেলা আসে। তাই তিনি বিয়েকে উত্তম পন্থা মনে করেন না। তাঁর এই কথা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা মানব প্রকতি ও স্বভাবের সাথে এর কোনো মিল আছে কিনা তা সত্যিই জিজ্ঞাসা প্রশ্ন। তাছাড়া সেন্ট পলের কথা মতো যদি মিল আছে কিনা তা সত্যিই জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন। তাছাড়া সেন্ট পলের কথা মতো যদি বিয়ে-শাদীর স্বাভাবিক পন্থা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মানববংশ বিস্তারের বৈধ পন্থা কি হবে? এতে করে কি সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলা এবং যৌন ব্যাভিচার ও অনাচার বাড়বে না? যেমন পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান সমাজে আজ বলাৎকার মহামারীর রূপ ধারণ করেছে।

বিয়ের নীতি ভঙ্গ তার প্রভাব ও ফলাফল

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করা পাপ

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা মোতাবেক বিয়ে হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। এতেকরে বৈধ উপায়ে মানুষের স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি অর্জিত হয় আর বিয়ে হচ্ছে পরিবার ও সমাজের বুনিয়াদ। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও সহযোগিতার বুনিয়াদও হচ্ছে বিয়ে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানব অস্তিত্বের স্থায়িত্বের জন্যে বিয়ে জরুরি। আর কেবল বিয়ের মাধ্যমেই যেকোনো মানুষ তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা ও শালীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। বিয়েকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে মানবতার মূল অস্তিত্ব ও তার বিকাশকেই অস্বীকার করা, এর যাবতীয় সুফল থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে বঞ্চিত করা এবং স্বভাবকে তার গলাটিপে হত্যা করা। এরপরেও যদি কোনো সক্ষম ব্যক্তি বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে লোকটি শেষ দরজার আহাম্মক ও মূর্খ। জীবনের উদ্দেশ্য ও চাহিদা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জীবনের এক স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন–

"যে ব্যক্তি সম্পদশালী হয় এবং বিয়ে করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করে, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৭৩]

---

[৭৩] বায়হাকী।

অবিবাহিত জীবন ও তার অপকারিতা

প্রাচীন সমাজে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে অপূর্ণ মনে করা হতো এবং তাকে খোদার নৈকট্য লাভের অযোগ্য মনে করা হতো। সুতরাং সে যুগের সাধু ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জনে সংসারধর্ম বর্জনকে জরুরি মনে করতো। তারা সব রকমের পার্থিব তৎপরতা থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে খোদার ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়তো। এ জন্যে তপ্‌জপ্‌কারী ব্যক্তি বিয়েশাদীর ঝামেলায় পড়তে চাইতো না। কেননা তাদের মতে, এতেকরে আবেগ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং মানুষ সংসারমুখী হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলাম প্রাচীন অন্ধকার যুগের সেই বাতিল ও ভুল ধারণাকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং বিয়েকে পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উত্তম মাধ্যম বলে ঘোষণা করে। প্রিয়নবী এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে পূর্ণ পবিত্রতার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহী তার স্বাধীন মহিলাদের সাথে বিয়ে করা উচিত।"

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, খ্রিস্টান ধর্ম তার প্রথম যুগে অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর আমলে, কখনও বিয়ে বিরোধী ছিলেন না, অনেক পরে জানিনা তাদের পণ্ডিত সমাজ কোথা থেকে এটা আবিষ্কার করে বসলো যে, " বিয়ে খোদার নৈকট্য লাভের অন্তরায়।" সুতরাং তারা তাদের ব্যক্তিগত ধারণাকে ধর্মের নামে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পায়। তারা কিছুদিন পর্যন্ত বিয়েকে আবশ্যকীয় গণ্য করার ব্যাপারে সব খ্রিস্টান স্বাধীন ছিল। কিন্তু চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে আলফিরা নামক খ্রিস্টানদের একটি ক্ষুদ্র দল স্পেনে একটি প্রস্তাব পাশ করে এবং এর মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্ম-নেতাদের ওপর আইনগতভাবে বিয়ে করতে নিষেধ করে। এ সময় খ্রিস্টান বৈরাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পায় যে, তারা কেউ গির্জায় গির্জায় এবং কেউ বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে। এর মাধ্যমে তারা যৌনপ্রবণতাকে দমন করে খোদার নৈকট্য লাভের পথ খোঁজে। ইসলামের আবির্ভাবের পর সংসার বৈরাগীদের সেই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয় এবং খোদার নৈকট্য লাভের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে,–

"এবং সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করে নেয়, আমরা তা তাদের ওপর ফরয করিনি"।[৭৪]

প্রিয় নবীও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন–

"ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।"

---

[৭৪] সূরা হাদীদ : ২৭।

প্রিয় নবী মুসলমানদেরকে সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যের পন্থা থেকে বিরত রাখেন। এজন্যে প্রিয় নবীর প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ সুন্নাতকে অস্বীকার বা অমান্য করার কোনো বৈধতা থাকতে পারে না। অন্যদিকে প্রিয়নবী সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করেন–

"আমার উম্মতের সন্ন্যাস হচ্ছে হিজরত, পাপ ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকা, জিহাদ, রোযা, নামায, হজ এবং উমরা।"[৭৫]

প্রিয়নবীর জীবদ্দশায় কিছু লোক তাঁর ইবাদতের নিয়ম জানার জন্য এলো। যখন তাদেরকে প্রিয় নবীর ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝানো হলো তখন তারা এটাকে অপর্যাপ্ত ভেবে বললেন– তিনি তো নবী, তাঁর সব গুনাহই ক্ষমা করা হয়েছে। অতএব আমাদেরকে আমাদের বিষয়ে ভাবতে হবে। তাদের একজন বললো আমি তো সারারাত নামায আদায় করবো। অন্য একজন বললো– আমি অব্যাহতভাবে রোযা পালন করবো। তৃতীয়জন বললো আমি জীবনে বিয়েই করবো না। প্রিয় নবী যখন একথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাদের কাছে এসে বললেন–

"তোমরা এমন কথা বলেছ! শোন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের চেয়ে বেশি নিজ প্রতিপালককে ভয় করি এবং সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু; কিন্তু আমি রোযা রাখি আবার রাখি না; রাতে নামায পড়ি আবার পড়ি না, নিদ্রাও যাই এবং মহিলাদের সাথে বিয়েও করি এবং এটাই আমার সুন্নাত। যারা আমার সুন্নাতকে উপেক্ষা করবে তারা আমার নয়।"

যৌন নোংরামি ও তার কুফল

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেসব লোকদের বিষয়ে আলোচনা করলাম যারা বিয়েকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতাবিরোধী মনে করে বর্জন করে থাকে। এখন আমরা সেসব লোকদের ব্যাপারে আলোচনা করবো যারা ব্যভিচার ও নিত্য-নতুন যৌন বিলাসিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিয়ের পথ পরিহার করে। তারা মনে করে– বিয়ে করলে পরে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে যৌন সম্ভোগ করতে পারবে না।

ব্যভিচার ও যৌন বিলাসিতার এই ঘৃণা প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা। আর এর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকা। ওইসব পাশ্চত্য দেশগুলো তথাকথিত অবাধ স্বাধীনতার আড়ালে যুবক-যুবতীদের যথেচ্ছ যৌন অনাচার সৃষ্টির পথ করে দিয়েছে। আধুনিক

---

[৭৫] বুখারী ও মুসলিম।

জড়বাদী সভ্যতার দর্শন ও শিক্ষা মোতাবেক মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধন-সম্পদ, যশ,খ্যাতি এবং এসবকেই উন্নতির মানদণ্ড মনে করা হয়। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক, চারিত্রিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে এবং এখানে শ্লীলতা ও শালীনতার কোনো স্থান নেই। লজ্জা-শরমের চিন্তা এখানে একান্তই গৌণ। প্রতিটি মানুষ এখানে লাগামহীন স্বাধীন, যার যা মর্জি সে তাই করতে পারে– ব্যস, দেশ ও জাতির স্বার্থবরোধী কোনোকিছু না করলেই হলো। এই লাগমহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে গোটা পাশ্চত্যে অবাধ যৌন নোংরামির এক অপ্রতিরোধ্য সয়লাব এসে পড়ে। পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তি এমনকি বড় বড় নামকরা লোকরাও আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী লোকেরা নিজেদেরকে স্ত্রী-পরিবার ও সমাজের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করে বেশ্যা-পতিতা ও আধুনিকা কলগার্লদের সাথে যৌন নোংরামিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের বিবাহিত নরনারীরাও প্রকাশ্যভাবে অন্য নরনারীদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে বৈধ ও স্বাভাবিক মনে করে। মৌমাছি যেমন এক ফুলের রস শোষার পর অন্য নতুন ফুল ধরে– পাশ্চাত্যের নরনারীরাও তদ্রূপ। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন দেহই তাদের যৌন কামনার বস্তু। আর তার জন্যে দরকার হলে কাউকে খুন করতেও তাদের বিবেকে বাধে না। এই ঘৃণ্য যৌন স্বেচ্ছাচারিতার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থা তার পুরো কাঠামোসহ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইউরোপ আমেরিকায় এই অবক্ষয় চলছে বেশ কয়েক যুগ থেকে আর তা দিন-দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। তাদের এই পাপাচার ও নোংরামির ঢলে শুধু তারাই ডুবছে না; বরং তাদের অন্ধ অনুকরণকারী অন্যান্য দেশের জনগণও ডুবে মরছে।

অধুনা পাশ্চাত্যের কোনো কোনো পরিণামদর্শী চিন্তাবিদ আজকাল আশঙ্কার শেষ সতর্ক ঘণ্টা বাজাতে শুধু করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পারিবারিক ব্যবস্থার অবসান ঘটলে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যে অন্য কোনো উপায়ই থাকবে না। তাদের মর্মান্তিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের বিখ্যাত চিন্তাবিদ মার্শাল বেটন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিজের জাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন– "নিজেদের ভুলভ্রান্তিকে ভালো করে মাপজোক করে নাও, কারণ তোমাদের পাপ অপরাধের পাল্লাকেই অধিকতর ভারি দেখাচ্ছে। তোমরা নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করেছ। যৌন নোংরামির পিছনে তোমরা বেপরোয়াভাবে ছুটে চলেছো, এখন দেখতে থাকো যে, তোমাদের যৌন নোংরামি তোমাদেরকে কোনো নিয়মের মুখেমুখি করে দিচ্ছে।"

ইসলাম, গোটা বিশ্বমানবতাকে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের যথার্থ শিক্ষিত ও সুসভ্য বানাতে, তাদের সত্যিকার মানবতার পথ দেখাতে এবং তাদেরকে আসল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্য সেই উচ্ছৃঙ্খল নোংরামির উৎসকেই বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম যৌন নোংরামিতে অভ্যস্ত নারী ও পুরুষের জন্যে এমন কঠোর শাস্তির বিধান করেছে যার কল্পনা করলেও তাদের শিহরণ জাগবে। এমনকি কোনো কোনো অবস্থায় যৌন অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ড দানের বিধানও রয়েছে। ইসলাম সমাজকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেক মানুষের মান-মর্যাদার নিরাপত্তা বিধানের বৃহত্তম স্বার্থে এ জরুরি আইন-বিধি প্রবর্তন করেছেন। এতেকরে সাধারণ মানুষ যৌন অপরাধীদের পাশবিক হামলা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবনযাপনের সুযোগ পাবে। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম এই কঠোর শাস্তি নিছক দুইজন অপরাধীকে এজন্যেই দেয় না যে, তারা কিছুক্ষণের জন্যে অবৈধ স্ফুর্তিতে মেতে উঠেছিল বরং সমাজকে সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচানোই তার আসল উদ্দেশ্য, যা এই অপরাধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তাধারার ধ্বজাধারী তা তার নিজের কথায় চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং বস্তুগত আরাম-আয়েশ– এই দুটি বিষয়কেই তারা পুরো মানবগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য বলে বলতে চায়। আর এই উদ্দেশ্যে তারা যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে তৈরি। পশ্চিমা সভ্যতার পতাকাবাহীরা কোনো নীতি-চরিত্রের ধার ধারে না বা এমন কোনো ঈমান-বিশ্বাসকে বিবেচনাযোগ্য মনে করে না যা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থি হতে পারে। তারা যা দেখে না– তা মানে না। পাশ্চাত্যের এই বস্তুপূজারিরা কোনো অদৃশ্য সত্তার শক্তিকেও করে না; তাদের কোনো রিযিকদাতা, কোনো স্রষ্টা বা মালিক বা মৃত্যুর পর কারো দরবারে উপস্থিত হতে হবে বলে বিশ্বাসকেও তারা অবিশ্বাস করে। স্রষ্টা যে তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, জীবনযাপনের অবলম্বন দান করেছেন; সুখ-দুঃখ আর বিপদ মুসিবতে অথবা চরম নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষকে যেকোনো মহান শক্তি সাহায্য-দয়া করেন তাও তারা স্বীকার করে না। তারা এই বাস্তবতাকেও স্বীকার করে না যে, দুনিয়ার সব প্রাণীকে তাদের স্রষ্টা আহার যোগান এবং তাদের জীবনধারণের সব আয়োজন স্বাভাবিকভাবে করে রেখেছেন। মোটকথা, প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অগোচরে কোনে অস্তিত্বকে, কোনো শক্তিকে, কোনো স্রষ্টাকেই তারা বিশ্বাস করে না, স্বীকার করে না। এই অবিশ্বাস আর অস্বীকারই হচ্ছে তাদের স্বার্থপ্রীতি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম নৈরাশ্য ও উদ্বেগের মূল কারণ। বস্তুগত দিক থেকে সবকিছু পেয়েও তারা অসন্তুষ্ট ও

বিচলিত–অস্থির এবং বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াই যৌন সম্ভোগের যে পাশবিক প্রবণতা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণও একই। এমতাবস্থায় তারা বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনে রাজি হবে, তা কি চিন্তা করা যায়?

আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এক দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে, যা তার রোগীকে কেবল বিয়ে করার স্বাভাবিক পথ থেকেই রুখছে না; বরং তার মানবিক অস্তিত্বকেও বিকৃত করে ছাড়ছে। এতেকরে তারা সৎভাবে জীবনযাপনের পদ্ধতি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এটা এমন অনস্বীকার্য সত্য কথা, যার ব্যাপারে যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। এই ভুল ও বিকৃত বুনিয়াদের ওপর কোনোদিন কোনো সভ্যতা পূর্ণ সভ্যতারূপে গড়ে উঠতে পারে না। বস্তুত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতই চাকচিক্যময় বলে মনে হোক না কেন আসলে তার ভিত্তি খুবই ঠুনকো, খুবই নড়বড়ে। এথেকে কোনো প্রকৃত সুফলের আশা করা যায় না। পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সৃষ্ট নানারকম জটিল ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে তারা জেনেশুনে কথায় ও কাজে আল্লার অস্তিত্ব এবং দ্বীনের ওপর কার্যকরী বিশ্বাস স্থাপন করবে। একমাত্র ঈমানই তাদেরকে সকল দুষ্কর্ম ও তার ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমান তাদেরকে এই অনুভূতিও দান করবে যে, এই ধনসম্পদ সবকিছু অস্তবেলার ছায়ার মতো– যা এক নির্ধারিত আইন মোতাবেক সব মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং কেউ শুধু ততটুকুই পাবে– যা তার প্রতিপালক তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এ সম্পর্কে মানুষের স্রষ্টা স্পষ্টতই বলেছেন–

"এ তো যুগের উত্থান-পতন মাত্র, যা আমরা মানুষের মধ্যে আবর্তিত করতে থাকি।"[৭৬]

প্রকৃতপক্ষে ঈমানই হচ্ছে সেই আলো যা থেকে আশার কিরণ প্রস্ফুটিত হয়। এখানে দুষ্কর্ম ও দুশ্চিন্তার কোনো স্থান নেই। এখানে নেই কোনো নৈরাশ্য, কোনো অরাজকতা আর কোনো বিশৃঙ্খলা। এ ব্যাপারে কুরআনের একটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে নিতান্তই যৌক্তিকতার সাথে মানুষকে সুকৃতির জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন–

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে করিয়ে দাও। তারা যদি দরিদ্র হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্, নিজ দয়ায় তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদার ও মহাজ্ঞানী।"[৭৭]

---

[৭৬] আলে ইমরান : ১৪০।

[৭৭] সূরা নূর : ৩২।

কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন– "যে অবিবাহিত, তোমরা তার বিয়ে করিয়ে দাও এবং এ ব্যাপারে দারিদ্র্য বা অভাব অনটনের ভিত্তিতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কেননা সব ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত এবং তিনি নিজেই উদারতা ও বদান্যতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।"[৭৮]

বলাবাহুল্য, এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং সব মুসলমান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান। আল্লাহ যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন তাতে কোনোরকম সন্দেহ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর প্রায়ই বলতেন যে– "তোমাদেরকে আল্লাহ বিয়ে করার যে আদেশ দিয়েছেন তোমরা তা পূরণ কর; আল্লাহ তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।" এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বলেন– "আমি অত্যন্ত বিস্মিত যে, লোকেরা বিয়ে করে ধনী হচ্ছে না কেন, অথচ আল্লাহ বলেছেন– 'তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ নিজ দয়ায় ধনী করে দেবেন।"

এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা বিয়ে না করার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আরো সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিয়ে ছাড়া কোনো সমাজই বিপথগামিতা ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত হতে পারে না। কেবল বিয়ের মাধ্যমেই সমাজে সততা ও পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এরই মাধ্যমে আসতে পারে প্রকৃত সুখ ও সমৃদ্ধি। আল্লাহ এসব গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তির জন্যে সমৃদ্ধি দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরিপন্থি পথে চলে, সমাজে নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে দেউলিয়া হয়ে এবং বিপুল ধনসম্পদের মালিক হওয়ার পরেও চরিত্রহীন ও অবিশ্বাসী লোকেরা নিজেদেরকে বড্ড অভাবী ও অসন্তুষ্ট মনে করে। বস্তুত ঈমানই মানুষকে প্রকৃত সম্পদ ও সন্তুষ্টি দেয়; আর ঈমান ছাড়া কেউ কোটিপতি হলেও জীবনের সুখ-শান্তি ও সন্তুষ্টি থেকে সে বঞ্চিত থাকে। ঈমানদার মানুষের সমাজকে বলা হবে সৎ ও সুস্থ সমাজ আর ঈমানবিহীন সমাজকে বলা হবে নোংরা শয়তানি সমাজ। এই উভয়ে তুলনা করে আল্লাহ বলেন–

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ ক্ষমা ও দয়ার প্রত্যাশা দেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী।"[৭৯]

---

[৭৮] ইবনে কাসীর– তৃতীয় খণ্ড।
[৭৯] সূরা বাকারা : ২২৮।

বিয়ের নির্বাচন

স্ত্রী নির্বাচন

যখন কোনো ব্যক্তি এ কথাকে খুব ভালো করে জেনে বুঝে নেয় যে, বিয়ের নীতি এক অপরিহার্য নীতি ও বিধি এবং এটা তার স্বভাবেরই চাহিদা– তখন প্রকৃত অর্থে সে বাস্তব সত্যতা অনুভব করে নেয়। আর এভাবেই সে সেই পন্থার খোঁজ পেয়ে যায় যা তাকে ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রাখা, বৈধভাবে যৌনতৃপ্তি অর্জন এবং স্নেহ-ভালোবাসা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবাভিত্তিক সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা। এ জন্যে একজন উত্তম স্ত্রী কেবল সেই নারীই হতে পারে, যে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ রয়েছে এবং উত্তম পন্থায় তার স্ত্রীসুলভ দায়িত্ব পালনে সক্ষম, নীতি, চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে হবে সে নারী আদর্শস্থানীয়া। সুতরাং এমন স্ত্রী নির্বাচন করা উচিত যার অন্তর হবে ঈমানের আলোকে উজ্জ্বল এবং কথায় ও কাজে হবে যথার্থ মুসলিম। যার চরিত্র হবে উন্নত, যে শিক্ষায় ও সততায় হবে সুন্দর, শ্লীলতা-শালীনতা, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদার ব্যাপারে যে হবে সচেতন ও সজাগ।

ধন-সম্পদের মান

সমাজে এমন অনেক দেখা যায়, জীবনের আসল সুখ-সমৃদ্ধি সম্পর্কে অজ্ঞাত। তারা মূর্খতাবশত সবসময় অন্যের ধনসম্পদ ও টাকাকড়ির দিকে লালসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এবং বিয়ের মাধ্যমে ধনসম্পদ ও টাকা পয়সা পেতে চায়। এরা কেবল ওসব পাত্রীর অনুসন্ধান করে বেড়ায় যেখান থেকে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলাবাহুল্য লালসার এই দৃষ্টিকোণ একান্তই নীতি বিরোধী এবং এতেকরে কোনোদিন দাম্পত্য জীবনে সুফল পাওয়া যায় না। এতেকরে বিয়ের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয় না। এ ধরনের লোভী ব্যক্তি সামান্য স্বার্থের জন্যে জীবনের আসল সুখসম্পদ থেকে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে। এ ব্যাপারে প্রিয় নবীর একটি বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন–

"তোমরা ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নারীদের বিয়ে করো না, কেননা এতে করে তাদের অবাধ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"[৮০]

---

[৮০] ইবনে মাজা, বায়হাকী, বাযয়াম।

বংশমর্যাদা

কোনো কোনো লোক পাত্রীর বংশমর্যাদা বা সমাজে তার পরিবারের সম্মান বা প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে গুরুত্ব দেয়। শুধু সেই মেয়েকেই বিয়ে করতে চায়, যার বংশমর্যাদা বা পরিবারিক প্রভাব রয়েছে; কিন্তু এটাও চরম ভ্রান্তিপূর্ণ প্রথা। এ ধরনের মানসিকতা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি। তারা হয়তো জানে না যে, এই পার্থিব মান-মর্যাদার কোনো গুরুত্ব নেই। এটা খুবই ঠুনকো মর্যাদা। এ সম্পর্কে প্রিয় নবী বলেছে–

"যে ব্যক্তি মহিলার সাথে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে বিয়ে করে– আল্লাহ তাকে আরো নিকৃষ্ট করে দেন।"[৮১]

রূপ-নক্সা

আবার কোনো কোনো ব্যক্তি তাদের পাশবিক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে মেয়ের বাহ্যিক রূপ-নক্সাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এরা বাহ্যিক রূপেরই মোহগ্রস্ত। আসলে আসল সৌন্দর্য সম্পর্কে এরা কিছু জানে না অথবা রূপ-সৌন্দর্যের অর্থই তারা বোঝে না। নারী মানুষ মাত্র। আর মানুষের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য হচ্ছে তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। যার চরিত্র-ব্যবহার উত্তম এবং যার অন্তরের রূপ ও সৌন্দর্য আছে– আসলে সেই হচ্ছে প্রকৃত রূপসী ও সুন্দরী। প্রিয় নবী স্ত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–

"দ্বীনদার নারীর সাথে বিয়ে করো, তোমার কল্যাণ হবে।"[৮২]

এক ব্যক্তি প্রিয় নবীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো– "আমি এমন এক মহিলাকে পছন্দ করি যে খুবই সুন্দরী রূপসী এবং উচ্চ পরিবারের মেয়ে; কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? প্রিয় নবী তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করলেন। লোকটি আরেকবার এসে একই প্রশ্ন করলো; প্রিয় নবী আবারও নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার প্রিয় নবীর কাছে একই প্রশ্ন নিয়ে এলে প্রিয় নবী তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন–

"প্রেমময়ী ও একাধিক সন্তান উৎপাদনে সক্ষম মহিলার সাথে বিয়ে করো– আমি যেন রোজ হাশরে তোমার জন্য গর্ব করতে পারি।"[৮৩]

এখানে 'প্রেমময়ী' বলতে এমন চরিত্রবতী ও ঈমানদার মহিলাকে বোঝানো হয়েছে যে তার স্বামীকে মনে-প্রাণে ভালোবাসবে।

---

[৮১] সর্বজনস্বীকৃত সহীহ হাদিস।

[৮২] বুখারী ও মুসলিম।

[৮৩] আবু দাউদ, নাসাঈ।

স্বামী-নির্বাচন

একজন যথার্থ স্বামীর যোগ্যতা ও মান নির্ভর করছে তার চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলির ওপর। এজন্যে স্বামী নির্বাচনের সময় নারীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর চারিত্রিক ও ঈমানী বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখতে হবে। প্রকৃত ঈমানদার এবং চরিত্রবান ব্যক্তিই উত্তম স্বামী হওয়ার যোগ্য। এছাড়া যারা ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ইত্যাদিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারা আসলে নিজেদের হীনমানসিকতারই পরিচয়ই পেশ করে। নারীর বিবেচনা করার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট যে, লোকটি সুস্থ ও চরিত্রবান মানুষ কিনা। আর পুরুষের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গুণ হচ্ছে তার খোদাপ্রেম ও পরহেযগারিতা। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হচ্ছে–

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানী আল্লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে।"

এজন্যে যে ব্যক্তি ঈমানদার, চরিত্রবান, শিক্ষিত, মিষ্টভাষী, ভদ্র এবং পরোপকারী সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি– তা তার পারিবারিক ও বংশমর্যাদা যাই হোক না কেন। তার দেহের বর্ণ যাই হোক আর তার পেশা যাই হোক না কেন– সে যেকোনো পরিবারের যেকোনো মেয়ের সাথে বিয়ে করার উপযুক্ত পাত্র। এই বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মহামানবতার মুক্তিদূত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতিকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন-

"যখন তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব আসে– সে সভ্য ও চরিত্রবান তাহলে তার সাথে বিয়ে করে নাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে বিভেদ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।"[৮৪]

স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার

নারী– তা সে অবিবাহিত হোক, বা তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা– সে তার বিবাহের জন্যে উত্থাপিত যেকোনো প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। কোনো মেয়ে বা মহিলাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার অধিকার তার পিতা, ভাই বা কোনো দায়িত্বশীল কারোরই নেই। এ ব্যাপারে প্রিয় নবীর হাদিস অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন–

"স্বামী-পরিত্যক্তা (অর্থাৎ যে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত) নারীর বিয়ে তার অনুমতি অর্জন ছাড়া দেওয়া যাবে না।"[৮৫]

---

[৮৪] তিরমিযী।

[৮৫] বুখারী ও মুসলিম।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী বলেছেন–

"কুমারীর (মেয়ের) বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দেওয়া যাবে না।" এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, আমি প্রিয় নবীকে বললাম– "কুমারী মেয়েতো লজ্জা করে, সে কিভাবে অনুমতি দেবে? প্রিয় নবী জবাব দিলেন– তার নীরবতাই হচ্ছে অনুমতি।"[৮৬]

অর্থাৎ মেয়ের কাছে যদি অনুমতি চাওয়া হয় এবং তাতে চুপ করে থাকে– কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে তাহলে সেটাকে অনুমতি বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যদি বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তের বিয়ে হয়, তার পরামর্শ ও স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি ছাড়া যদি বিয়ে দেওয়া হয় তবে সেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। অন্যদিকে কুমারী মেয়ের থেকে যদি (স্পষ্ট ভাষায়) অনুমতি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বিয়ের পর– সেই বিয়েকে ভঙ্গ করা অথবা ঠিক রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে।

বিধবা নারীর ব্যাপারে অনুমতির যুক্তি প্রমাণ হযরত খান্‌সা বিন্‌তে খাদ্দামের ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে– যখন তার পিতা তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে দেন তখন তিনি সেই বিয়েকে অপছন্দ করেন। অতএব তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয় নবী সেই বিয়েকে নাকচ করে দেন। আর কুমারী মেয়ের অনুমতি সম্পর্কিত ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে–

"একবার প্রিয়নবীর দরবারে একজন কুমারী যুবতী এসে বললো তাকে তার পিতা এমন জায়গায় বিয়ে দিচ্ছে যা তার পছন্দ নয়। তখন প্রিয়নবী তাকে এই অধিকার দেন যে, সে চাইলে বিয়েকে বহাল রাখতে পারে অথবা বিয়ে ভঙ্গ করে দিতে পারে।"[৮৭]

এভাবে অপর একটি মেয়ের উল্লেখ আছে। মেয়েটি প্রিয়নবীর কাছে এসে বললো– "হে আল্লাহর রাসূল। আমার পিতা আমার বিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে করে দিয়েছে।" সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী মেয়েটিকে অধিকার দিলেন যে, "চাইলে তা বহাল রাখ, চাইলে তা ভঙ্গ কর।" এরপর মেয়েটি বললো যে, "আমি আমার পিতার সিদ্ধান্তকে বহাল রাখছি। কিন্তু আমি এই প্রশ্ন মহিলাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করেছি যে, তাদের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকদের কোনো ক্ষমতা নেই।"[৮৮]

এভাবে মানবতার ইতিহাসে প্রথম ও শেষবার মহিলা এতোবড় অধিকার ও মর্যাদা পেলো। ইসলাম তাকে এই ক্ষমতা দিলো যে, সে তার বিয়ের ব্যাপারে

---

[৮৬] বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী।

[৮৭] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী।

[৮৮] বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

আগত প্রস্তাবসমূহকে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে বা ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে। অথচ ইসলামের আগে কোনো নারীর গ্রহণ বা বর্জনের কোনোরকম অধিকার ছিল না। তখন তার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো পুরুষেরাই। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম ছিল না। বাজারের পণ্যসামগ্রীর মতো যেকোনো পুরুষ তাকে ক্রয়-বিক্রয় করতো।

বিয়ের প্রস্তাব

আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের আগে বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠানো শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাত। এতেকরে উভয় পক্ষ একে অন্যের ব্যাপারে ভালো-মন্দ সবকিছু জানার ও বিবেচনা করার সুযোগ পায় এবং বিয়ের পরে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সমঝোতার ভাব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিয়ের পয়গাম পাঠানো ছাড়াই যে বিয়ে হয় তার পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।

সহীহ হাদিস গ্রন্থদ্বয়-এর বর্ণনা মোতাবেক, সাহাবী হযরত মুগীরা বিন শো'বা এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে পরে প্রিয়নবী তাঁকে বলেন– "মুগীরা, ওকে দেখে নাও, কারণ এটা তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা কায়েম করবে।"

এই হাদিসে দেখার কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামের নির্ধারিত সাধারণ অনুমতির সীমা লক্ষ রাখতে হবে। সাধারণ অবস্থায় কোনো পুরুষকে অপর নারীর হাতের পাঞ্জা ও মুখ ছাড়া অন্য কিছু দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর তাও দেওয়া হয়েছে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের সুবিধার্থেই শুধু। এতটুকু শিথিলতা ছাড়া জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা অস্বাভাবিক হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। অবশ্য, কোনো মহিলার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠানোর পর কথাবার্তা অনেকটা পাকাপাকি পর্যায়ে এসে পড়লে পরে শুধু নির্দিষ্ট মেয়েটিকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রিয় নবীর হাদিস হচ্ছে–

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে থাক, তাহলে তখন তাকে দেখে নেওয়ার কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তবে শর্ত হলো, সে সেই (বিয়ের) উদ্দেশ্যেই দেখবে। তা সেই মহিলাটি (এ ব্যাপারে কিছু) জানুক বা না জানুক।"

অন্য এক প্রসঙ্গে প্রিয়নবী বলেন–

"যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ের পয়গাম পাঠায় এবং তাকে দেখতে চায় তাহলে দেখতে পারে।"[৮৯]

---

[৮৯] হাদিস।

উল্লেখ যে, এখানেও ইসলাম মেয়ে দেখার সেই স্বাধীনতা দেয়নি যা বর্তমান যুগে প্রচলিত দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তি মেয়েটিকে সেই পোশাকে দেখতে পারে– যা পরে মেয়েরা পিতা বা ভাইদের সামনে উপস্থিত হয়। এছাড়া বিয়ের আগে পাত্রীর মন-মেজাজ বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগতি অর্জনের জন্যে কোনো মহররম-এর (পিতা, আপন ভাই, মামা, চাচা ইত্যাদি) উপস্থিতিতে কোথাও ভ্রমণ করা বা দেখা সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকতে পারে।

উপরে বর্ণিত হাদিসের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রস্তাবিত মেয়েকে যখন দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তখন তার ব্যবহার, মনমেজাজ ও চরিত্র সম্পর্কে অবগতি অর্জন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কারণ, আসল জানার বিষয় হচ্ছে তাই। হাদিসের বাণীর সাথে এটাই সমাঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়– এভাবেই উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও একাত্মতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই বিশেষ অবস্থায় পাত্রীকে দেখার অনুমতি দানের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের (আইন বিধি) বাস্তব উদারতা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। এটা নিঃসন্দেহে এক অনন্য উদারতা। এতেকরে যেকোনো যুগের মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বেলার নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহারের সুযোগ পায়।

সাধারণ অবস্থায় যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কোনো সুযোগ নেই, সেখানে বিয়ের বিশেষ অবস্থায় পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দান করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। ইসলাম যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থি জীবনাদর্শ এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলামে কোনো চরম পন্থার অবকাশ নেই, আর অবাস্তব বা অস্বাভাবিকতার কোনো স্থানও ইসলামে নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা আজকের যুগের মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হই। আজ মুসলমানরা প্রিয় নবীর সুন্নাতের কোনো পরোয়া না করে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে এবং সবক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির প্রদর্শনী করছে। অনেক ক্ষেত্রে সুন্নাতের আড়ালে সুন্নাতবিরোধী তৎপরতা চালাতেও তাদের ভয় হয় না।

একদিকে এক শ্রেণির মুসলমানকে দেখি, তারা কোনো অবস্থাতেই বিয়ের আগে পাত্রকে পাত্রী দেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয় না, আর অন্যদিকে এক শ্রেণির মুসলমান বিয়ের আগে পাত্রকে পাত্রী দেখানোর যাচ্ছেতাই করার এবং যত্রতত্র অবাধে ঘুরে বেড়ানোর খোলা অনুমতি দিয়ে রেখেছে যা দেখলে শুনলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। আসলে এই উভয় চরম পন্থাই ইসলামবিরোধী।

কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিষয়টির আগাগোড়া ভালো করে চিন্তা করে দেখলে পরে বলতে বাধ্য হবে যে, এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষাটিই যথার্থ উপযোগী। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের সিদ্ধান্তই উত্তম। সমগ্র বিশ্বমানবতার স্বার্থে ইসলাম যে জীবনপদ্ধতি দিয়েছে তাই সবচেয়ে সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, কোনো মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবিত পাত্রীর কাছে নিজের প্রস্তাব পাঠাবে না।

কোনো মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে জেনে-বুঝে নিজের বিয়ের প্রস্তাব সেই মেয়েকে পাঠায় যার কাছে অন্য কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাব ইতোমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। কারণ, এতেকরে দুই মুসলমানের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বা শত্রুতামূলক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এটা হীন মনোবৃত্তির পরিচয়ও বহন করে।

এ জন্যে প্রিয়নবী এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধ করে বলেছেন–

"কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব পাঠাবে না যতক্ষণ না সে (আগের প্রস্তাবকে) তার প্রস্তাব তুলে নেয় অথবা তাকে (দ্বিতীয় জনকে) অনুমতি দান করে।"[৯০]

উপরের হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে মালেকী মতাবলম্বী আলেমদের অভিমত হচ্ছে–

"যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মহিলার সাথে বিয়ে করে নেয় তাহলে সেই বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যাবে।" ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিমতটি যথার্থ। কারণ তা ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে বিরোধপূর্ণ।

মোহর

মোহরের পরিমাণ

ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি বিধি-বিধানে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা এবং নম্রতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কড়াকড়ি এবং জটিলতা ইসলামী নীতির পরিপন্থি।

বিয়ের বিধান ইসলামী শরীয়তেরই একটি অংশ; বরং বিয়ে এমন এক 'আবশ্যিক কর্ম' যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্যে বিয়ের ব্যাপারে কোনো রকমের অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী কাজ। কেউ কোনো ব্যাপারে

---

[৯০] হাদিস।

নেতিবাচক বা বিপত্তি সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। কেউ কোনো সমস্যার সৃষ্টিও করবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন–

"আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কোনো রকমের জটিলতা রাখেননি।"[৯১]

এজন্যেই আল্লাহ ইসলামের সব কর্মে ভারসাম্যপূর্ণতাকে পছন্দ করেছেন। বলাবাহুল্য, বিয়ে সংক্রান্ত সব বিষয়েই তা মোহর বা অন্য কোনোকিছু ইসলামের সেই নীতিকেই বুনিয়াদ মেনে চলতে হবে। বিয়ের সম্পর্কে প্রিয়নবী বলেছেন–

"সবচেয়ে বড় বরকতপূর্ণ বিয়ে সেটাই যাতে কম থেকে কম ব্যয় করা হয়েছে।" অন্য একস্থানে প্রিয়নবী বলেছেন–

"সবচেয়ে উত্তম মোহর সেটাই যা আদায়কারীর জন্যে সহজ হয়।"

এমনিতে ইসলাম মোহরের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য সেই মোহরকেই উত্তম বলা হয়েছে যা আদায়ে কোনো অসুবিধে না হয়। প্রিয়নবীর হাদিসটি হচ্ছে–

"যদি কোনো ব্যক্তি মহিলাকে তার মোহরের পরিবর্তে একমুঠো গম দেয় তাহলে তা তার জন্যে বৈধ।"

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– "বিয়ে-শাদীতে মোহরের পরিমাণ অনেক বেশি রেখো না। কেননা (মোহর) বেশি ধার্য করায় যদি কোনো রকমের পার্থিব বা পরকালীন কল্যাণ থাকতো তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবশ্যই করতেন।"[৯২]

তবে মোহর কম করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। কারণ একটি পরিমাণ যেখানে একজনের জন্যে সহজ মনে হবে তা অন্য আর একজনের জন্যে মুশকিলও হতে পারে। কারণ প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থা একই রকম নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রিয়নবী যখন উম্মুল মোমেনিন হযরত উম্মে হাবীবার (রা) সাথে বিয়ে করণে তখন নাজ্জাশী প্রিয়নবীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের পক্ষ থেকে চার হাজার দিরহাম বা দু'শ দীনার মোহর হিসেবে দেন এবং প্রিয়নবী তখন এই পরিমাণ টাকাকে বেশি মনে করেননি কারণ বাদশাহদের মান অনুযায়ী এটা কম ছিল; কিন্তু যখন এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে প্রিয়নবীকে বললো যে, "আমি এক মহিলার সাথে ১৬০ দিরহাম মোহরে বিয়ে করেছি।" তখন প্রিয়নবী এই পরিমাণকে অনেক বেশি মনে করেন এবং তাকে বললেন– "এখন মনে হচ্ছে যে, তুমি পাহাড় থেকে রুপা খোদাই কর।"

---

[৯১] আল্ কুরআন।

[৯২] আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসায়ী, তিরমিযী।

দেনমোহর আদায়ের ব্যাপারে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী এক ব্যক্তিকে বললেন– "মোহর আদায় কর– তা লোহার একটি আংটি হোক না কেন।" কিন্তু যখন লোকটি ফিরে এসে প্রিয়নবীকে বললো যে, তার কাছে লোহার আংটিও নেই। এরপর প্রিয়নবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন "কুরআনের কিছু সূরা কি তোমার স্মরণ আছে?" লোকটি তার মুখস্থ সূরাসমূহের নাম নিয়ে বললো যে অমুক অমুক সূরা তার মুখস্থ রয়েছে। এরপর প্রিয়নবী বললেন–"আমরা তোমার বিয়ে এই শর্তে করিয়ে দিচ্ছি যে তুমি তাকে (স্ত্রীকে) ওসব সূরা মুখস্থ করিয়ে দেবে– যা তোমার মুখস্থ রয়েছে।" অন্য হাদিস মোতাবেক প্রিয়নবী বলেন– "এই শর্তে বিয়ে করিয়েছি যে তুমি তাকে কুরআনের কোনো সূরা মুখস্থ করিয়ে দেবে।"

এ ধরনের আর একটি ঘটনা হযরত আবু তালহা এবং হযরত উম্মে সলিমেরও রয়েছে, আবু নঈম তাঁর 'আল হুলিয়াত' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন– ঘটনাটি হচ্ছে, আবু তালহা উম্মে সলিমের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান; কিন্তু আবু তালহা তখনো মুসলমান হননি, তাই হযরত উম্মে সলিম তাঁকে জবাবে বলেন যে, এই প্রস্তাব আসলে প্রত্যাখ্যান করার মতো নয়, কিন্তু আপনি তো কাফের এবং আমি মুসলমান। অতএব আপনার সাথে বিয়ে করা আমার জন্যে বৈধ নয়। তালহা একথা শুনে বলেছেন–

–এ আবার কেমন বিপদ মাথায় তুলে নিয়েছে?

উম্মে সলিম তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– আমার আবার কি বিপদ?

তালহা বললেন– তুমি কি পরিমাণ সোনা-রুপা চাও?

উম্মে সলিম বললেন– সোনা রুপার কোনো দরকার নাই। আসল সমস্যা হচ্ছে, আপনি এমন বস্তুর পূজা করেন, যে শুনতেও পায় না এবং দেখতেও পায় না। আর তা আপনার কোনো লাভ-ক্ষতিও করতে পারে না। সেই কাঠের পূজা করতে কি আপনার লজ্জা হয় না– যা আপনার হাবসী গোলাম টেনে হিঁচড়ে আপনার কাছে আনে? যাহোক, এ কারণে আমি আপনার সাথে বিয়ে করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তাই হবে আমাদের দেনমোহর। এছাড়া আর কিছু চাইনে।

আবু তালহা উম্মে সলিমকে জিজ্ঞাসা করলেন– রমিসা! আমি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করবো?

উম্মে সলিম বললেন– এর জন্যে আপনি প্রিয়নবীর কাছে যান।

সুতরাং আবু তালহা প্রিয়নবীর দরবারে রওয়ানা হলেন। প্রিয়নবী তাকে আসতে দেখে নিজের পাশে বসা সাথিদের বললেন– "আবু তালহা আসছে। আমি তার উভয় চক্ষুর মাঝখানে ঈমানের ঝলক দেখতে পাচ্ছি।"

আবু তালহা প্রিয়নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয়নবীকে ওসব কথা বলে দিলেন যা তাঁদের উভয়ের মধ্যে হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী তাঁদের বিয়ে সেই শর্তেই করিয়ে দেন।

এই হাদিসের বর্ণনা এতই স্পষ্ট যে, এরপর আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার হয় না।

মোহর– নারীর অধিকার

মোহর নারীর সেই অধিকার যা ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার ইসলাম শুধু নারীকেই দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

"এবং নারীদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় কর।"[৯৩]

ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন "মোহনের আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য এক উপহার।"

ইসলাম মোহরকে শুধু স্ত্রীর অধিকার বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নয়তো ইসলাম-পূর্বকালে নারীর এই অধিকার তার পৃষ্ঠপোষকরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতো আর নারীর ভাগ্যে একটি কানাকড়িও জুটতো না। ইসলাম নারীকে অন্যান্য সব অধিকার দানের সাথে সাথে তার মোহরের ওপরও তার পূর্ণ অধিকার দান করে। মোহরের ওপর পিতা-ভাই-স্বামী বা অন্য কারও কোনো অধিকার নেই। মোহরের টাকা ব্যবহার বা ব্যয় করার ব্যাপারে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য কোনো ব্যক্তি যদি মোহরের টাকা ব্যয় করে বা টালবাহানা করে মোহরের টাকা আত্মসাৎ করে তাহলে সে বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী হবে।

এখানে উল্লেখ যে, পাশ্চাত্যে নারীমুক্তির উন্নতির যুগে নারীকে আজ পর্যন্ত এই অধিকার দেওয়া হয়নি। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজের নারীদের মতো আজও ইউরোপ আমেরিকার মহিলারা নিছক পুরুষদের খেল-তামাশা ও ভোগের বস্তুতে পরিণত রয়েছে। ওসব দেশে এখনও এই নিষ্ঠুর কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যে, মেয়ে বিয়ের সময় যৌতুকের নামে পিতৃগৃহ থেকে অর্থসম্পদ ও সাজসরঞ্জাম স্বামীর ঘরে নিয়ে যায় এবং তার সবকিছু স্বামীর অধিকারে চলে যায়। অবস্থা দেখে মনে হয় নারীই যেন উল্টো পুরুষকে মোহর আদায় করছে। এই কুপ্রথা এমন প্রচলিত যে– এছাড়া আজ আর কেউ বিয়ে-শাদীর কথা ভাবতেই পারে না।

---

[৯৩] সূরা নিসা : ৪।

যৌতুক

আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করে দেখেছি যে, মোহর সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীর মোহর আদায় করা শরীয়তের আইন মোতাবেক প্রতিটি স্বামীর জন্যে ফরয। এর বিনিময়ে স্বামী কোনো অর্থেই যৌতুকের দাবি করতে পারে না। যৌতুক দাবি করার কোনো অধিকারই স্বামীর নেই। অবশ্য স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে কোনো জিনিস আনে বা দেয়, তাহলে তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু স্বামী বা স্বামীপক্ষের কেউ যৌতুকের ওপর কোনো অধিকার দাবি করতে পারবে না। মোহরের সাথে যৌতুকের কোনো যথার্থতা নেই। যেমন আল্লাহ বলেন–

"এবং নারীদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় কর, অবশ্য সে যদি নিজের খুশিমতো মোহরের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তোমরা তা মনের আনন্দে খেতে পারো।"[৯৪]

আজকাল ছেলের পক্ষ থেকে কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিসের যে দাবি করা হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম–অবৈধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক হিসাবে এত বিপুল মূল্যের জিনিসপত্র দাবি করা হয় যে, তা মেয়েপক্ষের সাধ্যের বাইবে চলে যায়। শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মেয়ে পক্ষে সুদে ঋণ করে হলেও ছেলের দাবি মেটাতে বাধ্য হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী কাজ। মেয়েপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করাটা বিরাট জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যৌতুক নামক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সকল মুসলমানকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আসলে যৌতুকে পাওয়া ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র কোনো বরকত নেই। তা যেভাবে আসে সেভাবেই চলে যায়। এমনকি তা ক্ষতিকর বলেও প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যৌতুকের ভিত্তিতে যে বিয়ে হয় তার পরিণাম কখনও শুভ হয় না, স্ত্রীর কাছে যৌতুক গ্রহণকারী স্বামী সকল সময় হীন হয়ে থাকেন এবং উভয়ের মধ্যে কখনও আন্তরিক ভালোবাসা গড়ে উঠতে পারে না।

বলাবাহুল্য, আজকের যুগে প্রচলিত যৌতুক সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী একটি হারাম কাজ এবং এটা হচ্ছে জঘন্য অপচয়। এছাড়া যৌতুকের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও অহংকারের অনুভূতি সক্রিয় থাকে। যৌতুক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অপচয়ের নিন্দা করে আল্লাহর কুরআনে বলা হয়েছে–

"অপচয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান নিজ প্রতিপালকের কাছে অকৃতজ্ঞ।"

বস্তুত : মেয়েপক্ষ নিজেদের খুশিমতো সহজভাবে এবং ছেলেপক্ষের কোনো দাবি-দাওয়া ছাড়া যা দেয়, এবং যাতে কোনো অপচয় প্রদর্শনী বা অহংকারের ভাব থাকে না– তাই হচ্ছে উত্তম যৌতুক। এতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় এবং এতে অপচয় এবং লোক দেখানো প্রদর্শনীর কোনো আশঙ্কা থাকে না।

---

[৯৪] সূরা নিসা : ৪।

বিয়ের উৎসব

ওলীমা

বিয়ের দিন নিঃসন্দেহে আনন্দের দিন। এদিন পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন সবাই একত্রিত হয়ে থাকে। এই আনন্দের মুহূর্তে পাত্রপক্ষকে তার ক্ষমতা মোতাবেক লোকদের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রিয়নবী যখন তাঁর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর সাথে বিয়ে দেন তখন প্রিয়নবী বলেন–

"বিয়েতে প্রীতিভোজ (ওলীমা) অবশ্য হওয়া চাই।"

প্রিয়নবীর এ কথার পরিপ্রক্ষিতে কোনো কোনো ফকীহ্ এই যুক্তি পেশ করেন যে, বিয়েতে 'প্রীতিভোজ' ফরয। অবশ্য অন্যান্য ফকীহ্দের মতে বিয়ের প্রীতিভোজ শুধু মুস্তাহাব।

এভাবে প্রিয়নবী যখন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর সাথে বিয়ে করেন তখন একটি ছাগল যবেহ্ করে প্রীতিভোজ দেন এবং যখন হযরত আসিয়ার বিয়ে হয় তখন প্রিয়নবী খেজুর, পনির ও ঘি সহযোগে প্রীতিভোজ দেন। প্রিয়নবী তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের বিয়ে উপলক্ষে গমের রুটি সহযোগে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন। প্রিয়নবী নিজে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে বলেছেন–

"ওলীমার (প্রীতিভোজে) দাওয়াত করো– তা একটি ছাগলেরই হোক না কেন।"

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা প্রীতিভোজের আয়োজনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু লোকদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করো। বিখ্যাত ফিকাহ্গ্রন্থ 'নায়হুল আওতারে' উল্লেখ রয়েছে– ওলীমার সবচেয়ে কম সীমা হচ্ছে একটি ছাগল। যদি একথার প্রমাণ মওজুদ না থাকতো যে, প্রিয়নবী একটি ছাগলের কমেও ওলীমার আয়োজন করেছেন তাহলে কমপক্ষে একটি ছাগলের ওলীমা প্রত্যেকের জন্যে ফরয হয়ে যেত।" এরপর বিচারপতি কাযী আয়াস-এর এই বক্তব্য নকল করা হয়েছে যে, ফকীহ্দের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, বেশি থেকে বেশি ওলীমার আয়োজনের কোনো সীমা নির্ধারিত নেই আর ওলীমার কম থেকে কম সীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।[৯৫]

---

[৯৫] নায়নুল আওতার : ১৭৬।

ওলীমা বা প্রীতিভোজে নিজের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী, ধনী-দরিদ্র সবাইকে নিমন্ত্রিত করা উচিত।

প্রীতিভোজে কেবল ধনীদের নিমন্ত্রণ জানানো এবং গরিবদের অবহেলা করা অত্যন্ত আপত্তিকর কথা এবং যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের নীচ ও হীনতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। যারা তাদের প্রীতিভোজ বা অন্য কোনো সাধারণ যিয়াফতে দরিদ্রদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের দাওয়াত করে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি কিনে নিলো, কারণ প্রিয়নবী বলেছেন–

"অত্যন্ত মন্দ ওলীমার ভোজ হচ্ছে সেটা যাতে শুধু ধনীদের নিমন্ত্রিত করা হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেওয়া হয়।"[৯৬]

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা রাসূলের সুন্নাত। প্রিয়নবী বলেছেন–

"যখন তোমাদের কাউকে ওলীমা ভোজের নিমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তা গ্রহণ করা উচিত।"

অন্য এক হাদিসে প্রিয়নবী বলেছেন–

"যদি কোনো ব্যক্তি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে তাহলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর একবার এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ জানাল। লোকটি অক্ষমতা প্রকাশ করলো; কিন্তু তিনি তার অক্ষমতা গ্রহণ করতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন–

"কিসের অক্ষমতা? চল..... উঠ.... ।"

এর পর কেউ যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রীতিভোজে পৌঁছায় তখন তাকে ধৈর্য ও শোকরের সাথে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, আর যদি কেউ রেগে থাকে তাহলে তা নিমন্ত্রককে জানিয়ে দেওয়া উচিত এবং তার জন্যে শুভ প্রার্থনা করা উচিত। হাদিসে আছে–

"তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন দাওয়াত করা হয় তখন তা গ্রহণ করা উচিত। যদি সে রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত এবং তার জন্যে শুভ প্রার্থনা করা উচিত; কিন্তু যদি রোযা না করে থাকে তাহলে সবর ও শোকরের সাথে ভোজ গ্রহণ করবে।"[৯৭]

কিন্তু ভোজসভায় যদি এমন কোনো দ্রব্য দেখতে পাওয়া যায় যা খাওয়া আল্লাহর বিধানে নিষিদ্ধ তাহলে নীরবে ফিরে চলে আসা উচিত। ইমাম ইবনে হাসান বলেন–

---

[৯৬] বুখারী ও মুসলিম।

[৯৭] আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ।

যদি সেখানে রেশমি চাদর বিছানো থাকে, গৃহ যদি হারাম আয়ের তৈরি হয়, আর খাদ্য হয় ছিনিয়ে নেওয়া দ্রব্যের, আর যদি থাকে মদের আয়োজন তাহলে সেখান থেকে ফিরে চলে আসা উচিত।

হযরত আলী (রা) বলেছেন "তিনি প্রিয়নবীকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হন। প্রিয়নবী তাঁর গৃহে ছবি লটকানো দেখে ফিরে চলে আসেন।"[৯৮]

প্রিয়নবী বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস রাখে, তাকে এমন ভোজসভায় কখনও বসতে নেই, যেখানে মদ্যপান চলে।"

বিয়ের আনন্দ

বিয়ে-শাদীতে গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানো যেতে পারে। একবার হযরত আয়েশা (রা) এক আনসারী সাহাবীর সাথে তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন প্রিয়নবী বললেন :

"আয়েশা তোমাদের কাছে কি কোন উৎসবের সরঞ্জাম নেই? আনসাররা তো উৎসব পছন্দ করে।"

গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানোর ব্যাপারে প্রিয়নবীর আরেকটি বাণীও লক্ষ করুন। তিনি বলেছেন–

"বিয়েশাদী উপলক্ষে গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানোতে কোনো ক্ষতি নেই তবে প্রিয়নবী এমন বিয়েশাদী পছন্দ করতেন না যা নীরবে হয়ে যায়। বিয়ের জন্যে যেন খুব ভালো করে ঘোষণা করা হয়। মুসনাদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে প্রিয়নবী চুপচাপ নীরব বিয়েকে পছন্দ করতেন না, যতক্ষণ না তাতে দফ্ না বাজানো হয় এবং এই গান না গাওয়া হয় যে–

"...এসেছি মোরা তোমাদের কাছে
এসেছি মোরা তোমাদের পাশে
তাহলে, মোদের বল মারহাবা
তোমাদের মোরা বলি মারহাবা..."

এভাবে প্রিয়নবী বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ্ বাজানোকে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছেন এবং এমন বিয়েকে অপছন্দ করেছেন যাতে আনন্দের কোনো ব্যবস্থা নেই। এদিকে লক্ষ রেখে আজকালের যুগেও বিয়ে শাদীতে এমন গীত যাতে অশ্লীলতা নেই, তা গাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তাই বলে বাজারী ধরনের বাজে গান গাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। নোংরা অর্থপূর্ণ, বা এমন গান যা পাশবিক

---

[৯৮] ইবনে মাজা।

প্রবৃত্তিকে উস্কিয়ে দেয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গানের কথা যদি রুচিপূর্ণ ও শালীন হয় তাহলে তাতে কোনো নিষেধ নেই। বিয়ের গান যে কেউ গাইতে পারে। পুরুষ-মহিলা-বালক-বালিকা, যে কেউ গানে শরিক হতে পারে। এর প্রমাণ হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা)-এর সেই ঘটনা– যখন তিনি তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ের পরে তাঁকে স্বামীর বাড়িতে পাঠাল, তখন প্রিয়নবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– "আয়েশা! তোমরা কি মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

তিনি জবাব দিলেন– হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

প্রিয়নবী জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা ওর সাথে গায়িকাদের পাঠাও নি?

তিনি বললেন–না।

প্রিয়নবী বললেন–আরে...আনসাররা তো গীতের পাগল। তোমরা কোনো গায়িকা মেয়ে পাঠালে না কেন?

হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন– কিন্তু, হে আল্লাহ রাসূল! তারা কি গাইবে?

প্রিয়নবী বললেন– গান এ ধরনের হবে–

"...এসেছি মোরা তোমাদের কাছে
এসেছি মোরা তোমাদের পাশে
তাহলে, মোদের বল মারহাবা..."
যদি এই গম্-গন্দমী–
না হতো হেথা–
কভু দেখতে না মোদের
তোমাদের মাঝে; তোমাদের পাশে।"

সাহাবা কেরাম ও প্রিয়নবী এই রওয়ায়েত থেকে উপকৃত হয়েছেন।

তারা বিয়ে অনুষ্ঠানের আনন্দে নিজেরাই অংশগ্রহণ করতেন এটাকে তাঁরা আপত্তিকর কিছু মনে করতেন না। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমের বিন সা'আদ বলেন– "আমি এক বিয়েতে গিয়ে দেখি যে, খারজা বিন কা'আব মাস্'উদ আনসারী ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছেন এবং কয়েকটি বালিকা সেখানে দফ্ বাজিয়ে গান গাচ্ছে। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম 'ওগো রাসূলের সাহাবীরা; আপনাদের সামনে এসব কি হচ্ছে?' তাঁরা বললেন 'বসতে যদি চাও তাহলে বস, আর যেতে চাইলে যাও। কারণ প্রিয়নবী এ ধরনের মহফিলের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি। আনন্দের মূহূর্তে এ ধরনের নির্দোষ খেলাধুলা দেখেছেন এবং এসবের আয়োজন করার পরামর্শও দিয়েছেন।' এর

অর্থ এই যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনকে সত্যিকার আনন্দ উল্লাস থেকে বঞ্চিত রাখে না বরং পরিচ্ছন্ন আনন্দ-উল্লাসের সুযোগ দান করেছে, যেন তাদের জীবন শুষ্ক ও নিরানন্দ না হয়ে থাকে। ইসলামে স্থবিরতা ও বিরক্তির অবকাশ নেই। মানুষ তার স্বভাবের তাগিদে পরিচ্ছন্ন ও শালীনতার মধ্যে থেকে নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ইসলাম রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দের সাথে সাথে ইবাদতকেও সমন্বিত করে দিয়েছে। এভাবে আনন্দ ও ইবাদত পরস্পর একই সূত্রে গেঁথে গেছে; কিন্তু খেলাধুলা ও কৃষ্টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাহানায় বা এসব স্বাভাবিক আনন্দ-উল্লাসের আড়ালে কোনো রকমের নোংরামি বা অশ্লীল কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। সুতরাং কেউ যেন কোনো রকম অবৈধ তৎপরতা চালানোর অপচেষ্টা না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে বরং এর মাধ্যমে তারা চরিত্র গঠন, শ্রীলতা ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের প্রয়াস পাবে।

স্ত্রীর অধিকার

ভরণপোষণ

স্ত্রী ধনী হোক বা দরিদ্র– ইসলাম তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত করেছেন। অবশ্য স্ত্রী যদি ধনী হয় এবং আনন্দচিত্তে স্বামীকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া পছন্দ করে মেটানোর দায়িত্ব স্বামী তার আর্থিক মোতাবেক পালন করবে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে– "ওদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা স্বামীদেরই দায়িত্ব। এই হাদিসে যদিও বাসস্থান, বিছানাপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নাম উল্লেখ নেই; কিন্তু ভরণপোষণ করার সাথে ওসব জিনিস স্বাভাবিকভাবেই শামিল থাকে। এজন্যে ওসব কিছুর পৃথক পৃথক নাম নেওয়ার দরকার হয় না; কিন্তু কুরআন শরীফে বাসস্থানের উল্লেখও রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন–

"ওদের (স্ত্রীদের) সেসব জায়গায় রাখ যেখানে তোমরা থাক, যেমন জায়গাই তোমাদের থাকে এবং বিরক্ত করার জন্যে ওদেরকে কষ্ট দিও না।"[৯৯]

ইসলাম স্ত্রীদের বাসস্থানের সমস্যা যেখানে সমাধান করে দিয়েছে সেখানে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও যে স্বামীর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। স্বামী স্ত্রীদের বসবাসের জন্যে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীরও ব্যবস্থা করবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, স্ত্রীদের ভরণপোষণের মান কি হবে? এর জবাবে ইসলাম স্বামীর আর্থিক মানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্বামী যদি ধনী

---

[৯৯] তালাক–৭।

হয় তাহলে সচ্ছলতার সাথে, আর যদি দরিদ্র হয় তাহলে যেমন জোটে তেমন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হচ্ছে–

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা মোতাবেক ভরণপোষণ দেবে আর যাদেরকে কর্মজীবিকা দেওয়া হয়েছে তারা সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তা থেকে বেশি তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ দারিদ্র্যের পর সমৃদ্ধিও দান করবেন।"[১০০]

প্রিয়নবীও একই নির্দেশ দিচ্ছেন–

"প্রচলন মোতাবেক তোমাদের স্ত্রীদের খাবার ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা তোমাদের ওপর ফরয (অবশ্য কর্তব্য)।"

যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি এমন ধনী হয় যে, নিজ স্ত্রীকে রেশমি পোশাক পরাতে সক্ষম তাহলে স্ত্রীকে তার রেশমি বস্ত্র দেওয়াই উচিত। ইমাম জহুরীকে মহিলাদের রেশমি বস্ত্র পরিধান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন– "আমাকে হযরত আনাস (রা) বলেছেন তিনি রাসূলের মেয়েকে রেশমি চাদর ব্যবহার করতে দেখেছেন।"

হাফেয ইবনে হাজার তাঁর 'আল এসাবা' গ্রন্থে হাদিসটিকে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন।

পারস্পরিক সম্প্রীতি

আল্লাহ বলেছেন–

"এদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম পন্থায় জীবনযাপন কর, যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয়, তাহলে হতে পারে একটি বিষয় তোমাদের অপছন্দ আল্লাহ তাতে কোনো কল্যাণ রেখে দিয়ে থাকবেন।"[১০১] আল্লাহ আরো বলেছেন–

"তাদের (স্ত্রীদের) বিরক্ত করার জন্যে তাদের কষ্ট দিও না।"[১০২]

এসব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা, বিরক্ত করা এবং বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এজন্যে কেউ যদি নিজেকে যথার্থ মুসলমান মনে করে সে যেন কোনো কথায় বা কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালজ্ঘন না করে। কেউ যদি আল্লার স্পষ্ট আদেশের অমান্য করে তাহলে সে সীমালজ্ঘন করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

---

[১০০] তালাক–৭।

[১০১] তালাক–৬।

[১০২] সূরা তালাক–৭।

মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতেও একই অর্থবোধক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।" অন্য এক হাদিস হচ্ছে–

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবার-পরিজনের পক্ষে উত্তম এবং আমি তোমাদের সবচেয়ে বেশি নিজের পরিবার পরিজনের পক্ষে উত্তম।"

ইসলামের এই স্পষ্ট নির্দেশ ও উপদেশাবালি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কোনো কোনো অজ্ঞ অভদ্র লোক নারীদের ওপর জোর-যুলুম করে নিজেদের পৌরুষ দেখানোর নিন্দনীয় প্রয়াস চালায়। এ ধরনের নোংরা লোকেরা নারীদের সাথে স্নেহ-দয়া প্রদর্শন ও নম্র ব্যবহারকে তাদের পৌরুষের বিরোধী বলে মনে করে। এটা সত্যিই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি। এতেকরে একদিকে তাদের চিন্তার অসারতা প্রমাণিত হয় এবং অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ব্যাহত হয়। বস্তুত নারীদের সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা এবং তাদের ছোটখাটো ভুলত্রুটির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মধ্যেই রয়েছে পৌরুষসুলভ সৌন্দর্য। নারীদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা উচিত। যারা নারীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে তারা তাদের জ্ঞানবুদ্ধির গভীরতা এবং জীবনযাপনের আসল পদ্ধতির সাথে পরিচয়ের প্রমাণ পেশ করে। নারীদেরকে কথায় কথায় শাসানো, ভয় দেখানো, বকাঝকা করা, মারাপিট করা চরম অন্যায় এবং ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। যদি তারা ভুল করে, দোষ করে তাহলে সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে ভুল-দোষ শোধরানোর সুযোগ দিতে হবে। নয়তো তাদের মন ভেঙে যাবে এবং গোটা পারিবারিক পরিবেশ তিক্ততায় ভরে যাবে। সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের অন্যতম দাবি হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অযথা সন্দেহ পোষণ করা এবং তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কৌতূহলী হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো স্বামীকে দেখা যায় স্ত্রীদের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ ও অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন স্বামীরা স্ত্রীদের গতিবিধিকে সর্বক্ষণ ভুল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের কথাবার্তা থেকে ভুল অর্থ বের করে। এসব নেতিবাচক দিক যে কতো বেশি ক্ষতিকর তা তারা উপলব্ধি করতেও অক্ষম। এ ধরনের খুঁতখুঁতে মন নিয়ে কোনো স্বামীর দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। তারা সবসময় স্ত্রীদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীরা কার সাথে মেলামেশা বা কি ধরনের কথাবার্তা বলছে, কি করছে? আসলে এসব হচ্ছে শয়তানি প্ররোচনা। এ ধরনের ভুল মানসিকতার কারণে কতো যে অঘটন ঘটছে তার হিসাব-নিকাশ নেই। এতেকরে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, ভুল

বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিণাম নেমে আসে। এজন্যে প্রিয়নবী এটাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে এথেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছেন। হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি রাতের স্ত্রীর কাছে এই উদ্দেশ্যে এসো না যে, সে তার পাহারাদারি করছে অথবা তার ভুলভ্রান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।"[১০৩]

এর অর্থ এই যে, স্বামী যেন তার স্ত্রীর কাছে হঠাৎ করে না আসে। কেননা, এতেকরে তাদের গোপন ভুলগুলো দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইসলাম নারীদের এসব স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তির দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে বলেছে এবং নারীদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছে। ইমাম ইবনে আযম বলেন–

"নারী জাতির প্রতি এতবড় আস্থা ও বিশ্বাস এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ শুধু ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও ক্ষমা ও উদারতার এই দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।"

ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের সাফল্যের জন্যে নারীদেরকে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "আমি প্রিয়নবী ﷺ-এর পাশে বসেও পুতুল খেলা করেছি।"

এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, মা আয়েশা (রা) প্রিয়নবীর ﷺ পাশে বসে পুতুল নিয়ে খেলা করেছেন; কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে তা করতে নিষেধ করেননি। অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

"আমি আল্লাহর রাসূলের ওখানে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সাথে আমার বান্ধবীরাও থাকতো, তারা আমার সাথে খেলতো। প্রিয়নবী ﷺ যখন আসতেন তখন ওরা লুকিয়ে পড়তো। তিনি তাদেরকে খুঁজে বের করে আমার কাছে পাঠাতেন যেন তারা আমার সাথে খেলতে পারে।"[১০৪]

এসব হাদিসের আলোকে যেকোনো ব্যক্তি অনুমান করতে পারেন যে, উম্মুল মোমেনীনদের সাথে প্রিয়নবীর দাম্পত্য সম্পর্ক কত সহজ-সুন্দর ও স্বাভাবিক ছিল এবং তাদের আনন্দে রাখার জন্যে তিনি কি সুন্দর সুযোগ দিতেন। প্রিয়নবীর ﷺ উম্মত হিসেবে সাধারণভাবে সকল নারী, বিশেষকরে স্ত্রীদের সাথে সহজ স্বাভাবিক ও নম্র ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকেও আমাদের স্ত্রীদের সাথে মধুর সম্পর্ক কায়েম রাখার জন্যে তাদের রুচি ও আনন্দ-উল্লাসের চাহিদা মোতাবেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করতে হবে।

---

[১০৩] মুসলিম।

[১০৪] বুখারী ও মুসলিম।

স্বামীর অধিকার

ইসলাম স্বামীদেরকেও কয়েকটি অধিকার দিয়েছে। আমরা নিচে তার ওপর আলোকপাত করছি।

স্বামীর আনুগত্য

স্ত্রীরা সকল রকমের সৎকর্মে অর্থাৎ ইসলামের নির্ধারিত সীমা মোতাবেক স্বামীর আনুগত্য করবে। স্বামী যদি সহবাসের জন্যে আহ্বান করে তাহলে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেবে। এক্ষেত্রে বিনা কারণে যদি অমত প্রকাশ করা হয় তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন– "স্বামী যখন নিজের স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে এবং স্বামী দুঃখিত হয়ে রাত কাটায় তাহলে ফিরিশতারা সকাল পর্যন্ত এ ধরনের নারীর ওপর অভিশম্পাত করে।"[১০৫]

স্বামীর এই অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী বলেন–

"কোনো নারী নিজ স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রী তার নিজের ইজ্জত আবু এবং স্বামীর ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অর্থাৎ স্বামী তাকে যেসব জিনিসের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে সে তাতে অবহেলা করবে না। স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। এটা হচ্ছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর সেই অধিকার যার ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো মতভেদ নেই। প্রিয়নবী ﷺ উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

"নিজের স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে নিজের এবং তার ধনসম্পদের ব্যাপারে আন্তরিকতাপূর্ণ থাকবে।"[১০৬]

এখানে উল্লেখ যে, ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধনসম্পদ থেকে তার অনুমতি ছাড়াই সাদকা দান করার অনুমতি দেয়; কিন্তু স্ত্রীর ধনসম্পদ থেকে স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোনো দান-খয়রাত করতে পারবে না। তবে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধনসম্পদ অপচয় করার অনুমতি দেয় না। স্ত্রী এমন কোনো কাজ করবে না যাতে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর বাণী হচ্ছে–

"যদি স্ত্রী স্বামীর ধনসম্পদ থেকে এতটুকু সাদকা দান করে যা স্বামীর জন্যে দুঃখজনক না হয় তাহলে এর জন্য স্ত্রী পুণ্য পাবে এবং স্বামীও ততটা পুণ্য পাবে কেননা এই ধনসম্পদ তারই অর্জিত ছিল।"[১০৭]

---

[১০৫] বুখারী ও মুসলিম।

[১০৬] ইবনে মাজা।

স্ত্রীকে তার নিজের ব্যক্তিত্বের হেফাযতের অর্থ হচ্ছে তাই যা প্রিয়নবী বিদায় হজের সময়ে বলেছেন–

"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের ওখানে এমন কোনো ব্যক্তিকে আসতে দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ কর।"[১০৮]

কেননা স্বামীকে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে সেও তাকে ভালোবাসবে। আর এমন কাউকে ঘরে আসার অনুমতি দেবে না যার আগমনকে তার স্বামী অপছন্দ করে। তবে ওসব লোক যাদের ঘরে আসার ব্যাপারে তার স্বামীর কোনো আপত্তিও নেই তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজে ঘরে আসতে দিতে কোনো বাধা নেই। যেমন স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মেহমান, ভাই ইত্যাদি যারা নিত্য কাজকর্মে আসা-যাওয়া করে থাকে, এমন লোকদের ঘরে আসতে দেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তাদের ঘরে আসার অনুমতি দেওয়ার অর্থ পর্দার অন্তরালে থেকে বিভিন্ন দরকারী জিনিস যেমন বিছনাপত্র, চেয়ার, বালিশ ইত্যাদি পাঠানো; কিন্তু এদের কারো সাথে বসে বসে গল্প করার বা কোথাও আসা-যাওয়ার অনুমতি নেই। শরীয়তের আইন মোতাবেক তা নিষিদ্ধ। এমনকি স্বামীর অনুমতিতেও স্ত্রী তাদের সাথে বসে আলাপ-আলোচনা বা কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারবে না।

দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতার ভিত্তি

উপস্থাপনা : "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটা অন্যতম যে, তিনি তোমাদেরই অস্তিত্বে থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন যেন তোমরা তার কাছে শান্তি পেতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে, এতে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে ওসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।"[১০৯]

প্রাচীনকাল থেকে নারীকে আত্মাবিহীন এক অপবিত্র প্রাণী মনে করা হচ্ছিল। পুরুষ নারীকে তার পাশবিক ক্ষুধার শিকারে পরিণত করতো ঠিকই; কিন্তু তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে তারা ছিল অপ্রস্তুত। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, "নারী পশু নয় বরং মানুষ– তবে তাকে পুরুষের সেবার জন্যে বানানো হয়েছে।" এই ছিল তৎকালীন সভ্য সমাজে নারীর মর্যাদা। নারীজাতির প্রতি দুনিয়ার উন্নত মানুষগুলোর এই বিকৃত মনোভাবকে সামনে রেখে যদি আমরা নারীসংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার অধ্যয়ন ও

---

[১০৭] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

[১০৮] ইবনে মাজা, তিরমিযী।

[১০৯] সূরা রুম : ২১।

বিশ্লেষণ করি তখন আমরা সন্তোষজনক বিস্ময়ে লক্ষ করি যে, ইসলাম নারীকে অবনতি ও অবমাননার নিকৃষ্টতম পর্যায় থেকে তুলে এনে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ এটাকে অন্যতম নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন এবং যেহেতু নারী ও পুরুষ একই উপাদানে গঠিত তাই উভয়ের গুরুত্ব এবং মর্যাদাও সমপর্যায়ের। ইসলাম আরও বলে– নারীকে স্বাধীন মানুষ ও স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে– পুরুষের দাসী হিসেবে নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলেন–

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটা অন্যতম যে, তিনি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন।"[১১০]

এবং নারীর কাছ থেকে শান্তি অর্জন বলা হয়েছে। বস্তুত এই শান্তি হচ্ছে মানবপ্রকৃতিতে সুস্থ সেই অনুভূতি যা সমাজকে সততা ও পবিত্রতার বুনিয়াদ সরবরাহ করে এবং এই শান্তিই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার দাম্পত্য জীবনকে করে ষোলোকলায় সার্থক ও সুন্দর। শান্তি এমন এক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন যা একজন পুরুষ কেবল তার স্ত্রীর কাছ থেকে পেতে পারে। এই জন্যেই আল্লাহ উভয়ের মধ্যে পরস্পরের জন্যে প্রেম-প্রীতি ও সহানুভূতির অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন।

এসব বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অন্যান্য ধর্মের কথা মোতাবেক সাপ, প্রেত্নী, ডাইনী বা রাক্ষুসী নয়; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে সমমর্যাদাসম্পন্ন এক স্বাধীন অস্তিত্ব এবং শান্তির প্রতীক। ইসলাম নারীকে এমন এক উৎস মনে করে যা থেকে স্নেহ, দয়া ও সহানুভূতির ফল্গুধারা উৎসারিত হচ্ছে। মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতার দিকে লক্ষ রেখেই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশেষ আইন-বিধি প্রণয়ন করেছে এবং জীবন সংগ্রামের দুষ্কর পথে কিভাবে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করবে তার সঠিক পন্থা নিরূপণ করেছে। ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে একে অন্যের সহযোগিতায় অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা প্রত্যেকের জন্যেই জানা জরুরি এবং এর ভিত্তিতে আপনারা পরিবার পরিজন ও আমাদের লেখকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে সহযোগিতা পাবেন। এ বিষয়ে বুনিয়াদি নীতি নির্ধারণ করেছে আল কুরআন–

"নারীদের জন্যেও স্পষ্ট পদ্ধতিতে তেমন অধিকারই রয়েছে যেমন পুরুষদের অধিকার ওদের ওপর রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের ওদের ওপরে একটি মান অর্জিত রয়েছে এবং সবার উপরে বর্তমান রয়েছেন সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ।"[১১১]

---

[১১০] সূরা রুম : ২১।
[১১১] সূরা বাকারা : ২২৮।

এই কুরআনী আয়াত থেকে তিনটি নীতি স্পষ্ট হয়–

১. সুবিচার : এই আয়াত থেকে প্রথম যে কথাটি প্রকাশ পায় তা হলো– আল্লাহর দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী উভয়ের গুরুত্ব সমান। এভাবে স্বামী ও স্ত্রী হচ্ছে জীবন সফরে একে অন্যের সহগামী ও সহকর্মী এবং এই যাত্রায় উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সমান সমান। নারী বা পুরুষ কাউকেও পরস্পরের অধিকার হরণ করার কোনো এখতিয়ার দেওয়া হয়নি। স্বামী স্ত্রীর অধিকার খর্ব করতে পারবে না, আর স্বামীর অধিকার খর্ব করার কষমতা স্ত্রীর নেই। উভয়ের মধ্যে যে কারো অধিকার নিয়ে অনধিকার চর্চা করবে সেই সীমালঙ্ঘনের দায়ে দায়ী হবে।

২. সাম্য : দ্বিতীয় যে কথাটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় তাহলো উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনে তাদের নিজ নিজ স্বভাব ও ক্ষমতার আলোকে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ যে, নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বে সমতা থাকলেও তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র কিন্তু আলাদা আলাদা। নারী ও পুরুষের কাউকেও এমন কর্মে বাধ্য করা হয়নি যা তাদের রুচি ও স্বভাবের সাথে সংঘাতপূর্ণ হতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কত সুন্দর কথা বলেছেন– "আমি নিজের স্ত্রীর কাছে তেমনি সেজেগুজে থাকি যেমন আমি তাকে নিজের সামনে সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করি।" এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান–

"নারীদের ওপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তাদের অধিকারও রয়েছে।"

এই আয়াতের মাধ্যমে নারীদের সঠিক অধিকার– এমনকি সাজসজ্জা ও রূপচর্চার স্বাভাবিক অধিকারও দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ও নারী তাদের পৃথক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের সাজসজ্জার ধরন-ধারণও হবে আলাদা আলাদা। উভয়ে উভয়ের রুচি ও বৈশিষ্ট্য মোতাবেক উত্তম ও রুচিপূর্ণভাবে পোশাক পরবে এবং সাজগোজ করবে। এতেকরে উভয়েই আন্তরিক আনন্দ পাবে।

৩. পারস্পরিক শলা-পরামর্শ : আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে পুরুষ ও নারীদের সমস্ত অধিকারের বিস্তারিত উল্লেখ করেননি– বরং এমন মূলনীতি ঘোষণা করেছেন যার আলোকে যেকোনো যুগের যেকোনো সমাজের নর-নারী তাদের নিজ নিজ চাহিদা মোতাবেক অধিকার ও দায়িত্ব নিজেরাই নির্ণয় করবে। এ ব্যাপারে নর ও নারী উভয়কেই কুরআনী মূলনীতি মোতাবেক নিজেদের অধিকার নিশ্চিন্তকরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কুরআনের এই আয়াতটি আবার উল্লেখ করছি–

"নারীদের ওপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তাদের অধিকারও রয়েছে।"

এখানে অধিকার বলতে আল্লাহ্ সবরকমের অধিকারকেই বুঝিয়েছেন, যা সাধারণভাবে জানা-বুঝা যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য সব ব্যাপারে এটা লক্ষ রাখতে হবে যে, কোনো ক্ষেত্রেই যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমার লঙ্ঘন না হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক ব্যাপারাদির নিষ্পত্তি বা সমস্যাবলির সমাধানের ব্যাপারে উভয়কে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে এবং কেউ কারও ওপর অন্যায়, অবিচার বা জুলুম, অত্যাচার করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে। এ ব্যাপারে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে পারস্পরিক সমঝোতার নীতি মেনে চলতে উৎসাহিত করে।

এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথেও পারস্পরিক পরামর্শ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা নিচের আয়াতটির উল্লেখ করেন–

“যে পিতা চায় যে, তার সন্তান পুরো রেজায়াতের মেয়াদ পর্যন্ত দুধ পান করুক তাহলে মা তার শিশুকে পুরো দু’বছর দুধ পান করাবে। এমতাবস্থায় শিশুর পিতাকে প্রচলিত পন্থায় তাদের খাদ্য-বস্ত্র দিতে হবে; কিন্তু কাউকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি দায়িত্ব চাপানো উচিত নয়। মাকে এজন্যে কষ্টে ফেলতে নেই যে শিশুটা তার এবং পিতাকেও এ কারণে বিরক্ত করা যাবে না যে শিশুটা তার। দুধপানকারিণীর এই অধিকার যেমন শিশুর পিতার ওপর রয়েছে তেমনি তার উত্তরাধিকারীর ওপরও রয়েছে; কিন্তু উভয়পক্ষ পারস্পরিক সন্তুষ্টি এবং পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চাইলে– এমন করাতে কোনো বাধা নেই।”[১১২]

আগেই বলেছি, এখানে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে যদি তার সাবেক স্বামীর সন্তানকে দুধ পান করাতে থাকে এবং উভয়ে যদি পারস্পরিক শলাপরামর্শক্রমে এটা সিদ্ধান্ত নেয় যে, দু’বছর পূরণের আগেই শিশুর দুধ ছাড়িয়ে নেবে তাহলে তাতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু উভয়ের সমঝোতা ছাড়া যদি কোনো একজন এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা করার অধিকার তাদের কারো থাকবে না।

এ থেকে এটা বুঝে দেখুন যে, ইসলাম যদি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথেও এমন সমঝোতাপূর্ণ ব্যবহার করার আদেশ দেয় তাহলে স্ত্রীর সাথে সমঝোতার ওপর যে কতো গুরুত্ব আরোপ করে তা সহজেই অনুমেয়।

---

[১১২] সূরা বাকারা– ২৩৩।

নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য

পারিবারিক ব্যবস্থাবলিকে ইসলামী ছাঁচে পরিচালনার জন্যে ইসলাম তিনটি বুনিয়াদ সরবরাহ করেছে। এই বুনিয়াদ অর্থাৎ 'সুবিচার', 'সমতা' ও পারস্পরিক পরামর্শ' নিয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এবার আমরা এই নিয়ে আলোচনা করবো যে, পারিবারিক ব্যবস্থা বা প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা উচিত– পুরুষের ওপর না কি নারীর ওপর? এর জবাবে কুরআন এই ভারি দায়িত্বটি পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। দৈহিক ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধির স্বাভাবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছে। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতেও সিদ্ধান্তটি সঠিক মনে হয়। এছাড়া পুরুষই সন্তানের পিতা হয়ে থাকে। বংশবিস্তারের ধারাবাহিকতায় পুরুষের ভূমিকা গুরুতর, তাই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এর সাথে সাথে পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাবলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সেই পালন করে থাকে; এজন্যে জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবি মোতাবেক পুরুষকেই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করা উচিত। অন্যদিকে পুরুষই হয় ঘরের মালিক। পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ, তাদের সুখ-সুবিধা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে লালনপালনের সব দায়িত্ব পুরুষকেই পালন করতে হয়। এসব ভারি দায়িত্ব নিজ থেকেই যেন ঘোষণা করছে যে, পরিবারের প্রধান পরিচালক নারীর পরিবর্তে পুরুষই হবে। কারণ ঘরে বাইরের এত বিরাট দায়িত্ব পালন করা নারীর স্বাভাবিক সক্ষমতার অতীত ব্যাপার। তবে নারী তার শলাপরামর্শ দিয়ে পুরুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এভাবে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শলাপরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পারিবারিক ক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিবার-পরিজন বিশেষকরে সন্তানদের আয়-উপার্জন করে খাওয়ানোটাই শুধু তার দায়িত্বের অংশ নয়; বরং সমাজের অসৎ পথ থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাদেরকে সততা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করাটাও তার অন্যতম কর্তব্য। এজন্যে ইসলাম নারীকে সংসারের বিভিন্ন কাজে স্বামীকে সহায়তা ও পরামর্শ দানের সাথে সাথে এই নির্দেশও দান করে যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে যেন এমন কোনো লোককে ঘরে আসার অনুমতি না দেয় যাকে তার স্বামী অপছন্দ করে।

বলাবাহুল্য, ইসলামের নির্দেশিত পথে নারীর কোনো রকম অধিকার খর্ব করা হয় না এবং নারীর ওপর কোনো রকমের জুলুম-অত্যাচারের আশঙ্কাও থাকে না। পুরুষের এই স্বাভাবিক প্রাধান্য স্বীকৃত বলেই বিয়ের পর স্ত্রীকে মাতা-পিতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে আসতে হয়। এজন্যে বিভিন্ন ব্যাপারে তাকে স্বামীর ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। স্ত্রী স্বামীকে বিশেষ কোনো স্থান বা শহরে থাকার জন্যে বাধ্য করবে না; বরং স্বামীকে তার সুযোগ-সুবিধা মোতাবেক আয়-উপার্জনের জন্যে যেকোনো স্থান বা শহরে বসবাস করার

অধিকার দিতে হবে। এ ব্যাপারে স্বামীর কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার স্ত্রীর নেই।

এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থেই পুরুষকে পরিবারের প্রধান হিসেবে কাজ করার বর্ধিত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাই বলে নারীর গুরুত্ব বা মর্যাদাকে খর্ব করা হয়নি বা এতে নারীর অবমাননা করার কোনো অবকাশও নেই। এর মাধ্যমে নারীকে বরং জটিল ও কষ্টকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, যেক্ষেত্রে যে কর্মটি পুরুষের দ্বারা অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব সেক্ষেত্রে পুরুষের ওপর বর্ধিত কাজ অর্পণ করা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে একান্ত আবেগনির্ভর হয়ে থাকে। এখানে একে অন্যকে অন্তরের গভীর উপলব্ধিসহকারে ভালোবাসা তাদেরকে করে দেয় সম্পূর্ণ একাত্ম। স্বামী স্ত্রী যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন তাদের মনে কোনো বাহ্যিক প্রভাব বা আনুষ্ঠানিক আইনবিধির ছায়াপাত হয় না। আইন-কানুনের অনেক ঊর্ধ্বে এক অপার্থিব প্রেম-প্রীতির বন্ধনে দুজন থাকে আবদ্ধ। তারা তখন কোনো রীতিনীতি বা পারিভাষিক সাম্য-সুবিচার ইত্যাদির লৌকিক আয়ত্তাধীনে থাকে না। তখন একথা চিন্তা করাই তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে যে, পরিবারের প্রধান কে? প্রেম, প্রীতি, অকৃত্রিম ভালোবাসার সেই মধুর পরিবেশে এসব প্রশ্ন নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়। প্রেমই হয় তখন মুখ্য বিষয়, আর সবকিছু নিছক লৌকিকতা– নিছক আনুষ্ঠানিকতা। প্রেমপ্রীতির সেই পরিবেশে নীতিবাক্য বা তত্ত্বকথার স্থান একান্তই গৌণ। ইসলাম এই স্বাভাবিকতাকেই স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর এই যে ভালোবাসা, এই যে ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুভূতি তা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে স্বামী যদি অবস্থাপন্ন হয়, তাহলে সে নিজ তাগিদেই স্ত্রীর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখে। আর স্বামী যদি দরিদ্র হয় তাহলে পবিত্র স্ত্রী শুধু যে ধৈর্য ধারণ করে তাই নয়; বরং বিভিন্ন উপায়ে স্বামীকে সাহায্য-সহযোগিতাও করে থাকে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী ঘরের বাইরের দায়িত্ব পালন করেও স্বামীকে সহযেগিতা দান করে।

এমন পবিত্র এক স্ত্রীর বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকরের মেয়ে হযরত আসমার দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন হযরত যুবাইর বিন আওয়াসের স্ত্রী। হযরত যুবাইরের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সুতরাং হযরত আসমা স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতা কিভাবে যে করতেন তা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন– তিনি বলেন, "যুবাইরের ঘরের সব কাজকর্ম আমিই করি। তাঁর ঘোড়াকে ঘোড়াশালে বাঁধি, ঘাস দিই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও করি। পানি ভরে এনে তাকে পানি পান করাই। আর পানিও আনি তিন ফার্লং দূর থেকে মাথায় বয়ে.......।"

এই যে তিনি স্বামীকে পারিবারিক কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন– তা কোনো আইন-কানুনের অধীনে নয়; বরং এসব কাজ করতেন তিনি স্বামীর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং একাত্মতার আবেগ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই।

পুরুষের দায়িত্বশীলতা

ইসলামী সমাজে স্ত্রীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীল বানানোর বুনিয়াদ হচ্ছে কুরআন শরীফের এই আয়াত–

"পুরুষ নারীদের ওপর দায়িত্বশীল রয়েছে। এই ভিত্তিতে যে, আল্লাহ এদের মধ্যে একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই ভিত্তিতে যে, পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে।"[১১৩]

এই দায়িত্বশীলতা দুই প্রকারের– (১) বস্তুগত ও বাহ্যিক অনুভবজনিত, (২) আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক।

প্রথমত, বস্তুগত– আমরা দেখি যে পুরুষ আয়-উপার্জন করে এবং নারীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থাদি করে। একে আমরা অনুভবজনিত দায়িত্বশীলতা বলি, যা আমরা বাইরে থেকেও দেখতে পাই। আভিধানিকভাবেও দায়িত্বশীলতার এই অর্থ দাঁড়ায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 'কাওয়াম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর বিখ্যাত আরবি অভিধান "আলকামুস আল মুহিত"-এ 'কাওয়াম'-এর অর্থ করা হয়েছে– "পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর দায়িত্ব গ্রহণ করা, তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা এবং তার বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করা।" এভাবে আভিধানিক দিক থেকেও পুরুষ নারীর ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং আল্লাহর কুরআনের অর্থও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবেও পুরুষ নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে থাকে। কারণ দৈহিক ও প্রাকৃতিকভাবে নারীকে এমন অনেক পর্যায় অতিক্রম করতে হয় যখন নারী পুরুষের স্মরণ নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষকরে গর্ভাবস্থা ও শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় নারী এতোটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে, অনেক সময় তার চলাফেরা করাটাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেই সময় সে স্বাভাবিকভাবে যেকোনো পুরুষের সহযোগিতা কামনা করে– যে তার নিরাপত্তা ও স্বার্থের তত্ত্বাবধান করবে। নারীদের এই প্রাকৃতিক অক্ষমতা ও অসহায়তার কারণে ইসলাম কেবল পুরুষদের ওপরেই জিহাদ ফরয করেছে এবং জিহাদের গুরুদায়িত্ব থেকে নারীসমাজকে মুক্তি দিয়েছে। এভাবে প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষ নারীর স্বার্থ সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের জন্য দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক– এটাকে আমরা অন্য শব্দে চারিত্রিক বা আভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলতাও বলতে পারি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতটি এই অর্থের

---

[১১৩] নিসা : ৩৪।

দিকেও ইঙ্গিত করে। এখানে একটি দারুণ বিভ্রান্তি ও অপবাদের অপনোদন করাও জরুরী যে, কোনো কোনো মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও জ্ঞানপাপী লোক এই আয়াতের উল্লেখ করে এটা বুঝাবার অপচেষ্টা করে যে, ইসলামে নারীর ব্যক্তিত্বের কোনো গুরুত্ব নেই এবং তাকে মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অন্যদিকে সকল অধিকার পুরুষকেই দান করা হয়েছে যাতে নারীদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখা যায়। বস্তুত এটা একটা অজ্ঞতাপূর্ণ অভিমত। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভিত্তিহীন অপবাদ রটিয়ে থাকে; কিন্তু আমরা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি, পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কেই একই রকমের অধিকার ও গুরুত্ব দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সমতা, সুবিচার ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পারিবারিক প্রশাসন পরিচালনার আদেশ দেয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোনো পর্যায়ে নারীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার বা তার মর্যাদা খাটো করার কোনো রকম প্রশ্নই উঠতে পারে না। যে ইসলাম নারীকে যুগযুগের শোষণ ও লাঞ্ছনার নিষ্ঠুর অক্টোপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এ ধরনের ভিত্তিহীন অপবাদ রটনা করে বেড়ায় তাদের মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? নিঃসন্দেহে ইসলাম দুনিয়ার নারীসমাজকে শত-শতাব্দীর জুলুম ও নিষ্পেষণের কবল থেকে চিরমুক্তি দান করেছে।

ইসলাম পুরুষকে নারীর ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ব্যবহারেরও অনুমতি দেয় না। নারী তার ব্যক্তিগত ধনসম্পদ নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে যদি পুরুষ কোনো রকম অনধিকার চর্চা করতে চায় তাহলে নারী তার বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারও রাখে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করতে পারি যে, ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা আজ পর্যন্ত কোনো ধর্ম বা মতবাদে দেওয়া হয়নি। এমনকি নারী-স্বাধীনতায় তথাকথিত চ্যাম্পিয়ন আধুনিক পাশ্চাত্যের নারী তার সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এই অতি সম্প্রতিকালে যেসব দেশে নারীর কোনো কোনো অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মাত্র। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র ইসলামই সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে তার যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে মোতায়েন করে দিয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইসলাম পুরুষকে তার স্ত্রীর ধর্ম বা মতবাদ পরিবর্তন করার ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করার অধিকারও দেয় না। যেমন স্ত্রী যদি ইহুদি ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে তাহলে সে তার ওপর থাকার অধিকার রাখে, আর যদি খ্রিস্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে তাতেও

স্বামীর জোরজবরদস্তি করার কিছু নেই। স্ত্রীর ধর্মের ওপর আপত্তি বা নিন্দনীয় কিছু বলার এখতিয়ারও স্বামীর নেই। স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে নারীর এই অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"আজ তোমাদের জন্যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করে দেওয়া হলো। তাহলে আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্যে; এবং সংরক্ষিত মহিলারাও তোমাদের জন্যে হালাল তা তারা ঈমানদারদের মধ্যে থেকে হোক বা ওসব জাতির যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে তোমরা মোহর আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদের সংরক্ষক হও। এটা নয় যে, স্বাধীন ব্যভিচার করতে শুরু করবে অথবা লুকিয়া পালিয়ে মেলামেশা করবে।"[১১৪]

সুতরাং আহলে কিতাবের কোনো নারী যদি মুসলমান স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার ধর্ম পরিবর্তন করার জন্যে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে অন্য কথা। কেননা, আল্লাহ্ এটাও ঘোষণা করেছেন যে, "দ্বীনে (ইসলামে) কোনো জোরজবরদস্তি নেই।"

এখন বলুন তো, যে ইসলাম নারীকে তার ধনসম্পদ এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের এতটা স্বাধীনতা দান করেছে এবং অন্যান্য সব অধিকার ও সমতা দান করেছে তার ব্যাপারে এটা কল্পনা করাও কি সম্ভব যে, সেই ইসলাম নারীকে পুরুষের হাতে শোষিত হওয়ার সুযোগ দেবে? তাহলে ওইসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিতরা কোন্ যুক্তিতে বলে যে, ইসলাম পুরুষকে নারীর ওপর অন্যায় কর্তৃত্ব করার বা নারীর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দিয়েছে?

আসলে পুরুষকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ের বর্ধিত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে– যা মানবপ্রকৃতির দাবি মোতাবেক একান্তই যুক্তিযুক্ত। এরই মধ্যে একটি ক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। অন্য আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে সামরিক নেতৃত্ব। এর মাধ্যমে সে শত্রুর হামলা থেকে কোনো জাতির স্বার্থ ও মান-মর্যাদা রক্ষা করে এবং প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও পিছপা হয় না। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে দেখতে পাবেন যে, নারীত্বসুলভ স্বাভাবিক দুর্বলতা ও বিশেষ প্রাকৃতিক অসুবিধার কারণে নারীরা যথার্থভাবে সামরিক দায়দায়িত্ব পালনে অক্ষম; কিন্তু এ ব্যাপারে পুরুষদের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে সামরিক ক্ষেত্রেও পুরুষদের ওপরই অধিকারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

---

[১১৪] সূরা মায়েদা-৫।

নারীদের কয়েকটি স্বাভাবিক দুর্বলতা লক্ষণীয়

(১) মাসিক ঋতু অর্থাৎ হায়েজ, প্রসবকালীন নেফাস, গর্ভধারণ ও প্রসব, শিশুকে দুধ খাওয়ানো, সন্তানের লালন-পালন ও অন্যান্য পারিবারিক কাজকর্মে রাত-দিনের ব্যস্ততা ইত্যাদি এমন কিছু রুটিন থাকে নারীর নিত্যদিনের আজীবন সাথি বলা যেতে পারে। অন্যদিকে পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই এসব কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত। সেজন্যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দায়িত্ব পুরুষের ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে।

এছাড়া আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সব যুগেই নারী দৈহিক শক্তির দিক থেকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল প্রমাণিত হয়ে আসছে। তাদের দেহ অধিক পরিশ্রম ও কঠোরতা সহ্য করতে অক্ষম, পুরুষের তুলনায় তাদের শক্তি-সাহসও কম।

(২) গৃহস্থালি কাজকর্মে অধিকতর ব্যস্ততাবশত বহিরাঙ্গনের বিভিন্ন জটিল কাজকর্মে তাদের অভিজ্ঞতাও খুব কম থাকে। তাদের কর্মক্ষেত্র, ঘর-পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যন্তই সীমিত। অন্যদিকে পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরের ব্যাপকতায় পরিব্যাপ্ত। এই ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা এবং বৈষয়িক জ্ঞান পুরুষেরই বেশি থাকে। বিভিন্ন কলাকৌশল ও উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে পুরুষই বেশি ওয়াকিবহাল। এজন্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে বুদ্ধিগত ও শারীরিক শক্তির পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক।

(৩) নারীকে তার সন্তানের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে কোনো রকমের অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বা শক্তির প্রয়োজন হয় না; বরং প্রাকৃতিকভাবে যে নম্রতা-সরলতা ও সহজ আবেগ-উপলব্ধি সে পেয়েছে তাই তার জন্যে যথেষ্ট। শিশুর সাথে শিশু হয়ে থাকতেই তার প্রকৃত আনন্দ। তাই শিশুর মতোই তার মানসিকতা। সে শিশুর মতোই হয় সৌন্দর্য ও কোমলতা প্রিয়। তার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাও শিশুসুলভ। এমনকি শিশুসুলভ কথা বলতে এবং শিশুর মতো অঙ্গভঙ্গি করতেই তার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। বিধিবিধান, শৃঙ্খলা ও গণ্ডির নীতি তত্ত্ব ইত্যাদির দিকে নারীর আকর্ষণ কমই দেখা যায়। অথচ এসব ব্যাপারে পুরুষের আবেগ-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরুষদের মধ্যে চেষ্টা, সংগ্রাম, নীতি, তত্ত্ব, গভীর বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানপিপাসা এবং শক্তি ও সাহসিকতার মনোভাব দেখা যায়। নারী-পুরুষের মধ্যে এসব গুণবৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন যেন তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এতেকরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারী সৃষ্টির প্রথম থেকেই শান্ত, কোমল, সংবেদনশীল ও সৌন্দর্যপ্রিয় স্বভাবের অধিকারী। আর পুরুষ শক্তিমত্তা, সংগ্রাম-সাধনা, জ্ঞানবুদ্ধি-ইচ্ছাশক্তি ও কর্মকৌশলের অধিকারী।

নারীর তুলনায় পুরুষের এসব ব্যতিক্রম গুণবৈশিষ্ট্য এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য একটা সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ সত্য কথা। এজন্যে বুদ্ধিগত ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে প্রধান দায়িত্বশীল করাটাই যুক্তিসঙ্গত। এরপর এটাও তো জানা কথা যে, দুনিয়ার যত বিপ্লব, যত সংস্কার ও সংশোধনী আন্দোলন এবং গণসংগ্রামের নেতৃত্ব সবসময় পুরুষই দিয়ে আসছে, তারই ফলশ্রুতিতে পুরুষরা জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে বরাবরই এগিয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে বিস্তর। সামরিক শক্তি ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও তার অভিজ্ঞতাই বেশি। এসব কারণে পুরুষরাই আদিকাল থেকে সমাজের ভালোমন্দ দেখাশোনা করে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এভাবে জীবনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যখন তার যোগ্যতা ও নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত তখন ছোটখাটো ব্যাপারে যে তার প্রাধান্য থাকবে তাতো স্বাভাবিকই। সে যেমন পরিবারের দেখাশুনা করে, তেমনি রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করে, বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে এবং সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বও পালন করে। এসব প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আলোকে নারীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীলকরণ সংক্রান্ত কুরআনী আয়াতের আসল তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজকাল নবজাগৃতি ও প্রগতিশীলতার নামে যেসব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে তা কোনো নতুন কথা নয়। প্রিয়নবীর যুগেও কিছুসংখ্যক মহিলা পুরুষের মতো পুরুষের সমান দায়িত্ব ও অধিকার পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যেমন হযরত উম্মে সালমা একবার কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে প্রিয়নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন যে– "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপরও যদি জিহাদ ফরয করে দেওয়া হতো যেমন পুরুষদের ওপর রয়েছে তাহলে আমরাও পুরুষদের সমান পুরস্কার ও প্রতিদান পেতাম।" তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়–

"আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশি দিয়েছেন তার আকাজ্ক্ষা করো না। যা কিছু পুরুষরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু নারীরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ।"[১১৫]

এটা বলে আল্লাহ সামাজিক বিশৃঙ্খলার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। নারীদের পক্ষে পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত কর্মে হস্তক্ষেপ করা ভুল। কারণ এতেকরে প্রকৃতির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে মানবজীবন গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ যে আইন প্রবর্তন করেছেন– একে

---

[১১৫] সূরা নিসা : ৩২।

অন্যের কর্মে হস্তক্ষেপ করার ফলে তার উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলাদা আলাদাভাবে বণ্টন করে রেখেছেন এবং সে হিসেবে তাদের প্রতিদান ও পুরস্কারের ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। তারই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেছেন–

"যেমন কর্ম পুরুষ করবে সেই মোতাবেক তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং যেমন কর্ম নারী করবে সেই মোতাবেক তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে।"[১১৬]

আর এই প্রতিদান বা পুরস্কার শুধু জিহাদ বা এ ধরনের অন্যান্য কর্মের জন্যে নির্ধারিত নয়; বরং পুরুষের জন্যে জিহাদের যে পুরস্কার সেই একই পুরস্কার নারীকে তার নির্ধারিত কাজের জন্যে দেওয়া হবে। সুতরাং নারীকে নারীর কাজেই মনোযোগ দেওয়া উচিত; আর পুরুষ তার নিজের কাজে মন দেবে। পরস্পর কারো কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করবে না। কারণ তাতেকরে শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হবে। তাছাড়া তা হবে আল্লাহর পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপেরই নামান্তর এবং প্রাকৃতিক বিধিবিধানের পরিপন্থি কাজ।

প্রিয়নবী নরনারীকে এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেসব মহিলা এই স্বাভাবিক বিধিবিধানকে অমান্য করে সীমালঙ্ঘন করে পুরুষালী বেশ গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। একইভাবে নারীর বিশেষ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের হস্তক্ষেপও বাঞ্ছনীয় নয়। বস্তুত নারীকে তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেই কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে। প্রকৃতি তার জন্যে যে কর্মসীমা নির্ধারণ করেছে সেটাই তার জন্যে উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ্ তার জন্যে তার যোগ্য ক্ষেত্র ও কর্ম মোতায়েন করে দিয়েছেন, এটাই স্বাভাবিক বিধি, আর এরই ওপর নির্ভর করছে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ও অগ্রগতি।

নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা

আমরা আগেই বলেছি, নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য ও দায়িত্বশীলতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ নারীর ওপর শোষণ-জুলুম করবে বা তার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আসলে পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শুধু পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে। এর উদ্দেশ্য পুরুষের আলাদা কোনো মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য দান করা নয়। আল্লাহর কুরআনের আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এটা নয় যে, পুরুষ মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে নারীর উপরে। না তা নয়। অধিকার, মর্যাদা ও গুরুত্ব নারী পুরুষের সমান। তবে প্রাকৃতিক কারণে তার ওপর শুধু দায়িত্বটাই বেশি ন্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন নারী ও পুরুষের একই

---

[১১৬] সূরা নিসা : ৩২।

গুরুত্ব ও মর্যাদার উল্লেখ করে ঘোষণা করেছে যে, "উভয়ে একই উপাদান থেকে সৃষ্ট।" যেমন আল্লাহ্ বলেছেন–

"জবাবে তাদের প্রতিপালক বললেন– "আমি তোমাদের মধ্যে কারো কর্ম বিফল করি না– তা নারী হোক বা পুরুষ, তোমরা সবাই একে অন্যের সম-অস্তিত্ব।"[১১৭]

এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরুষকে নারীর ওপরে বিশেষ কোনো মর্যাদা বা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পুরুষ ও নারীর পার্থক্য ঠিক একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পার্থক্যের মতোই। দেহের কোন কোনো অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় বেশি কাজ করে; কিন্তু তাই বলে তার প্রাধান্য বা বিশেষ মর্যাদা নেই। দেহের সব অঙ্গই সমান গুরুত্বের অধিকারী। নর ও নারীর অবস্থাও ঠিক একই রকম। আল্লাহর কাছে মর্যাদা শুধু তারই বেশি হবে যে সৎ ও খোদাভীরু– তা সে, নারী হোক বা নর। এছাড়া আল্লাহর দরবারে দৈহিক পার্থক্যের কোনো গুরুত্ব নেই। এরই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেছেন–

"আর যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশি দিয়েছেন তার আকাঙ্ক্ষা করো না। যা কিছু পুরুষরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু নারীরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তার দান কামনা করতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন।"[১১৮]

এথেকে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুরুষের প্রাধান্যটা কেবল বাহ্যিক অনুভবজনিত দায়িত্বের ক্ষেত্রেই সীমিত। নয়তো মানুষ হিসেবে তার গুরুত্ব ততটুকুই যতটুকু একজন নারীর রয়েছে। একই অর্থবোধক অন্য আয়াত হচ্ছে–

"এবং দেখ, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন।"[১১৯]

এখানে রিযিকের বাড়তি-কমতির আইনবিধি বর্ণনা করে আল্লাহ্ কারো মানমর্যাদা হ্রাস-বৃদ্ধি করছেন না। আসলে এটা হচ্ছে এমন এক স্বভাবসম্মত পারস্পরিক নির্ভরশীল বণ্টন ব্যবস্থা– যাতে সব লোক একে অন্যের সেবায় আসতে পারে।

মোটকথা এই যে, সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের পৃথক পৃথক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যে যেরকম আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সৎ উদ্দেশ্য পালন করবে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে ততটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবে।

---

[১১৭] সূরা মায়েদা : ১৯৫।
[১১৮] সূরা নিসা : ৩২।
[১১৯] সূরা নাহল : ৭১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-সংখ্যা

"আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারী নারীকে পছন্দ করেন না।"[১২০]

উপস্থাপনা : ইসলাম প্রাচীন যুগীয় ও যাযাবরীয় যে কয়টি প্রচলনকে নির্দোষ মনে করে অবশিষ্ট রেখেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে একাধিক স্ত্রী সম্পর্কীয় বিষয়। বহুবিবাহের প্রচলন ইসলামের আগেও গোটা দুনিয়ার সভ্য ও অর্ধসভ্য জাতিসমূহে বিশেষকরে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে স্ত্রী-সংখ্যার ওপর কোনো রকমের বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল না। তখন যার যত মর্জি স্ত্রী রাখার স্বাধীনতা ছিল। এটাকে কেউ কোনোদিন মন্দ ভাবেনি। এ ধরনের অবস্থাতেই বিশ্বমানবতার সামনে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম যেহেতু সর্বমানবতার সামগ্রিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে এসেছে তাই সেহেতু বহুবিবাহসংক্রান্ত বিষয়টিও ইসলামের বিবেচনাধীনে আসে। ইসলাম এটাকে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি, আবার তার খোলা অনুমতিও দেয়নি; বরং বহুবিবাহের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাকে শর্তসাপেক্ষ করে দিয়েছে যেন বহুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যায় এবং কেবল কল্যাণকর দিকটি অবশিষ্ট থাকে। ইসলাম বহুবিবাহের ওপর যে বিধি-নিষেধ ও শর্ত আরোপ করেছে তা কুরআনের বর্ণনা মোতাবেক–

"যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার জনের সাথে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমার আশঙ্কা হয় যে, তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে কেবল একটি স্ত্রীই রাখো অথবা ওইসব নারীকে স্ত্রীত্বে আনো যারা তোমার অধিকারে এসেছে; অবিচার থেকে বাঁচার জন্যে এটা অধিকতর ভালো।"[১২১]

একাধিক স্ত্রীর উদ্দেশ্য যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়

এই বিষয়ে অধ্যয়ন করার আগে যেসব বুনিয়াদি জ্ঞান অর্জনের একান্ত দরকার তা এই যে, ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্য নিছক যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়; বরং মানব অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রাখা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"এখন তোমরা নিজের স্ত্রীদের সাথে রাতযাপন কর এবং সেই উপকার অর্জন কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন।"[১২২]

---

[১২০] দারকুতনী, তাবরানী, দায়লামী।
[১২১] সূরা নিসা : ৩।
[১২২] সূরা বাকারা : ১৮৭।

ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন– এই আয়াতে সহবাসের উদ্দেশ্য নিছক যৌনতৃপ্তি অর্জনের কথা বলা হয়নি; বরং এর উদ্দেশ্য মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ– "সেই উপকার অর্জন কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন"– এর এই অর্থই দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য। "এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো যে, "আল্লাহর রাসূল! একটি মহিলা খুবই সুন্দরী রূপসী; কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো?" প্রিয়নবী জবাবে বললেন– 'না'। দ্বিতীয়বার সেই ব্যক্তি আবার উপস্থিত হয়ে নিজের আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলো। এবারও প্রিয়নবী বললেন– 'না'। এমন মহিলার সাথে বিয়ে কর যে সুন্দরী-রূপসী হওয়ার সাথে সাথে সন্তান উৎপাদনও করতে পারে। যেন রোজ হাশরে আমি আমার উম্মতের আধিক্যের ওপর গৌরব করতে পারি।"

আমরা এটা অবশ্য জানি না যে, প্রশ্নকর্তা ব্যক্তিটি অবিবাহিত ছিল, নাকি বিবাহিত; কিন্তু সে যে মেয়ে লোকটির রূপে এতই মজে গিয়েছিল যে, সে বন্ধ্যা জানা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু প্রিয়নবী তা করার অনুমতি দেননি। আর এই অনুমতি না দেওয়ার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল যৌনতৃপ্তি অর্জন করা নয়; বরং বংশবিস্তার লাভ করা। যেহেতু এই বিয়েতে বংশবিস্তারের কোনো সম্ভাবনা ছিল না তাই প্রিয়নবী তার অনুমতি দেননি। এখন প্রশ্নকর্তা বিবাহিত হয়ে থাকুক বা অবিবাহিত উভয় ক্ষেত্রেই একই যুক্তি কার্যকর হয়েছে যে, ইসলামে বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বংশবিস্তার করা, যৌনসম্ভোগ বা যৌনতৃপ্তি অর্জন করা নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু যৌন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে বিয়ে করা অপছন্দনীয়। যারা কেবল যৌনসম্ভোগের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাদের উদ্দেশ্য করে প্রিয়নবী বলেছেন–

"আল্লাহ তাআলা সম্ভোগকারী পুরুষ ও সম্ভোগকারিণী নারীদের ভালোবাসেন না।" তাবারী ও দারেকুতনীতে একই বিষয়ভুক্ত অন্য এক হাদিসে প্রিয়নবী বলেছেন– "বিয়ে কর এবং তালাক দিও না, কেননা আল্লাহ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের পছন্দ করেন না।"

একাধিক স্ত্রী– নিছক অনুমতি মাত্র

উপরের হাদিস দুটির আলোকে আমরা কুরআনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা করলে এটা সহজেই বুঝতে পারি যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের উদ্দেশ্য কোনো অর্থেই যৌনসম্ভোগ বা যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে– দ্বিতীয় বিয়ে কেবল তখনই হালাল বা বৈধ হবে যখন তা করা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি

হবে না। অন্য কথায় শুধু বিশেষ অবস্থা যেমন প্রথম স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, বা এত বেশি রোগা হয়ে পড়ে যে, স্ত্রীত্বের দাবি পূরণে অক্ষম থাকে, বা দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস হয়ে পড়ে– তখন বিধবা ও অবিবাহিতা নারীদের বৃহত্তর স্বার্থে সক্ষম ও সচ্ছল পুরুষরা একাধিক বিয়ের অনুমতি পাবে। তাও এই শর্তে যে, তারা স্ত্রীদের সাথে সমতাভিত্তিক ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে।

সীমা নির্ধারণই উদ্দেশ্য– স্বেচ্ছাচারিতা নয়

কুরআনের সেই আয়াত যা থেকে একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয় তা আসলে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার সামনে সীমা নির্ধারণ করার জন্যেই সামিল হয়েছে। সুতরাং কুরআনের এই আয়াত–

"আর যদি তোমার ভয় হয় যে, এতিমদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয় দুই-দুই, তিন-তিন এবং চার-চারজনের সাথে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমার শঙ্কা হয় যে, তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একটি স্ত্রীই রাখো অথবা ওসব স্ত্রীকে স্ত্রীত্বে নাও যারা তোমার অধিকারে এসেছে, অবিচার থেকে বাঁচার জন্যে এটা অধিকতর ভালো।"[১২৩]

কুরআন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা এ আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– 'আরববাসীরা তখন এতিমদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণে এজন্যেই ইতস্তত করতো যে, ঘটনাচক্রে তাদের ওপর যেন অবিচার, অত্যাচার না হয়ে যায়; কিন্তু নারীদের বেলায় তাদের কোনোরকম ইতস্তত বোধ ছিল না। নারীদের সাথেও যে সুবিচার ও সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা দরকার এটা তাদের কাছে দুর্বোধ্য কথা ছিল।

কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হলো যে, জুলুম-অবিচার যার ওপরেই করা হোক না কেন তা জুলুম এবং অবিচার বলেই গণ্য হবে, তা এতিমদের ওপর হোক বা নারীদের ওপর; সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারো এবং তোমাদের স্ত্রীদের সংখ্যা যত হবে তাদের অধিকারও ততটা বহাল থাকবে এবং তোমরাও তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে।

আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখশারী বলেন–

"তোমরা যদি এতিমদের অধিকারের ক্ষেত্রে অবিচার করতে না চাও এবং তাকে বিরাট পাপ মনে কর তাহলে নারীদের ব্যাপারেও সেই একই অনুভূতি পোষণ কর এবং অন্ততপক্ষে বিয়ে কর; কারণ এতেকরে নারীদের ওপর

---

[১২৩] সূরা নিসা : ৩।

অবিচারের আশঙ্কাও কমে যায়।” তাবারীয় গ্রন্থকার ইবনে আব্বাস, সাঈদ বিন যুবাইর, কাতাদাহ এবং সুদ্দির বরাত দিয়ে এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– “অন্ধকার যুগেও লোকেরা এতিমদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করাকে বিরাট পাপ মনে করতো; কিন্তু নারীদের ব্যাপারে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা নারীর ওপর জুলুম-অত্যাচারকে মোটেই অনুচিত মনে করতো না, সুতরাং এই আয়াতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, যেভাবে তোমরা এতিমদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎকে বিরাট পাপ মনে কর এভাবে নারীদের অধিকারও সংরক্ষণ কর, আর এর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে তোমরা খুব কম সংখ্যা বিয়ে কর এবং একান্ত প্রয়োজন হলে চারটা পর্যন্ত স্ত্রী রেখো, এর চেয়ে বেশি কোনো অবস্থাতেই নয়। আর যদি এটাও ভয় থাকে যে, তোমরা চারজন স্ত্রীর সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে শুধু একটা বিয়ে কর” যতটার সাথে সমতাপূর্ণ ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে পার। তাবারীর গ্রন্থকার এই ভাষ্যকে অন্যান্য ভাষ্যের তুলনায় অধিকতর পছন্দ করেছেন।

কিন্তু যেহেতু স্ত্রীদের ব্যাপারে সম্পর্কটা আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং একই রকম ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্যে স্ত্রীদের সাথে সুবিচারের মানদণ্ড হবে এই যে, কোনো স্ত্রীকে বিশেষভাবে ভালোবাসতে গিয়ে অন্য স্ত্রীর অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা যেন না দেখা দেয়।

কুরতুবী, যাহহাক এবং অন্যান্য মুফাসসির থেকে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তার ইবারত হলো– “এই আয়াতে সুবিচার করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সব স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তাদের মধ্যে কোনো রকমের পার্থক্য করবে না; এমন যেন না হয় যে, কাউকে অতিমাত্রায় ভালোবাসবে এবং অন্যের জীবনকে দুঃখে ভরে দেবে। এটা করা শরীয়তের আইনে হারাম (নিষিদ্ধ)। রইলো আন্তরিকতার কথা। সেক্ষেত্রে সবার সাথে সমতা রক্ষা করা মানবপ্রকৃতির বিরোধী।”

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত সেসব জুলুম-অত্যাচারের অবসানের জন্যে নাযিল হয়েছিল যা অন্ধকার যুগের লোকেরা একাধিক বিয়ে করে নারীদের উপর চালিয়ে থাকতো। আর এই আয়াতে একাধিক বিয়ের আদেশ দেওয়া হচ্ছে না; বরং নারীদের ওপর সুবিচার প্রতিষ্ঠার ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন বিশেষে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

কুরতুবী যাহহাক, তাবারী, যামাখমারী প্রমুখ এবং পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইবনে আব্বাস, সাঈদ বিন জবীর, সুদ্দি, কাতাদাহ এবং অন্যান্য মুফাসসিররা এই আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাবারী তো এতটুকু বলেন যে, এই আয়াত বস্তুতপক্ষে অধিক বিবাহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে কেননা তাতেকরে সুবিচারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দারিদ্র্যে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে কোনো কোনো আয়াতে একাকি স্ত্রীর অনুমতি দেওয়া হলেও সাথে সাথে অন্যান্য শর্ত শরায়েতও আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। সুতরাং আয়াতে বলা হয়েছে– "এটা তোমাদেরকে অভাব-অনটন থেকে বাঁচানোর জন্যে এক উত্তম মাধ্যম।" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী বলেন– আরবি ভাষায় 'রাজুলুন আয়েলুন' অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর মূল অক্ষর সমষ্টি হচ্ছে আইন-ওয়াও-লাম। এথেকে বহুবাচক আয়াল শব্দ গঠিত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে মানুষের সন্তান-সন্ততি যত কম হবে তার ব্যয়ও তত কম হবে। আর ব্যয় কম হলে মানুষ অনটনেও পড়বে না। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একটিমাত্র বিয়ে করলে যেখানে অবিচার ও অত্যাচারের আশঙ্কা থাকে না তেমনি তাতেকরে দারিদ্র্যের আশঙ্কাও কমে যায়।

ইমাম শাফেয়ী এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন– "পরিবার-পরিজন কমানোর জন্য এটা উত্তম উপায়।"

অন্যান্য মুফাসসিররা এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন "নারীদের ওপর অবিচার করা থেকে বাঁচার জন্যে এটা সবচেয়ে উত্তম পন্থা।" ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী এই অর্থ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করে বলেন যে, অধিকাংশ মুফাসসিরের কাছে এটাই হচ্ছে পছন্দীয় মতো; কিন্তু ইমাম রাজী নিজে আগে গিয়ে কাজীর মাধ্যমে শাফেয়ীর মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে ব্যক্তির আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা শর্তসাপেক্ষ।

আভিধানিক অর্থের দিক থেকেও ইমাম শাফেয়ীর মতামত সঠিক। তিনি আভিধানিক ব্যাপারেও ছিলেন বিশেষজ্ঞ। কারণ তিনি শৈশব থেকেই অকৃত্রিম পল্লী পরিবেশে থাকতেন। আর পল্লীর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ আরবি– সহজ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে থাকার কারণে তিনি প্রাঞ্জল, সাবলীল ও বিশুদ্ধ আরবি শেখেন। আলোচ্য বিষয়ে পবিত্র কুরআনের শব্দাবলিও তাঁর অভিমতের সমর্থন করে। এছাড়া পূর্বেকার আমলে কুরআন বিশেষজ্ঞ যায়েদ বিন সালাম সাহাবী (রা), তাউস এবং জাবের বিন যায়েদের মতো বিখ্যাত তাবেঈনদের মতের সাথে তাঁর মতের সামঞ্জস্য রয়েছে। এছাড়া কুরতুবী এবং ফখরুদ্দিন রাজীর মতো কুরআন বিশেষজ্ঞদের একটি দলও তাঁর বর্ণিত মতের পূর্ণ সমর্থন করেন।

ইমাম বুখারী বলেন যে, ইমাম শাফেয়ীর বর্ণিত কুরআনী আয়াতের উদ্দেশ্যগত অর্থ এই যে, ব্যক্তি নিজের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও দেখাশুনা

করবে, তাদের চাহিদা পূরণ করবে। এখন যে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বড় হবে তার ব্যয়ও হবে বেশি এবং তার পক্ষে হালাল ও সম্মানজনক উপায়ে জীবিকা উপার্জন মুশকিল হয়ে পড়ে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম একাধিক বিয়ে করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। একথা আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে। আমরা চাই, এ বিষয়ের সব দিক ও বিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। তাহলে এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষার তাৎপর্য খুব ভালো করে প্রকাশ পাবে।

একাধিক স্ত্রীর অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনে

পবিত্র কুরআনে প্রয়োজন বোধে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দানের সাথে সাথে বিভিন্ন আয়াতে এর জন্য বিভিন্ন শর্তও আরোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে একাধিক বিয়েকে নিরুৎসাহ করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে–

"এবং যদি তোমাদের সুবিচার না করতে পারার আশঙ্কা থাকে তাহলে একটি বিয়েই কর।"[১২৪]

অন্য এক আয়াতে সতর্ক করে বলা হচ্ছে–

"(কোনো এক জন্যের প্রতি) পুরোপুরি ঝুঁকে যেও না।"[১২৫] (আল কুরআন) বাস্তবতার প্রতি ঈঙ্গিত করে বলা হচ্ছে–

"(তোমরা নিজেদের) সব স্ত্রীদের মধ্যে একই রকম সুবিচার করতে পারবে না, তোমরা এর যতই ইচ্ছে পোষণ কর না কেন।"

উপরে বর্ণিত প্রথম আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, "যদি তোমরা কোনো একজন স্ত্রীর ওপর অবিচার বা অত্যাচারের আশঙ্কা কর তাহলে একটার বেশি বিয়ে করো না। কারণ অত্যাচার করা যে হারাম এবং নিষিদ্ধ সে ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানই একমত পোষণ করে। আর অত্যাচার এমন এক জঘন্য ব্যাপার যা আল্লাহ নিজেই নিজের ওপর এবং তাঁর সব বান্দার ওপর হারাম ও নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।

এক হাদিসে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

"হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে স্বয়ং নিজের ওপর এবং নিজের সব বান্দাদের ওপর হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অন্যের ওপরে অত্যাচার করো না।"[১২৬]

---

[১২৪] আল কুরআন।
[১২৫] আল কুরআন।
[১২৬] হাদিসে কুদসী।

এভাবে কুরআন শুরুতেই একাধিক বিয়ের উদ্দেশ্য পোষণকারীদের সতর্ক করে দেয় যে– দেখ, স্ত্রীদের ওপর যেন কোনো রকম জুলুম-অত্যাচার না করা হয়। কারণ জুলুম-অত্যাচার আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম ও নিষিদ্ধ। সুতরাং বিয়ের আগেই সব কিছু ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিয়ে করার পরে একথা ভাবলে চলবে না যে, যদি জুলুম অত্যাচারের আশঙ্কা দেখা যায় তাহলে সংশ্লিষ্টজনকে তালাক দিয়ে দেবো! না– তা চলবে না। কারণ এতে আরো অধিকতর জুলুমের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। এমন ব্যক্তির জন্যে একাধিক বিয়ে করা সম্পূর্ণ অবৈধ বা নিষিদ্ধ যে নিজের আবেগ-অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম।

দ্বিতীয় আয়াতে মানবস্বভাবের দিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে– কোনো এক স্ত্রীর দিকে আন্তরিকতার প্রাধান্য আংশিকভাবে হতেও পারে; কিন্তু শুধু একজনের দিকে পুরো ধ্যান দিয়ে অন্যান্যদের অবহেলা করা চলবে না। সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব না হলেও অধিকার কিন্তু সবাইকে সমান দিতে হবে। ভালোবাসার ব্যতিক্রমটা স্বাভাবিক।

তৃতীয় আয়াতে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যতই সম-সুবিচারের কথা বলোনা কেন, প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ সুবিচার করা মুশকিল। অতএব সাবধান! একটার বেশি বিয়ে করতে গিয়ে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিও না।

বলাবাহুল্য, ইসলাম নিছক যৌনবিলাসিতার জন্যে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয় না। সুতরাং একান্ত অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই এর অনুমতি রাখা হয়েছে।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দানের পেছনে মহত্তম উদ্দেশ্য

কোনো বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী ব্যক্তির জন্যে একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের পেছনে ইসলামের মহত্তম উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। একটু চিন্তা করলেই সবাই বুঝতে পারবেন যে, ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের অবকাশ কেন রেখেছে। আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বাস্তব কারণ তুলে ধরছি।

(ক) মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সন্তান কামনা করে। বিয়ের পর প্রত্যেক পুরুষই পিতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে; কিন্তু বিয়ের পর যদি সে জানতে পারে যে, তার স্ত্রী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তাহলে সেকি সন্তান কামনার স্বাভাবিক স্বপ্ন ত্যাগ করবে না-কি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করবে? ইসলাম এক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়। কারণ এ বিপদের সময় ব্যক্তিকে চিরদিনের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দিয়ে তাকে সন্তান লাভের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে অন্যায়। সুতরাং স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম স্বভাবসিদ্ধ কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছে।

অনেক সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, স্বয়ং প্রথম স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য বাধ্য করে এবং স্বয়ং তার স্বামীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সতীনের সন্ধানে বের হয়। এমনকি নিজেই বিয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিজের স্বামীর সন্তান লাভের বাসনা পূরণের জন্যে সে সন্তুষ্টচিত্তে তার গৃহে সতীনকে বরণ করে নেয়।

এটাও দেখা গেছে যে, প্রথম স্ত্রী তার সতীনের সন্তানদের নিজ সন্তানের মতোই আদর-যত্ন করে লালন-পালন করে এবং নিজের শূন্য কোলে সতীনের সন্তান তুলে নিয়ে নারীত্বের পরম তৃপ্তি অনুভব করে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, সুতরাং স্বভাবের ধর্ম ইসলাম এই স্বাভাবিকতার পথ রোধ করে কেমন করে দাঁড়াতে পারে?

(খ) খোদা না করুন স্ত্রী যদি এমন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার কারণে তার স্ত্রীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন স্বামী বেচারা কি করবে?

পাশ্চাত্যের যৌন-বিলাসী গোষ্ঠী হয়তো এর জবাবে বলবে যে, বিয়ে করা ছাড়াই সে পরনারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, কারণ পাশ্চাত্যবাসীরা ব্যভিচারকে কোনো রকমের অপরাধ বলে মনে করে না; কিন্তু ইসলাম হলো সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আদর্শ। সমাজকে সুন্দর কাঠামোর ওপর গড়ে তোলার জন্যেই এর আগমন ঘটেছে। তাই অবৈধ, লজ্জাকর ও অসম্মানজনক এবং কোনো রকমের নোংরামিপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দিতে পারে না। সুতরাং যৌন-নোংরামি ও ব্যভিচারের মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইসলাম দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দান করেছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল মুসলমান নামধারী এমনকিছু জ্ঞানপাপী পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাবে পড়ে একান্ত নির্লজ্জভাবে ইসলামের একাধিক বিয়ের অনুমতিদানকে সমালোচনা করে। অথচ তারা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের মতো পরনারী ও বেশ্যাদের সাথে কারো যৌন-নোংরামিকে অপরাধ তো মনে করেই না; বরং সবরকমের ব্যভিচারকে উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ বলে বিবেচনা করে।

যাহোক, দুরারোগ্য রোগিণীর স্বামীর কাছে এই দুটি পথই খোলা রয়েছে। এখন চাইলে সে ইসলামের অনুমতি মোতাবেক দ্বিতীয় বিয়ে করে সম্মানজনক ও পরিচ্ছন্ন জীবন শুরু করতে পারে– অথবা নোংরামির পথ বেছে নিতে পারে। এখন সম্মান ও কল্যাণের পথ কোনটি তা তাকে বেছে নিতে হবে।

আমাদের মতে সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে শুদ্ধ রাখার জন্যে এবং নারী-পুরুষকে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্যে বিয়ের থেকে উত্তম আর কোনো পন্থা নেই। এজন্যে বেআক্কেলের মতো না জেনে না বুঝে

ইসলামের সমালোচনা না করে বিয়ের উত্তম পন্থা অবলম্বন করাই উচিত। কাউকে এত নিচে নেমে যাওয়া উচিত নয় যে, সে বিয়ে আর বেশ্যালয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতেই অপারগ হয়ে যাবে। কোনো কোনো লোক মনে করে যে, দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম স্ত্রীর ওপর এক অস্বাভাবিক বোঝা; কিন্তু যারা একথা বলেন তারা এই প্রশ্নের কি জবাব দেবেন যে, বন্ধ্যা ও দুরারোগ্য রোগিণী স্ত্রীর স্বামীরা কোন স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করবে?

(গ) কোনো কোনো মহিলা এমনও হয়ে থাকে যারা প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের সংস্পর্শ পছন্দ করে না। স্বামী যতই চেষ্টা ও আবেগ প্রকাশ করুক না কেন এ ধরনের নারীরা কোনোক্রমেই যৌন আবেগ অনুভব করে না। ফলে স্বামী স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আসলে এটা হচ্ছে এক ধরনের স্ত্রীরোগ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের স্ত্রীরোগী বেশ পরিলক্ষিত হয়। এখন বলুন– প্রথমা স্ত্রীর মিলন থেকে বঞ্চিত স্বামী যদি এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সেটা কি অন্যায় হতে পারে?

এভাবে আরো অনিবার্য কারণ হতে পারে– যেখানে কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

ইসলাম স্বভাবসম্মত ও বাস্তববাদী জীবনাদর্শ হিসেবে যেখানে পুরো সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেয় সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যাবলি সমাধানের প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দেয় এবং সাধারণ ও বিশেষ উভয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একএকটি সমস্যার যথার্থ সমাধান পেশ করে।

বস্তুত ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের স্বার্থকে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পরকে পরিপূরক মনে করে। এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম উম্মার সার্বিক উন্নতির জন্যে তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য মনে করি। আর এর সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা হচ্ছে বিয়ে। এরই মাধ্যমে যেকোনো জাতির উন্নতি ও শক্তি নির্ভরশীল। সুতরাং শক্তি, সম্মান ও উন্নতির এতোবড় প্রভাবশালী মাধ্যমকে কোনো মুসলমানই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।

আমরা উদাহরণস্বরূপ মিশরের উত্তরাঞ্চলের উল্লেখ করতে পারি। ওখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। এখানকার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত এমনকি এখানে কাজ-কর্মের জন্যে বাইরের কোনো লোকেরও প্রয়োজন পড়ে না। এখানকার জনবসতি অত্যন্ত ঘন এবং সন্তান প্রজননের হারও বেশি। খেতখামার এতো বেশি হয় যে, কোথাও এক টুকরো খালি জায়গা পড়ে থাকার উপায় নেই; কিন্তু সেখানকার কোনো লোক একাধিক স্ত্রী ছাড়া আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের চিন্তাই করতে পারে না। একাধিক স্ত্রী যাদের আছে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই

আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। অথচ অবিবাহিত অবস্থায় সেখানকার পুরুষরা দারিদ্র্যকেই নিজেদের কপালের লিখন বলে মনে করতো– মিশরের উত্তরাঞ্চলের পর্যটনকারী যেকোনো ব্যক্তি একথার সত্যতা স্বীকার করেন।

(ঘ) প্রাচীনকাল থেকে আজকের এই দিনটি পর্যন্ত জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে আসছে, এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে এর পেছনে জাতীয় অর্থনীতির গতিকে অব্যাহত রাখার জন্যে সক্ষম লোকের প্রয়োজন যে কতো বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ব্যাপারে এটা উল্লেখযোগ্য যে, একাধিক বিয়ের কারণে প্রথম যুগের মুসলমানরা বিস্ময়কর উন্নতি অর্জন করেছিলেন। তাদের জনশক্তি সুসংগঠিত ছিল বলে একদিকে তারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেন এবং অপরদিকে শত্রুর হামলার মোকাবিলা করে শত্রুকে পরাজিত করেন। দেশের পর দেশ তাঁদের পতাকাতলে সামিল হয়ে যায়। সে যুগে কখনো কোনো ক্ষেত্রে সক্ষম লোকের অভাব দেখা যায়নি। তখন মুসলমানদের জনসংখ্যা ছিল যেমন পর্যাপ্ত তেমনি তারা সবাই ছিল সংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আমাদের এই আধুনিক যুগে জার্মানির দৃষ্টান্ত সামনে রাখা যেতে পারে– যখন একের পর এক যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে যুবকদের বিরাট একটি অংশ নিহত হলে হিটলারের টনক নড়ে ওঠে। হিটলার তখন এটা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, বিপুল সংখ্যক লোক মারা গেছে তাতে জার্মানির জাতীয় অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন, আর এই সমস্যার একমাত্র প্রতিকার হিসাবে জার্মান জাতি একাধিক বিয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯৬০ এর ১৩ ডিসেম্বরে দৈনিক আল আহরামে হিটলারের ওপর প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুরমানের ১৯৪৪ সালে লিখিত একটি প্রামাণ্যপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে জার্মান উপ-প্রধানমন্ত্রী লেখেন যে, হিটলার অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ভাবছিলেন যে, "জার্মান জাতির ভবিষ্যত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জার্মানির প্রতিটি পুরুষকে আইনগতভাবে দুটি বিয়ে করার জন্যে বাধ্য করা জরুরি।"

এ ছাড়া আরো একটি বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, মহিলাদের তুলনায় যদি পুরুষদের সংখ্যা কমে যায় তাহলে এক সাংঘাতিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সমাজে বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে তখন একজন পুরুষ যদি কেবল একটিমাত্র বিয়ে করে তাহলে অন্যান্য অবশিষ্ট বিবাহযোগ্য মেয়েদের কি হবে? বলাবাহুল্য, সমাজ যদি তাদের স্বাভাবিক দাবি পূরণের বৈধ পথ না ছেড়ে দেয় তাহলে তারা বিপথগামী হতে বাধ্য হবে। এভাবে সমাজ ধ্বংসের পথে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। যুবতী মেয়েরা শুধু খেয়ে পরেই তো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা পূরণও জরুরি।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিরোধীরাও এসব বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন। তাঁরা এটাও জানেন যে, বিয়ে ও একাধিক বিয়ের স্বাভাবিক পথ বন্ধ থাকার কারণে পাশ্চাত্য সমাজে যৌন নোংরামির ঢল নেমেছে। আজ গোটা পাশ্চাত্য সমাজ যৌন-অপরাধ প্রবণতার খোলাবাজারে পরিণত হয়ে রয়েছে; কিন্তু এই বাস্তব অবস্থা জানা সত্ত্বেও কতিপয় বর্ণচোরা লোক বৈধভাবে একাধিক বিয়ে করাকে অবৈধভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক পাপ বলে মনে করে। এদের কাছে পাপটাই প্রশংসনীয় এবং ন্যায়টা নিন্দনীয়। এসব লোক বৈধ উপায়ে সন্তান উৎপাদনে নাক সিটকায় আর অবৈধ জারজ সন্তানদের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা দাবি করে। যেন বৈধ পিতার সন্তানরা অবৈধ জারজ সন্তানের চেয়ে হীন কিছু! তথাকথিত আধুনিক-আধুনিকাদেরই এসব হাস্যকর আন্দোলনগুলোর পরিণাম যে কি হবে তা খুবই পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে। এরা পাশ্চাত্যের মতো আমাদের সমাজকেও আবর্জনাপূর্ণ করে দিতে সচেষ্ট।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানির মহিলারা ব্যভিচার (যেনা)-কে আইনগত মর্যাদার দাবি তোলে এবং সারাজীবন নির্দিষ্ট কোনো বেশ্যালয়ে কাটাতে এবং সামাজিক কোনো মর্যাদা থেকে বঞ্চিত শিশুর মা হতে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে যে, তাদেরকে সাময়িকভাবে এক একবার এক একজন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েমের অধিকার দিতে হবে এবং এক মহিলা যে পুরুষকে ছাড়বে অন্য মহিলা এসে তার স্থান পূরণ করবে। তারা তাদের এই দাবি পূরণের জন্যে একটি আন্দোলন গড়ে তোলে যাতে তাদের আওয়াজকে সর্বত্র পৌঁছানো যায় এবং ব্যভিচারের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাদের এই হাস্যকর ও অবাস্তব দাবি ইউরোপে তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি; কিন্তু গোটা পাশ্চাত্যে একদিকে বৈধ পন্থায় একাধিক বিয়েকে কঠোর সমালোচনা করে আর অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে একই পুরুষকে কয়েকটি নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে আপত্তিকর কিছু মনে করে না। বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্যের পুরুষদের মতো নারীরাও অবৈধভাবে বিভিন্ন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক রক্ষাকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলে মনে করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনগত অনুমতি আসলে আপত্তিকর কিছু নয়; বরং তার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগটাই আপত্তিকর যা ভোগবাদী মানুষ নিছক যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে করে। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজে খাওয়া-পরা আর স্ফুর্তি করাটাই হলো আসল কথা। সেখানে বিয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবহেলিত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ব্যভিচারী বলে সেখানে তালাকের হিড়িক লেগে রয়েছে।

সেখানে যৌন-সম্ভোগটাই বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাদের ব্যভিচার ও যৌন নোংরামির ফলে সমাজের কি ক্ষতি হচ্ছে তা ভেবে দেখার অবকাশ তাদের নেই। মোটকথা, যৌনস্বার্থ ছাড়া পাশ্চাত্য সমাজে মেয়ে ও মহিলাদের অন্য কোনোরকম মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই।

এই পাপাচারের অবসান ও সমাজের সংস্কার কেবল আল্লার নির্দেশিত স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেই করা যেতে পারে। এজন্যে আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অপরিহার্য। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানুষের মনমস্তিষ্ক ও চিন্ত াভাবনার পরিশুদ্ধি করতে হবে। লোকদেরকে ইসলামী আদর্শের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। এরপরই এসব নোংরামির উচ্ছেদ সহজ-সম্ভব হবে।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আগেকার যুগের তুলনায় একাধিক বিয়ের প্রচলন আজকাল কমে গেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ আজ তার দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন এবং জীবনের উন্নতি সম্পর্কে ভালো করে অবহিত। এমন অনেক লোকও রয়েছেন যাঁরা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের মন-মগজ ও ক্ষমতাকে মহত্তম উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উৎসর্গ করে রেখেছেন।

এই যে বিশ্বজোড়া নতুন ইসলামী জাগরণ এবং জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও আলোকপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যে ব্যাপক ইসলামী অনুভূতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এতেকরে এটাও আশা করা যায় যে, কেউ আর বিনা কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে কেবল অনিবার্য কারণ বশতই তারা একাধিক বিয়ের অনুমতি থেকে উপকৃত হবে। এভাবে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব সুফল সর্বত্র দেখা যাবে এবং দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীদের ওপরও ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রত্যেকের সামনেই ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যাবে।

একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা বিধান : পালাবন্টন (কাসাম)

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। এর জন্য একটা সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থা প্রদান করেছে– যা মানুষের প্রাকৃতিক সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ও সমাজ জীবনের জন্য কল্যাণবহও– যদি তা যথারীতি পালন করা হয়। তবে ধর্মদ্রোহী ও অপসংস্কৃতির ফাঁদে যাঁরা পড়ে রয়েছে তাদের চিন্তাধারা অন্যরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। আর সেটা মুমিন মুসলিমের দেখার প্রয়োজনও করে না। স্বামীর একান্ত প্রয়োজনে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যায় অধিক বিবাহ একমাত্র কার্যকরী বাস্তব সমাধান। ইসলাম এ অধিক বিবাহিত স্বামীদের প্রতি আদেশ করেছে যে, যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে যথাযথ ইনসাফ করা হয়।

একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা বিধান করা কুরআন ও হাদীস উভয়টি দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ۔

"[চার স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ এ বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন] তোমাদের যদি সমতা বিধান না করার ভয় হয়, তাতে এক স্ত্রীর উপরই যথেষ্ট কর। অথবা যে দাসী তোমাদের নিকট রয়েছে তার উপর নির্ভর কর।"[১২৭]

এ আয়াতের আলোকে বুঝা যায়, সমতা বিধান না করার যদি প্রবল ধারণা হয়, তখন কয়েকজনকে বিবাহ করা এ কারণে নিষেধ যে, এতে এ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কিন্তু বিবাহ সহীহই হবে না– বিষয়টি এমন নয়। বিবাহ অবশ্যই সহীহ হয়ে যাবে।

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা বিধান করা একান্ত আবশ্যক। কোন স্ত্রীর প্রতি বেশী ভালবাসা পোষণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে কিন্তু তাদের মধ্যে ভরণ-পোষণ ও বস্ত্র ইত্যাদি বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মানুষের অধিকারর্ভুক্ত ব্যাপার। এতে তারতম্য করা হবে শাস্তির কারণ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ۔

"হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে হক বন্টন করতে গিয়ে তা ন্যায্যভাবেই করতেন। এবং তিনি বলতেন– হে আল্লাহ, আমার অধিকার মূলে (ক্ষমতার ভিত্তিতে) আমার এ বন্টন। অতএব আমাকে তিরস্কার করবে না এমন কোন ব্যাপারে যা আপনার অধিকারে রয়েছে কিন্তু তাতে আমার কোন অধিকার (হাত বা ক্ষমতা) নেই।"[১২৮] (আর্থাৎ অন্তরের মহব্বতের ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মহব্বতের আধিক্য ছাড়া সব জিনিসের মধ্যে মানুষের মালিকানা ও সামর্থ্য আছে।

---

১২৭ আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪ : ৩

১২৮ ইবনে হিব্বান ১৩০৫, ও হাকেম ১৮৭/২, আবু দাউদ ২১৩৪ হাদীসটি সহীহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- যার দুটি স্ত্রী থাকে আর সে কোন একটির দিকে ঝুঁকে যায় সে কিয়ামত দিবসে একদিকে বক্রভাবে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় উত্থিত হবে।"

পালা-বন্টনের বিভিন্ন বিধি-বিধান

১. স্ত্রীদের মাঝে পালাবণ্টন করা ওয়াজিব : স্ত্রীদের মধ্যে পালাবণ্টন করা ওয়াজিব; এবং পালাবন্টনে ব্যর্থ হলে স্বামী গুনাহগার হবে।

২. কুমারি-অকুমারি সকল স্ত্রীদের মদ্যে পালাবন্টন : কোনো একজন পুরুষের যদি দুই কিংবা দু'য়ের অধিক স্ত্রী থাকে। উভয়ে কুমারী হোক বা অকুমারী, কিংবা উভয়ে অকুমারী হোক, কিংবা একজন কুমারী ও অপরজন অকুমারী হোক। ইনসাফের সাথে পালা-বন্টন করা ওয়াজিব। দলিলের বর্ণনায় হিদায়া গ্রন্থকার দুটি হাদীস পেশ করেছেন। উভয় হাদীসের মর্ম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু হাদীসের মধ্যে কুমারী ও অকুমারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তাই তার হুকুমের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

৩. নব বিবাহিত ও পুরাতন স্ত্রীদের মধ্যে পালাবন্টন : হিদায়া গ্রন্থাকার বলেন, নতুন ও পুরাতন স্ত্রীর মাঝেও সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব।

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- যার দুটি স্ত্রী থাকে আর সে কোন একটির দিকে ঝুঁকে যায় সে কিয়ামত দিবসে একদিকে বক্রভাবে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় উত্থিত হবে।"

উক্ত হাদীসে পালাবন্টন মুতলাক বা শর্তহীন, তাই নতুন ও পুরাতনের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হবে না। আর আকলী দলিল হলো, পালা-বন্টন করা হলো বিবাহের হকসমূহের অন্যতম হক। যেমন- খোরপোশ বিবাহের হক। আর এ হকের মধ্যে কুমারী-অকুমারী এবং নতুন ও পুরতনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন- মুসলিম নারী ও কিতাবী নারী, প্রাপ্ত বয়স্কা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী, মাতাল ও বুদ্ধিমতি নারী এবং সুস্থ ও অসুস্থ নারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, এ নারীর মাঝে হুকুকের সবব হলো সমানে সমান। আর সবব হলো ঐ হালাল হওয়া যা বিবাহ দ্বারা সাবেত হয়।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয়, তাহলে বিবাহের পর সাত দিন থাকবে আর যদি অকুমারী হয়, তাহলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান করবে। তাদের দলিল হলো হযরত আনাস রা. কর্তৃক হাদীস–

عَنْ اَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ ـ

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– এটা সুন্নাত বা বিধিসম্মত হবে– যখন মানুষ কোন কুমারীকে অকুমারীর উপর বিয়ে করবে, তার সঙ্গে সাত দিন অবস্থান করার পর তার স্ত্রীদের মধ্যে এক সমভাবে বন্টন করবে। আর যখন কোন অকুমারীকে বিয়ে করবে তখন তার সঙ্গে একাধিক্রমে তিন দিন অবস্থান করার পর তাদের হক সমভাবে বন্টন করবে।"[১২৯]

কুমারী নারী স্বামীর নিকটে অপরিচিত এবং তার পরিবার থেকে দূরে, তাই নতুন জীবনে স্বামী বন্ধুত্বের ও একাকিত্ব-নি:সঙ্গতা দূর করার বেশী প্রয়োজন যা পূর্বে বিবাহিতা নারীর বিপরীত।

৪. পালাবন্টনের পরিমাণ নির্দারণ : পালা-বন্টনের পরিমাণ নির্ধারণ করার এখতিয়ার হলো স্বামীর। মনে চাইলে এক এক দিনের পালা-বন্টন করবে, কিংবা দুই দুই দিনের বা তিন তিন ও চার চার দিনের পালা-বন্টন করবে। আর যেহেতু এ বন্টন করা ওয়াজিব হলো অন্তরঙ্গ তা স্থাপনের নজ্য এবং ভয়ভীতি দূরীভূত করার জন্য তাই প্রয়োজন হলো নিকতম পরিমাণের ধর্তব্য করা। আমর [গ্রন্থকার] মতে সাত দিনের বেশি পালা-বন্টনের পরিমাণ নির্ধারণ করা কষ্টকর। তাই এক সপ্তাহের অধিক পরিমাণ নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। হ্যাঁ স্ত্রীরা যদি এক সপ্তাহের বেশির উপরও রাজি হয়ে যায়, তাহলে আধিক্যের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। তবে সঙ্গত হলো এ পরিমাণ যেন ঈরা [চার মাস] পর্যন্ত না পৌছে। স্বামীকে এখতিয়ার দেওয়ার হেতু হলো, স্বামীর উপর তো পালা-বন্টন ওয়াজিব, কিন্তু সমতার পন্থা ওয়াজিব নয়। আর সমতা হলো রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে; হেতু হলো, স্বামীর উপর তো পালা-বন্টন ওয়াজিব, কিন্তু সমতার পন্থা ওয়াজিব নয়। আর সমতা হলো রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে সহবাসের ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ, সকল স্ত্রীর নিকট সমান সমান রাত্রিযাপন করবে। ঐ রাতগুলোতে

---

১২৯ বুখারী, ৫২১৪

সহবাস শর্ত নয়। কেননা, সহবাস নির্ভর করে মনের প্রফুল্লতার উপর, আর এটি তার এখতিয়ারভুক্ত নয়।

৫. স্বাধীন ও দাসীর পালাবন্টন : যদি কারো বিবাহে একজন স্বাধীন স্ত্রী ও একজন দাসী স্ত্রী থাকে, তবে পালা-বন্টনের ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রী দুই-তৃতীয়াংশ আর দাসী স্ত্রী এক-তৃতীয়াংশ পাবে। দলিল সাহবীদের ইজমা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী রা. উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। আকলী দলিল হলো, যেহেতু দাসী স্ত্রীর হালাল হওয়ার ক্ষেত্র স্বাধীন স্ত্রীর হালাল হওয়ার ক্ষেত্র থেকে নিম্নস্তরের, তাই হকসমূহের ক্ষেত্রেও এ নিম্নতা প্রকাশ করা জরুরি। আর যদি দাসী কোনো ব্যক্তির মুকাতাবা, মুদাব্বারা কিংবা উম্মে ওয়ালাম হয় তাহলে সেও দাসীর সমতুল্য। কেননা, দাসত্ব তাদের মধ্যেও বিদ্যমান।

৬. সফরে পালাবন্টন : হানাফী আলেমগণের মতে, কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে সফরের অবস্থায় পালা-বন্টনের কোনো হক তাদের নেই। তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে সফর করতে পারবে। তবে উত্তম হলো, তাদের মধ্যে লটারি করবে। লটারিতে যার নাম বের হয় তাকে নিয়ে সফর করবে।

ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে, তাদের মাঝে লটারি করা ওয়াজিব। এ কারণেই যদি লটারি করা ছাড়া কাউকে নিয়ে সফর করে তবে সফরের এই পরিমাণ হিসেবে আসবে। অর্থাৎ এ পরিমাণ দিনই ঐ স্ত্রীর কাছে অবস্থান করবে যাকে সে সফরে নেয়নি। ইমাম শাফেয়ী র.-এর দলিল, হাদীসের বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

“হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদেশ ভ্রমণে যেতেন তখন বিবিদের নামে লটারি করে যাঁর নাম পেতেন তাঁকে নিয়ে সফর করতেন।”[১৩০]

হানাফীদের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তার স্ত্রীদের মাঝে লটারি করা নিরেট তাদের মনতুষ্টির জন্য ছিল। তাই এ লটারি করা মোস্তাহাব হবে; ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর পালা-বন্টন করা ওয়াজিবই ছিল না।

---

১৩০ বুখারী, হাদীস নং : ২৫৯৩

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۔

"আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে চান দূরে রাখুন আর যাকে চান কাছে রাখুন"[১৩১]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর পালা-বন্টন জরুরি নয়। হাফেজ আব্দুল আযীম মুনযিরী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাওদা, জুয়াইযিয়া, উম্মে হাবীব, সফিয়া এবং মায়মূনাকে দূরে রেখেছেন এবং হযরত আয়েশা ও অন্যান্য স্ত্রীদেরকে কাছে রাখতেন। সুতরাং যখন তার উপর পালা-বণ্টনই ওয়াজিব নয় তখন লটারি কিভাবে ওয়াজিব হবে?

আর লটারি করা এ কারণেও মোস্তাহাব যে, স্বামীর সফরের সময় স্ত্রীর কোনো হকই নেই। সুতরাং স্বামী যদি তাদের কাউকে না নিয়েও সফরে যায় তাও তার এখতিয়অর আছে। এমনিভাবে যদি তাদের কোনো একজনকে নিয়ে সফর করে তাও তার এখতিয়ার রয়েছে এবং এটি কোনো হিসেবে আসবে না।

৭. নিজের পালা অন্য সতীনকে দান : আর যদি স্ত্রীদের মাঝে কোনো একজন নিজের পালা অন্য কোনা সতীনকে দিয়ে দেয়, তাহলে এটি শরয়ীভাবে জায়েজ। দলিল হলো- হাদীসের বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

"হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। অবশ্য যামআ তনয়া 'সাওদা' (রা.) তাঁর পালার দিবসগুলো হযরত আয়েশাকে দান করেছিলেন। বস্তুত রাসূল ﷺ আয়েশার নিকটে অবস্থান দিবস ও হযরত সাওদার নিকটে অবস্থান দিবসগুলো হযরত আয়েশার ভাগে দিতেন।"[১৩২]

আর যে সকল স্ত্রী নিজেদের পালার দিন অন্য কোনো সতীনকে দিয়ে দেবে তাদের জন্য জায়েজ আছে তা আবার ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা সে এমন হক রহিত করেছে যা এখনো ওয়াজিবই হয়নি, তাই তা রহিতই হবে না। সুতরাং এ

---

১৩১ আল কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫১

১৩২ বুখারী ৫২১২

রুজু করা নিজের পালা থেকে বারণ করা হবে; কোনো বিলুপ্তকৃত জিনিসকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

৮. এক বাড়িতে একাধিক স্ত্রীকে একত্রে রাখার বিধান : দু'জন বা এর অধিক স্ত্রীকে এক বাড়ীতে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া একত্রে রাখা স্বামীর জন্য হারাম।

৯. স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম : স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনে, রাত্রি যাপনে, ভরণ-পোষণে, বাসস্থানে ইনসাফ করা ওয়াজিব। আর সঙ্গমে বরাবর করা ওয়াজিব নয় তবে সম্ভব হলে উত্তম। আর দিলের আকষর্ণ কারো প্রতি বেশী হলে তার গুনাহ হবে না; কারণ কেউ তার দিলের মালিক নয়।

১০. স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনের আহ্কাম : স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে তার দিন সতীন বা স্বামীকে হেবা-দান করতে পারে এবং স্বামী তা অন্য স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করলে জায়েজ। যার একাধিক স্ত্রী আছে তার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট (যাদের আজ দিন না) প্রবেশ করা এবং নিকটবর্তী হওয়া ও খবরাদি নেওয়া জায়েজ। তবে রাত হলে যার পালা তার নিকটে ফিরে আসতে হবে এবং তার জন্যই রাত্রি নির্দিষ্ট করতে হবে।

১১. বণ্টনের সময় : যার উপার্জনের সময় দিনে তার সময় বণ্টন রাত্রে আর যার উপার্জনের সময় রাত্রে তার সময় বণ্টন দিনে। পবিত্র ও ঋতবতী এবং বয়স্কা ও ছোট সবার জন্যে বণ্টন করবে। কিন্তু যদি ঋতুবতী ও রুগিণীর জন্য বণ্টন না করার ব্যাপারে ঐক্যমত হয় তাহলে জায়েজ। আর যে তার অধিকার বিলুপ্ত করবে চাইলে তার জন্য সময় বণ্টন করবে না।

১২. অনপুস্থিত স্বামীর আগমনের পদ্ধতি : অনপুস্থিত স্বামীর জন্য সুনড়বত হলো হঠাৎ করে বাড়ীতে আগমন না করা বরং তার আগমনের সময় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া; যাতে করে স্ত্রী সুন্দর ভাবে সাজগোজ ও পরিপাটি করে স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। আর মাথার এলোমেলো চুল পরিপাটি-সিঁথী ও নাভির নিচের লোম পরিস্কার করতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তালাক

"আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়াবলির মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে তালাক।"[১৩৩]

ইসলাম তালাককে অপছন্দ করে

তালাকের সহজ-সরল অর্থ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া এবং তারা আল্লাহর আইন মোতাবেক পরস্পর যে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা নাকচ করে দেওয়া।

মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহ আইন নাকচ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মধ্যস্থতাকে ভঙ্গ করা। যারা এমন করে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালোবাসা ও স্বস্তির অবসান ঘটায়। কোনো রকম অনিবার্য ও অপরিহার্য কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লাহর আইনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সমতুল্য ধৃষ্টতা। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নবী বলেছেন–

"তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমার সাথে খেলা করছো, কখনো বলো যে তালাক দিয়েছি, আবার কখনো তা ফিরিয়ে নাও।"[১৩৪]

"আল্লাহর কিতাবের সাথে কি খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।"[১৩৫]

এসব কথা প্রিয়নবী এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যে তার স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাক দিয়েছিল।

আজকাল সাধারণভাবে লোক যেমন মনে করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। এটা একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। ইসলামী শরীয়ত একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়েছে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের চরম অবনতিশীল অবস্থায়– যখন মিলেশিয়ে দাম্পত্য জীবনযাপনের অন্য কোনো বিকল্প পন্থাই অবশিষ্ট না থাকে– ঠিক তখনই স্বামীকে এই শেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তালাকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয়নবী বলেছেন–

"আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়াবলির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে তালাক।"[১৩৬]

---

[১৩৩] আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাফেজ।
[১৩৪] ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান।
[১৩৫] নাসায়ী।
[১৩৬] আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাফেজ।

প্রিয়নবী আরো বলেন–

"আল্লাহ তালাকের চেয়ে বেশি নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই সৃষ্টি করেননি।"[১৩৭]

হযরত আলী (রা) প্রিয়নবীর বরাত দিয়ে বলেন–

"বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না, কারণ তালাক এমন জিনিস যার কারণে আরশও নড়ে ওঠে।"[১৩৮]

তালাক ও যৌন বিলাসিতা

কোনো কোনো লোক জীবনের বাস্তবতার ব্যাপারে চরম উদাসীন হয়ে থাকে। জীবনের সকল ব্যাপারেই তাদের দৃষ্টিকোণ হয় ভাসা ভাসা জীবন ও তার বাস্তবতাকে গভীরতার সাথে বিবেচনা করতে তারা অক্ষমতার পরিচয় দেয়। যেমন এ ধরনের লোকেরা বিয়েকে নিছক যৌন বিলাসিতারই একটা মাধ্যম মনে করে। ব্যস, যখনই কোনো নারীর ওপর তাদের আবেগ উত্তেজনায় ভাটা পড়ে যায়, তখন তারা তাদের যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্যে অন্য নারীর অনুসন্ধান করে। কিছুদিন পর যখন এটার ওপরও তাদের বিরক্তি এসে পড়ে তখন তারা আর একজনের দিকে দৃষ্টি হানে। এভাবে তাদের যৌন বিলাসিতার ঘৃণ্য অভিযান অব্যাহত থাকে। তারা তাদের পাশবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে অসংখ্য নারীর জীবন ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তাদের এই জঘন্য যৌন-বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়ে যে কতো অসংখ্য নারীর জীবন ব্যর্থ ও বিনষ্ট হচ্ছে, তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক তাকে বিবেচনাযোগ্য মনে করে না। এ ধরনের লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রিয়নবী বলেছেন–

"বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না, কেননা আল্লাহ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের ভালোবাসেন না।"[১৩৯]

আমরা আগেই বলেছি যে, পাশ্চাত্য সমাজে যৌন বেলেল্লাপনা ও ব্যভিচার একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এখন তারা তাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের এই বিভৎস দিকটির প্রকাশ্য প্রচারটাকেও আর লজ্জাকর বা অপমানজনক বলে মনে করে না। এমনকি পাশ্চাত্যের নারী পুরুষ বিয়ের পরেও অন্যান্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে আপত্তিকর মনে করে না; বরং তারা বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো অবাধ যৌন মিলনকে একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন বলে যুক্তি দেয়। এভাবে পাশ্চাত্যের যেকোনো স্বামী বিয়ের পরও বিভিন্ন পর-নারীর সাথে প্রকাশ্যে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের স্ত্রীরাও স্বামী থাকা

---

[১৩৭] দারকুতনী।

[১৩৮] দায়লামী।

[১৩৯] দায়লামী ও দারকুতনী।

সত্ত্বেও বিভিন্ন পর-পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েম করে। এটাকেই তারা 'আধুনিকতা' এবং 'প্রগতিশীলতা' বলে মনে করে। আমাদের মতে এটা হচ্ছে মানবতার অবনতির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অবদান। পাশ্চাত্যের এই তথাকথিত ঘৃণ্য আধুনিকতা ও জঘন্য প্রগতিশীলতা মানুষের জ্ঞান-বিবেক সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাকে সব রকমের মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। নারীও মানুষ, পুরুষও মানুষ এবং একজন মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার মানবিকতা। আর মানবিকতার অর্থ হচ্ছে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর থেকে বড় সম্পদ ও বড় সম্মান মানুষের আর কিছুই হতে পারে না। এর থেকে সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য আর কিছুতেই নেই। বিশেষকরে আত্মসম্মান ও লজ্জাশীলতা হচ্ছে নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ, আর এটাই তার প্রধান রূপ ও গুণ। যদি এই গুণবৈশিষ্ট্য থেকে নারী বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে সে এক জঘন্যতম প্রাণীতে পরিণত হয়। আত্মমর্যাদাবোধহীন এবং নির্লজ্জ নারী হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, নীচ নারী।

তালাক ও মতপার্থক্য

হতে পারে, কোনো কোনো নারীর মধ্যে কিছু অপছন্দনীয় অভ্যাস পাওয়া যেতে পারে। যার কারণে সে নিন্দনীয় হয়ে পড়ে; কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় তালাক নয়। ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক ছোটখাট খুঁতগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের মধ্যেকার মিলগুলো নিয়ে সুখী সুন্দর ও স্বস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনযাপন করুক। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে বিশেষ রেয়াত (ছাড়) দেওয়ার পরামর্শ দেয়। নারীর ছোটখাট ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করার সুপারিশ করে। প্রিয়নবী তুলনামূলক উদাহরণের মাধ্যমে নারীর পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন–

"নারী পাঁজরের মতো বাঁকা, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে সে ভেঙে যাবে। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে তাদের বাঁকাপনা সত্ত্বেও তোমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিস শরীফের শেষ অংশটির বিষয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, পুরুষকে নারীর ছোটখাট দোষক্রটির দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। ক্ষমাই যে মহৎ ও সুখী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটাও বলে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের পরিবর্তে নারীদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাক তাহলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু তাই বলে কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, ইসলাম নারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করার বা চরিত্রবিরোধী ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে

অথবা নারীকে আপাদ-মস্তক অপরাধিনী মনে করছে। না, তা নয়। আসলে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে এটা বোঝানো যে– ঘটনাচক্রকে নারীর মধ্যে যদি কোনো দোষ দেখা দেয় তাহলে তাকে পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়ো না করা হয়। কারণ, হতে পারে একদিকে তার কোনো খুঁত থাকলেও অপর কোনো দিকে হয়তো অনেক ভালো গুণও থাকতে পারে– যা তোমাদের পছন্দনীয়। কারণ দোষগুণ নিয়েই মানুষ, আর নারী মানুষ বৈ-তো নয়। এই বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নবী বলেছেন–

"কোনো মোমেন পুরুষ কোনো মোমেনা নারীকে যেন ঘৃণা না করে। কেননা হতে পারে তার কোনো কর্ম অপছন্দ তাহলে অন্য কর্ম পছন্দও হতে পারে।"[১৪০]

এই হাদিস থেকেও অনুমান করা যায় যে, ইসলাম কিভাবে মুসলমানদেরকে তালাকের নিন্দনীয় পন্থা থেকে বিরত রাখতে চায়। যদি স্ত্রীর কোনো দোষ থেকেই থাকে তাহলেও পুরুষকে সমঝোতা ও সম্প্রীতির পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম এ ব্যাপারে পুরুষকে কেবল পরামর্শই দেয় না বরং স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করার আদেশই দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন–

"ওদের (স্ত্রীদের) সাথে সদয় সুন্দর ব্যবহার করো। যদি তারা তোমাদের অপছন্দও হয় তাহলে হতে পারে যে, তোমরা কোনো একটা জিনিসকে অপছন্দ করবে আর আল্লাহ তার মধ্যেই অনেক কল্যাণ নিহিত রাখবেন।"[১৪১]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আবু বকর জাসসাস তাঁর তাফসীর আহকামুল কুরআনে বলেন "এই আয়াত এ কথার প্রমাণ যে, ইসলামী শরীয়ত, স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও স্ত্রীকে টিকিয়ে রাখার উপদেশ দেয় কেননা আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাতে তিনি বিরাট কল্যাণ রেখেছেন।"

কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও স্ত্রী যদি সত্যিসত্যিই কোনো অপ্রিয় কর্মে অভ্যস্ত হয়ে থাকে যা সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে এবং স্বামীর শান্তি ও স্বস্তি নষ্ট করছে; এবং যদি কোনো আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, প্রীতি ভালোবাসা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরও যদি স্ত্রী তার বদঅভ্যাস ত্যাগ না করে থাকে তাহলে ইসলাম একেবারে শেষ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে দাম্পত্য সম্পর্ক পৃথকীকরণের অনুমতি দেয়; কিন্তু শেষ পর্যায়েও প্রিয়নবী সতর্ক উপদেশ দিয়ে বলেন যে,–

---

[১৪০] আহমদ, মুসলিম।
[১৪১] সূরা নিসা : ১৯।

"নারীদেরকে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তালাক দিও না। কেননা, আল্লাহ্ সম্ভোগকারী এবং সম্ভোগকারীণীদের ভালোবাসেন না।"[১৪২]

আভিধানিক ও পারিভাষিকভাবে হাদিসটির সারমর্ম হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নারীদের তালাক দিও না। বস্তুত তালাক হবে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থার শেষ ব্যবস্থা।

যেসব কারণে তালাক অকার্যকরী হয়ে যাবে

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা মোতাবেক যেসব কারণ ও অবস্থায় তালাক কার্যকরী হবে না, ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

১. তীব্র ক্রোধের অবস্থায় দেওয়া তালাক কার্যকরী হবে না। তীব্র ক্রোধের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির সেই অবস্থা যখন সাময়িক উত্তেজনায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং যা সে বলতে চায় তা বলতে পারে না, এবং তার মুখ থেকে ওইসব কথা বেরিয়ে আসে, যা বলার কোনো উদ্দেশ্যই তার মনে ছিল না। ইসলামী আইন-বিশেষজ্ঞরা নিচের হাদিস থেকে এই যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। প্রিয়নবী বলেছেন–

"ক্রোধের অবস্থায় তালাকও কার্যকরী হয় না, আর যুক্তিও নয়।"

মূল হাদিসে আরবি 'এখলাক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মনীষী ইবনে কাইউম 'এখলাক'-এর অর্থ করেছেন 'গযব' বা ক্রোধ বলে। ইমাম আবু দাউদও তাঁর 'সূনান'– এ একই অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে গবেষণামূলক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন– 'গলক' সে ধরনের লোকদের বলা হয় যাদের চিন্তা ও বোধশক্তি লোপ পায়, যেমন মদখোর, পাগল এবং অত্যধিক উৎপীড়িত ব্যক্তি বা ভীষণ রোগে আক্রান্ত কোনো লোক। এসব ধরনের অবস্থায় তালাকদাতার মনে তালাকের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এজন্যে "যদি জেনে বুঝে তালাক না দেওয়া হয় তাহলে এসব অবস্থায় তালাক কার্যকরী হবে না।"

২. যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে বলে যে, "যদি আমি অমুক কর্ম করি বা না করি তাহলে আমার তালাক জরুরি।" তা এ ধরনের কথায়ও তালাক কার্যকর হবে না।

মনীষী ইবনে কাইউম তাঁর 'এলামুল মোকেয়ীন' গ্রন্থে লিখেছেন– "ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর দলভুক্ত কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতামতও তাই।

[১৪২] তাবরানী।

"আমার ওপর তালাক জরুরি হবে"– এই কথা বলার ব্যাপারে তাঁদের অভিমতও একই। এর কারণ আসলে এই যে, এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারণকারী ব্যক্তি আসলে ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ তালাক কেবল তখনই কার্যকরী হয় যখন কোনো ব্যক্তি সুস্থ ও স্বজ্ঞানে বর্তমান অবস্থায় উদ্দেশ্য সহকারে (তালাক) দেয়। যদি এসব শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে তালাক কার্যকরী হবে না।" ইবনে কাইউম বলেন– 'এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশকারী যেন এই কথাই বলতে চায় যে– "তোমাকে তালাক দেওয়া আমার ওপর জরুরি হবে" আর একথা সর্বজনসম্মত যে, যদি সে ব্যক্তি এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় তাহলেও তালাক কার্যকরী হয় না।"

৩. যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুমি অমুকের সাথে কথাবার্তা বল অথবা আমার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে বের হও তাহলে তোমাকে তালাক।" এখন এরপর যদি সেই স্ত্রী কারো সাথে কথাবার্তা বলে বা স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হয় তাহলে তালাক কার্যকরী হবে না। ইবনে কাইউম ইমাম শাফেয়ী মতের অনুসারী বিভিন্ন ইমামের বক্তব্যের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে বলেন– এই বক্তব্য আসলে ফিকাহ পর্যায়ের ইমাম মালেক, ইমাম আহমদের 'উসূলে ফিকাহ'য় এর সমর্থন রয়েছে। এরপর তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে এটা প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের উসূলে ফিকহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

৪. যে ব্যক্তি তালাকের মাধ্যমে কসম করে তার কসম লঘু মনে করা হবে। অথবা যদি কেউ কসম করে এবং সে কসম ভঙ্গ করে তাহলে তার তালাকও কার্যকরী হবে না। আর সে কসম ভঙ্গকারীও হবে না। ইবনে কাইয়ুম 'এলামূল মোকেয়ীন' গ্রন্থে লিখেছেন– "এটা পূর্বসূরিদের পছন্দনীয় অভিমত– যাকে হযরত আলী (রা)-এর মতো মহান সাহাবীও সমর্থন করেছেন। আর কোনো কোনো মালেকী ফকীহ ও পর্যালোচকের অভিমত তো এই যে, এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল বলেও উল্লেখ নেই। এ শব্দসমষ্টি হচ্ছে আবুল কাশেম আল ইয়েমেনীর যা 'আহকামে আবদুল হকে' উল্লেখ রয়েছে। আর এর আগে আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজমের অভিমতও অনুরূপ ছিল– যার সমর্থন তাউসের মতো মহান তাবেঈ এবং ইবনে আব্বাসের কোনো কোনো বিশ্বস্ত সাথিরাও করেছেন।"

আল্লামা আবদুর রাজ্জাক তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন– "আমাদেরকে জানিয়েছেন ইবনে জবীহ; তিনি বলেন, "আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাউস তাঁর পিতার মধ্যস্থতায়; তিনি বলে থাকতেন যে, তালাকের মাধ্যমে কসম খাওয়ার কোনো অর্থ হয় না।" উল্লেখ যে, এই অভিমত প্রকাশ করেছেন এমন

এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি– যিনি তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম মহান তাবেঈ বলে বিবেচিত হন। আর তাঁর সমর্থনে রয়েছেন চারশোরও বেশি ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং এরা সবাই কুরআন ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাঁদেরই ধারাবাহিকতার শেষ স্তম্ভগুলোর মধ্যে আল্লামা আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজমের মতো মনীষীরা রয়েছেন।

কোনো কোনো ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ এই ধারণাও পোষণ করেন যে, তালাকের মাধ্যমে কসম খাওয়া একেবারে লঘুর পর্যায়ে পড়ে না। এর শরীয়তী মান হয়ে যায় এবং কসম ভঙ্গকারীকে কাফফারা আদায় করতে হয়। আর কাফফারা ওটাই হবে যা কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–

"(কসম ভাঙ্গার) কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাবার পরিবেশন করবে যা তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্র পরাও, অথবা একজন গোলাম মুক্ত করাও। আর যারা এসবের ক্ষমতা রাখে না তারা তিন দিনের রোযা রাখবে।"[১৪৩]

কিন্তু এতেকরে তালাক কার্যকরী হবে না। কারণ কাফফারা এবং তালাকের কার্যকরীতার মধ্যে কোনো রকমের সম্পর্ক নেই। যদি কাফফারা আদায় না করে তাহলে গুনাহর ভাগী হবে, আর যদি আদায় করে দেয় তাহলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

উপরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে সামনে রেখে দেখুন যে, ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে কতো মজবুত ও স্থিতিশীল করে দিয়েছে। এই সম্পর্ক কোনো পাগলের প্রলাপ অথবা ক্রোধগ্রস্তের ক্রোধ ছিন্ন করতে পারে না। বলাবাহুল্য, ইসলাম নারীকে তার সন্তান-সন্ততি এবং স্বামীর সাথে শান্তিতে থাকার এক সম্মানজনক সুযোগ সরবরাহ করে। আর এই সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত অটুট থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সামাজিক জীবনে তিক্ততার সৃষ্টি না হয়।

তালাকের নিয়ম-নীতি

ইসলাম জটিল সমস্যাবলিকে বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের সাথে সমাধান করার শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি ইসলামের পন্থার অনুসরণ করে এবং শিক্ষা মেনে চলে তাহলে তালাকের দুর্ঘটনা কম হয়েই যাবে এবং বিয়ে একটি অটুট ও স্থায়ী বন্ধনে পরিণত হবে।

মতভেদের সূত্রপাত স্বামীর পক্ষ থেকে অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অথবা এর মধ্যে উভয়েরই কিছু না কিছু হাত থাকে। যদি সূত্রপাত স্ত্রীর দিক থেকে হয়

---

[১৪৩] সূরা মায়েদা : ৮৯।

এবং স্বামীর ওপর চাপানোর চেষ্টা করে থাকে, তাহলে এমন স্ত্রীকে কুরআনী পরিভাষায় 'নাসেজ' অর্থাৎ অবাধ্য বলা হবে; আর যদি স্বামীই সূত্রপাত করে থাকে আর স্ত্রীর ওপর চাপানোর চেষ্টা করে থাকে– তাহলে স্বামীকেই 'নাসেজ' অর্থাৎ অবাধ্য বলা হবে; কিন্তু মতভেদে যদি উভয়ের হাত সমান থাকে তাহলে উভয়কে কুরআনী পরিভাষা মোতাবেক 'শেকাক' বলা হবে। ইসলাম এই তিনটি সমস্যারই সমাধান পেশ করেছে এবং কল্যাণকামী আপস মীমাংসাকারী হিসেবে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের জ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সমস্যার সন্তোষজনক প্রতিকার বিধান করে। নিচে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

স্ত্রীর অবাধ্যতা

'নসূজ' এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজন অন্যজনের প্রতি অবাধ্যতা ও ঘৃণা প্রদর্শন করে আর স্ত্রীর 'নাসেজ' বা অবাধ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে সে স্বামীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং তার অধিকারকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। পবিত্র কুরআন এই সমস্যার নিম্নলিখিত সমাধান পেশ করেছে–

১. স্বামী তার স্ত্রীকে প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে উপদেশ দেবে এবং সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেবে। তাকে এটা বলবে যে, তার এই অবাধ্যতা আল্লাহর অপছন্দনীয় হবে এবং তার পরিণামও ভালো হবে না। এভাবে স্বামী উদাহরণের মাধ্যমে আদর্শ স্ত্রীদের পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেবে।

এ ধরনের অবস্থায় স্বামীকে অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। উপযুক্ত সময় ও অবস্থা মোতাবেক উপদেশ দেবে। এমন সময় ও অবস্থায় স্ত্রীকে উপদেশ দেবে যখন তা গ্রহণের জন্যে স্ত্রী মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে। এভাবে হতে পারে স্ত্রী তার কথায় প্রভাবান্বিতা হবে এবং পরিবার এক অবাঞ্ছিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

২. স্বামী যদি উপদেশ দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুতেই স্ত্রীকে পথে আশা সম্ভব না হয় তাহলে ইসলাম এক্ষেত্রে শাস্তির পরামর্শ দেয়। আর শাস্তি এভাবে হবে যে, প্রথমে স্বামী পৃথক কক্ষে শয়ন করবে এবং পৃথক বিছানায় শোবে এবং স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে– তার কাছে যাওয়া বন্ধ করবে এবং তার চলাফেরায় এটা দেখাবে যে, সে তার ওপর ভীষণভাবে অভিমান করে আছে। এতেকরে স্ত্রীর নারীসুলভ অহংকারে আঘাত লাগবে এবং

এভাবে সে অবাধ্যতার পথ ত্যাগ করতে পারে। কারণ নারী সবকিছু সহ্য করতে পারে; কিন্তু তার নারীত্বের অবমাননা কখনো সহ্য করতে পারে না। একবার যদি সে তার অমর্যাদা বুঝে নিতে পারে তাহলে অবাধ্যতার পথে অবিচল থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. স্বামী যদি এভাবে নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে তো ভালোই। যদি সে পন্থাও ব্যর্থ প্রমণিত হয় তাহলে একটু তিরস্কারের সাথে হালকা মারধোর করবে; কিন্তু এমনভাবে মারা চলবে না যাতে তার শরীরে দাগ পড়ে, আসলে হালকা মারধোরটা হবে ক্ষণিকের জন্যে কষ্টদায়ক।

এ হচ্ছে, স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে স্বামীকে দেওয়া কয়েকটি কার্যকরী পদ্ধতি; কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো তাড়াহুড়ো বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না; বরং ধৈর্যের সাথে ফলাফলের অপেক্ষা করতে হবে। যদি উল্লিখিত কোনো এক পন্থায় স্ত্রী অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাহলে স্ত্রীকে আগের মতো প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা দেবে এবং তার সাথে পূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে।

কিন্তু যদি অবস্থা তার উল্টো হয় তাহলে উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম। উল্লেখ যে, আমাদের এতক্ষণের আলোচনা কুরআনের এই আয়াতের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। আল্লাহ বলেছেন–

"এবং যেসব নারী থেকে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে বুঝাও, শয়নকক্ষে তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক এবং মারধোর কর যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাহলে অনর্থক তাদেরকে মারপিট করার বাহানা খুঁজো না। বিশ্বাস রেখো, উপরে আল্লাহ রয়েছেন, তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।"[১৪৪]

এখানে একটি বিষয় যা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলো এমন অবস্থায়ও ইসলাম আকার-ইঙ্গিতেও তালাকের কথা উল্লেখ করেনি বরং স্বামীকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যেন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সমস্যাটি সমাধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে। এর জন্যে আলাদা শয়ন, অভিমান প্রকাশ এবং একান্ত দরকার দেখা দিলে খুব হালকা মারধোর করারও পরামর্শ দেয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তালাকের মতো চরমপন্থা অবলম্বনের কথা বলে না বরং স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বলে যে, "অনর্থক তাদেরকে মারপিট করার বাহানা খুঁজো না।" এথেকে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

---

[১৪৪] সূরা নিসা : ৩৪।

খুল'আ

এমন মার যার আঘাতে দাগ না পড়ে। এই হচ্ছে সেই শেষ ধাপ যেখানে এসে স্বামীর প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায়। এরপর স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রতিকার করার কোনো পন্থাই আর স্বামীর কাছে থাকে না। এখানে এসে প্রশ্ন উঠতে পারে, এরপর ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা কি? বলাবাহুল্য, এর পরেও তালাকের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না। এখন স্ত্রী যদি সত্যিই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে থাকে এবং কোনোরকমেই স্বামীর ঘর করতে রাজি না হয় এবং একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামীর দাম্পত্য অধিকার পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে তখন ইসলাম এই অধিকার দেয় যে, সে তার স্বামীর কাছে পৃথক হয়ে যাওয়ার দাবি করবে এবং এর পরিণামের দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তাবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে স্বামী স্ত্রীর পেছনে এত টাকা-পয়সা ব্যয় করছে এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহ করছে সে এত সহজে কিভাবে স্ত্রীকে ছেড়ে দেবে? সুতরাং সুবিচারের দাবি হচ্ছে স্ত্রী মোহর হিসাবে স্বামীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেবে।

তবে স্ত্রী কি পরিমাণ অর্থ আদায় করে খুল'আ অর্জন করবে সে ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন– খুল'আর পরিমাণ মোহরের সমান হবে এবং কেউ কেউ এর চেয়েও বেশি গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

খুল'আর যুক্তি

নিম্নবর্ণিত কুরআনী আয়াত থেকে খুল'আর যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

"তোমাদের জন্যে হালাল নয় যা কিছু তোমরা স্ত্রীদের দিয়েছ তা থেকে কিছুমাত্রও ফেরত নেওয়া। অবশ্য এই অবস্থা স্বতন্ত্র স্বামী-স্ত্রী (যদি) এই আশঙ্কা করে যে, আল্লার সীমায় কায়েম থাকতে পারবে না এবং এমন অবস্থায় যখন তুমি ভয় কর যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমায় কায়েম হয়ে থাকতে পারবে না তখন কোনো বাধা নেই যদি নারী কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করে নেয়।"[১৪৫]

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে খুল'আর সর্বপ্রথম মামলা দায়ের করা হয় জামীলা বিনতে সালুলের পক্ষ থেকে। তিনি তাঁর স্বামী সাবেত ইবনে কায়েসকে কিছু লোকের সাথে যখন আসতে দেখেন তখন তাঁকে অত্যন্ত

---

[১৪৫] সূরা বাকারা : ২২৯।

কুৎসিত ও কদাকার মনে করেন এবং স্বামীর প্রতি তাঁর মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন যে, তিনি এই ঘটনার পরে প্রিয়নবীর দরবারে এসে নিচের বিবৃতি দেন–

"আল্লাহর শপথ, আমি দ্বীনি অথবা চারিত্রিক কোনো দোষের কারণে তাকে অপছন্দ করছি না; বরং তাঁর সৌন্দর্যহীনতাই আমার অপছন্দ।" (ইবনে জবীর) প্রিয়নবী অভিযোগ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–

"সে যে বাগানটি তোমাকে মোহর হিসাবে দিয়েছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেবে?" তিনি জবাব দিলেন– 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!"

এরপর প্রিয়নবী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, "সাবেতকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও," এবং সাবেতকে বললেন,– "তুমি তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।"

ইমাম কুরতুবী সমস্যাটির বিস্তারিত বলেন– "বর্ণিত আছে যে, সাবেতকে স্ত্রী অত্যন্ত অপছন্দ করতেন আর তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মামলাটি প্রিয়নবীর কাছে গেলে তিনি খুল'আর মাধ্যমে উভয়কে পৃথক করে দেন– আর এটা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে খুল'আর প্রথম ঘটনা।" (তিনি আরো লিখেন– "আসলে এই হাদিসটিই হচ্ছে খুল'আর বুনিয়াদ। অধিকাংশ ফকীহ এ ব্যাপারে এই হাদিসটিকেই তাদের যুক্তি প্রমাণের বুনিয়াদ বানিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন– "আমাদের কাছে এটা একটা সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত যা আমি বিদ্বানদের মুখে বারবার শুনে আসছি। অর্থাৎ এই যে, স্বামী স্ত্রীকে কোনো রকমের দুঃখকষ্ট দেয়নি এবং কোনো রকমের দুর্ব্যবহারও করেনি– তা সত্ত্বেও সে তার স্বামী থেকে পৃথক হতে চায় তাহলে তখন স্বামীর জন্যে এটা বৈধ যে, সে তার দেওয়া ধনসম্পদ স্ত্রীর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেবে এবং স্ত্রীকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে) মুক্ত করে দিবে। যেমন প্রিয়নবী সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীর ব্যাপারে করেছেন।"

ইবনে কোদামা তাঁর গ্রন্থ আল-মুগনীতে এ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তার আলোচনার সার কথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রী যখন তার স্বামীকে চেহারা, চরিত্র অথবা অন্য কোনো কারণে অপছন্দ করে অথবা স্বামীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায় তখন স্ত্রী খুল'আ অর্জনের অনুমতি পাবে। এর মাধ্যমে স্ত্রী কিছু সম্পদ বা অর্থের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে মুক্ত করে নেবে। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি হচ্ছে তার যুক্তিগত প্রমাণ–

"যখন তোমার ভয় হয় যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমায় কায়েম থাকতে পারবে না, তখন কোনো বাধা নেই যখন নারী কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করে নেবে।"[১৪৬]

---

[১৪৬] সূরা বাকারা : ২২৯।

খুল'আর সমস্যায় কাজীর ক্ষমতা

খুল'আর কারণসমূহ গভীরভাবে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখাটা কাজীর (বিচারপতির) দায়িত্ব। তিনি এটা দেখবেন যে, স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ঘৃণার মাত্রা কতটুকু এবং এর প্রতিকারের বিকল্প কোনো পন্থা আছে কি-না তাও তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন–

"হযরত ওমরের আদালতে এক নারী তার মামলা দায়ের করে। সে বলে যে, সে তার স্বামীকে অপছন্দ করে এবং কোনভাবেই তার সাথে থাকতে রাজি নন। তিনি মহিলাটিকে উপদেশ দিয়ে তার স্বামীর সাথে অবস্থানের পরামর্শ দেন; কিন্তু মহিলাটি তা গ্রহণ করল না। এরপর তিনি তাকে আবর্জনাময় এক কক্ষে আটক করে দেন। একরাত ওখানে কাটানোর পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞেস করলেন– "রাত কেমন কেটেছে?" মহিলাটি বললো "আল্লার শপথ, বিয়ের পর থেকে এমন আরামের ঘুম আমার আর কখনো হয়নি।" একথা শুনে হযরত ওমর মহিলাটির স্বামীকে ডেকে পাঠিয়ে অবিলম্বে তালাক দেওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন–

"একে খুল'আ দিয়ে দাও তা তার কানের বালির বিনিময়েই হোকনা কেন।"

তাই বলে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে, খুল'আর প্রত্যাশী নারী মাত্রকেই আবর্জনার কক্ষে বন্ধ করে পরীক্ষা নিতে হবে। না, তা নয়। হযরত ওমর তাঁর বুদ্ধিমতো যা করেছেন তা সেই সময় ও পরিবেশ মোতাবেক ঠিকই ছিল। আজকালও যে তেমনভাবে পরীক্ষা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে, হযরত ওমরের এই ঘটনাকে সামনে রেখে এটা অবশ্যই জরুরি যে, কাজী বিষয়টির খুঁটিনাটি তদন্ত করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলার স্বভাব ও আবেগ-অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরি হবে। কারণ একটি ব্যাপার বাহ্যত তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সেটাই যদি প্রতিদিন ঘটে থাকে তাহলে তা তার জন্যে অসহ্য শাস্তির মতো প্রমাণিত হয়।

স্বামীর অবাধ্যতা

অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীকেও বেশ বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে হবে এবং অত্যন্ত প্রেমপ্রীতি ও কৌশলের সাথে স্বামীর অবাধ্যতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে স্বামীর মনের ঘৃণাবোধ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যে যদি দৈহিক বা মানসিক বা আর্থিকভাবে কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার দরকার হয় তাহলে তাতেও যেন ইতস্তত না করা হয়। কারণ স্বামীর সম্মান একজন স্ত্রীর কাছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যসব কিছুর চেয়ে বেশি।

এখানে, দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি কিভাবে হয় বা স্বামীর মনে ঘৃণা বা অবাধ্যতার বীজ কিভাবে ঢোকে তা নিয়ে আলোচনা করার কোনো লাভ বা দরকার নেই। এখানে এতটুকুই বলবো যে, স্ত্রীর সব সমস্যার সমাধান-সূত্র শুধু এই যে, সেসব দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করবে এবং স্বামীর মনমেজাজের দিকে লক্ষ রাখবে। স্ত্রীকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর কাছে তার পছন্দ-অপছন্দ বর্ণনা করাকে তার পৌরুষের বিরোধী মনে করে। এজন্যে স্ত্রীকে স্বামীর চোখ আর চেহারা দেখেই অনেক কিছু বুঝে নেওয়ার দক্ষতা অর্জন করা উচিত। আবার অনেক সময় স্ত্রী তার স্বামীকে বুঝতে দারুণভাবে ভুল করে বসে। ফলে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মোমেনীন হযরত সাওদাহ বিনতে জাময়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন প্রিয়নবীর দৃষ্টিতে নিজের প্রতি কিছুটা উদাসীনতার ভাব লক্ষ করেন এবং এটা অনুমান করেন যে, প্রিয়নবী তাঁকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছেন– তখন তিনি প্রিয়নবীর সামনে গিয়ে সেই উপেক্ষার কারণ জিজ্ঞেস করতে যাননি; বরং তাঁর নারীত্বই সেই আবেগ অনুভব করে নেয় এবং তিনি বুঝে নেন যে, এই উপেক্ষা ও উদাসীনতার কারণ তাঁর মধ্যে কোনো দোষত্রুটির জন্যে নয়; বরং ব্যাপারটা অন্য কিছু। আর তা এই যে, তিনি ছিলেন প্রিয়নবীর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। এ কারণে তিনি স্ত্রীত্বের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারছিলেন না। এজন্যে তিনি তাঁকে ছাড়তে চাচ্ছেন। একথা ভেবে তিনি প্রিয়নবীর কাছে গিয়ে নিজেই বললেন– "ওগো আল্লার রাসূল! আমি বন্ধ্যা (অক্ষম) হয়ে গেছি এবং স্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। আমি আমার বরাদ্দের দিন আপনার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে দিচ্ছি। আমার এছাড়া কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, কেয়ামতের দিন যখন উঠানো হবে তখন আপনার স্ত্রীদের তালিকায় যেন আমারও নাম থাকে।"

উম্মুল মোমেনিন হযরত সাওদাহ বিনতে জামায়ার প্রশংসায় কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়–

"যদি কোনো স্ত্রী নিজ স্বামী থেকে দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তাহলে কোনো বাধা নেই যে, স্বামী ও স্ত্রী (কোনো কোনো অধিকারের বেশি-কম করার ব্যাপারে) পরস্পর সমঝোতা করে নেবে। সমঝোতা সব অবস্থাতেই উত্তম। প্রবৃত্তি সংকীর্ণ মনের দিকে শীঘ্রই আকর্ষিত হয়ে যায়; কিন্তু তোমরা যদি দয়া প্রদর্শন কর এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন কর তাহলে বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মপদ্ধতি থেকে অনবহিত হবেন না।"[১৪৭]

---

[১৪৭] সূরা নিসা : ১২৮।

উপরের আয়াতটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তখনিই এটা অনুভব করবেন যে– ইসলাম একদিকে যেমন নারীকে তার নিজ সমস্যার সমাধান করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে সেখানে সমঝোতার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্য কথায়, ইসলাম দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যাবলিকে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করাকে উত্তম মনে করে। এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন–

"…. কোনো বাধা নেই যে, স্বামী ও স্ত্রী (কোনো কোনো অধিকারের বেশি কম করার ব্যাপারে) পরস্পর সমঝোতা করে নেবে। সমঝোতাই সব অবস্থাতেই উত্তম।"[১৪৮]

স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ

এটা একটা তৃতীয় অবস্থা। এটাকে আমরা 'নুযূজ' বা অবাধ্যতার অর্থে ব্যবহার করতে পারি না। কারণ 'নুযূজ' বা অবাধ্যতার প্রশ্ন তখন ওঠে যখন স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

'নুযূজ' অর্থাৎ অবাধ্যতার ক্ষেত্রে উভয়ে পরস্পরের সাথে কেমন ব্যবহার করবে– তা নিয়ে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘৃণা ও অবাধ্যতার প্রকাশ যদি উভয় পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম তার প্রতিকার কিভাবে করবে? তাদেরকে তো আর তাদের মর্জির ওপর ছাড়া যায় না।

শরীয়তের বিধিবিধান

আল মুগনীর গ্রন্থকার লিখেছেন– "যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে বিচারপতি বিষয়টিকে খুব ভালো করে তদন্ত করার পর কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি এটা প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীই দোষী তাহলে স্ত্রী 'নাসেজ' বা অবাধ্য বলে গণ্য হবে। (এ সম্পর্কে সে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করবে তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে); কিন্তু যদি তদন্তের পর এটা জানা যায় যে, স্বামীই দোষী, তাহলে বিচারপতি এমন কোনো সমাধান খুঁজে বের করবেন যাতে তিনি স্ত্রীকে স্বামীর বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচাতে পারেন।

যদি এই অবস্থার উল্টো ব্যাপার এটা বোঝা যায় যে, উভয় পক্ষ থেকেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে এবং উভয়ই এ ধরনের দাবি করে যে, অপর পক্ষ জুলুম অত্যাচার করছে– তখন সেই অবস্থায় বিচারপতি বিষয়টিকে ভালো করে ভেবেচিন্তে পৃষ্ঠপোষকদের ওপর সোপর্দ করবেন যেন তারা ভালো করে

---

[১৪৮] সূরা নিসা : ১২৮।

ভেবেচিন্তে উভয়কে সুবিচার দান করেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উভয়ের ব্যাপারে জুলুম ও নিষ্ঠুরতার আশঙ্কা থাকে আর এই ভয়ে বিচারপতি উভয় পক্ষের পরিবার থেকে এক একজন শালিস নির্বাচন করে উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্যে পাঠাবেন।"[১৪৯]

ইসলাম যে কত আন্তরিকতার সাথে সমস্যাবলির সমাধান করতে চায় এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায় তা এথেকে প্রমাণিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মতভেদের নিষ্পত্তির শেষ হিসেবে ইসলাম একাধিক বিকল্প পেশ করে বলে যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেরা যদি পারস্পরিক সমঝোতার অবস্থায় না থাকে তাহলে উভয়ে পরিবারের পৃষ্ঠপোষকরা মিলে তাদেরকে বোঝাবে যেন একটি সুখী পরিবার অশান্তির শিকারে পরিণত না হয়। আর এতেকরে যদি সমঝোতা না হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম স্বামীকে এটা বলে না যে, স্ত্রীকে আশ্রিতা হিসেবে কোথাও ঠাঁই দিক। কারণ এতে বড় জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলাম বিচারপতিকে বিষয়টিকে ব্যাপক তদন্ত করার পরামর্শ দেয় যেন তাদের মনে ইতিবাচক রেখাপাত করে। এরপরও যদি ব্যাপারটি আরো অবনতিশীল হয়ে পড়ে তাহলে উভয় পক্ষের পরিবার থেকে দু'জন নির্বাচিত শালিসকে তাদের ব্যাপারাদি পর্যালোচনা করে মতভেদের মূল কারণ খুঁজে বের করার জন্যে পাঠাবে। এরা তাদেরকে উপদেশ দেবেন এবং পারস্পরিক মতভেদের কুফল সম্পর্কে অবহিত করাবেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাদেরকে সঠিকভাবে দাম্পত্য জীবন পুনর্বহাল করার পরামর্শ দেবেন। এরপর যদি স্বামী-স্ত্রী তাদের পরামর্শ মানার জন্যে তৈরি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাদের সংশোধনের সুযোগ দেবেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন–

"আর যদি তোমরা কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কর তাহলে একজন শালিস পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে এবং একজন নারীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ কর। ওরা দুজন সংশোধন করাতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।"[১৫০]

পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি সমঝোতা করানোর আবেদন বিচারপতি নিজে করবেন। আবার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধেও তাঁরা এই শুভ-দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কেননা একটি পরিবারকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে সমঝোতায় অনুপ্রাণিত করানোর এটাই

---

[১৪৯] (আল মুগনী (ইবনে কোদামা) ৬ষ্ঠ খণ্ড অষ্টাদশ পৃষ্ঠা।

[১৫০] সূরা নিসা : ৩৫।

উত্তম উপায়। সমঝোতা করার এই প্রচেষ্টা যদি আন্তরিকতার সাথে করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি পুনর্বহাল না হওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

ফ্রান্সেও ইদানীং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন মোতাবেক বিচারপতি স্বামী-স্ত্রী উভয় পরিবার থেকে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচিত করে তাদের মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্যে পাঠাবেন। বলাবাহুল্য এ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও পদ্ধতি অধিকতর বাস্তবানুগ ও কার্যকর। ইসলাম এক্ষেত্রে মতভেদের মূল কারণ খুঁজে বের করে তারই প্রতিকার করে। ফলে সমস্যাটির স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়। বর্ণিত আয়াতের এই অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ–

"যদি তারা উভয়ে সংশোধন করাতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ করে দেবেন।"[১৫১]

উল্লেখ যে, এখানে সমস্যাটির ইতিবাচক দিকটির ঈঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে, যদি তারা উভয়ে সংশোধন হতে না চায়, তাহলে পৃথক হওয়া উত্তম। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

এখানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন ইসলামী বিশেষজ্ঞ উপরের আয়াতটিকে নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা এই যে, যদি সমঝোতাকারীদের উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং তাঁরা সমঝোতা করানোর ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে এই আয়াত আসলে এই প্রতিশ্রুতিই দান করে যে, সমঝোতা অবশ্যই হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লামা জামাখশারী লিখছেন, "যদি উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার উদ্দেশ্য থাকে এবং উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, মনে আন্তরিকতা ও শুভাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি থাকে তাহলে আল্লাহ সে কাজে সাহায্য দান করবেন এবং সমঝোতা করানোকারীদের সমঝোতা করানোর চেষ্টাকে কবুল করে উভয়ের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসার পথ সুগম করে দেবেন এবং তাদের সম্পর্ককে পুনর্বহাল করে দেবেন।"

এক্ষেত্রে ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তিনি দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে দুজন শালিস পাঠান। তারা নিজের মতো চেষ্টা করে ফিরে এসে জানান যে– "হে আমীরুল মোমেনিন, আমরা উভয়ে সমঝোতা করাতে ব্যর্থ হয়েছি।"

---

[১৫১] সূরা নিসা : ৩৫।

একথা শুনে হযরত ওমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন– তোমরা উভয়েই মিথ্যে বলছো। আসল কথা হচ্ছে, তোমাদের উভয়ের মনে সমঝোতা করানোর সত্যিকার আবেগ ছিলো না। কেননা তোমাদের আবেগ যদি যথার্থ হতো তাহলে আল্লাহ তোমাদের এই কাজে সাহায্য দান করতেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে না, এই জন্যেই যে আল্লাহ বলেছেন–

"যদি তারা উভয়ে সংশোধন করাতে চায় তা হলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।"

বস্তুত হযরত ওমরের এ কথা শতকরা একশোভাগ সঠিক ছিল। সুতরাং সংশ্লিষ্ট শালিস দু'জন লজ্জিত হয়ে আবার গিয়ে আন্তরিকতার সাথে সমঝোতা করানোর চেষ্টা শুরু করেন। বলাবাহুল্য এবার তাঁরা সফল হলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি পুনর্বহাল হয়ে যায়।

তালাকের শরীয়তি নিয়মনীতি

এর আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাধান পেশ করেছি। এখন সমস্যাটির দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করে দেখুন। মনে করুন উভয়ের মধ্যে মতভেদের দেওয়াল যদি এতই কঠিন হয় আর দুর্লঙ্ঘ হয়ে থাকে এবং পারিবারিক জীবনে নিত্যকার তিক্ত অভিজ্ঞতায় যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এই দু'য়ের একত্রে থাকা অসম্ভব– তখন এ অবস্থায় ইসলামের আদেশ কি?

এ সমস্যার সমাধান তালাক; নয় কি?

জী হ্যাঁ, এর একমাত্র সমাধান– শুধু তালাক। কিন্তু এই তালাক কি? এটা কখন কিভাবে দিতে হয়? এবং এর নিয়মনীতিই বা কি?

আমাদের অধিকাংশ ভাই এটাও জানেন না যে, কোন সময় তালাক দেওয়া বৈধ এবং কোন সময় অবৈধ। ইসলাম তালাকের নিম্নলিখিত নীতি প্রণয়ন করেছে–

১. হায়েজ (মাসিক ঋতু) অবস্থায় তালাক দেওয়া বৈধ নয়।

২. পবিত্র অবস্থায়– যখন উভয়ে সহবাস করেছে– তাতেও তালাক দেওয়া সঠিক নয়।

এই দুটি নীতি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে–

"হে নবী! যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও, তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দিও।"[১৫২]

এই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা ছিল প্রিয়নবীর সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত যা তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের ব্যাপারে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর

---

[১৫২] সূরা তালাক–১।

নিজের স্ত্রীকে হায়েজের সময় তালাক দিয়েছিলেন। একথা জানতে পেরে প্রিয়নবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন যে–

"তার উচিত দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করা! এরপর তাকে রুখে রাখে যতক্ষণ না সে পাক হয়ে যায় এরপর আবার হায়েজ হবে, আবার পাক হবে এরপর যদি সহবাসের আগে পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেয় তাহলে এটাই তার সেই ইদ্দত হবে যার হুকুম আল্লাহ তাঁর বাণীতে দিয়েছেন।"

এরপর তিনি কুরআনের সেই আয়াত পড়েন–

"তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দিও।"

সানআনী তাঁর গ্রন্থ 'সবলু-সালাম'-এ এই হাদিস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন "এই হাদিস একথার প্রমাণ যে, স্বামী প্রথম পাকীতে (পবিত্রতাতে) নয়; বরং দ্বিতীয় পাকীতে তালাক দেবে। এভাবে ইদ্দতের গণনা সেই পাকী থেকে করা হবে যাতে সহবাস করা হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনী আয়াতটির যথার্থ অর্থ এই হবে যে, নিজ স্ত্রীদের এমন পাকীতে তালাক দিও যাতে তুমি তার সাথে সহবাস করনি।

তালাকের ব্যাপারে ইসলামের এই আইন ও নীতির মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ উপকারী প্রমাণিত হবে বলে আশা করি।

তালাক দেওয়ার ব্যাপারে এত বিলম্বের ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হতে পারে এই সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়ে যাবে যা এর আগে চিন্তা করাই যেত না। এছাড়া নারী সবসময় দুটি অবস্থায় থাকে। একটি পাক (পবিত্র) অবস্থায় আর অন্যটি হায়েজের অবস্থায়। এখন স্বামী যদি হায়েজের অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তার তালাক হারাম হবে। এজন্যে স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্যে পুরো দুটি হায়েজ ও একটি পাকী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর এতেকরে প্রায় একমাস সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার অস্বাভাবিক কিছু নয় যাতে তার অভিমত পাল্টে যেতে পারে এবং সে তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। এ কারণেই কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের শেষাংশে আশাব্যঞ্জক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে– যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং এজন্যে এক মাসের অপেক্ষায় থাকে যেন স্ত্রীর পাকী এসে যায়– এমতাবস্থায় সে যদি জানতে পায় যে, যে স্ত্রীকে সে তালাক দিচ্ছে সে গর্ভবতী হয়ে গেছে এবং তারই সন্তানের মা হতে যাচ্ছে– তখন তাকে তালাক দেওয়া থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে এটিও একটি প্রভাবশালী কারণ প্রমাণিত হয়।

সুন্নতী তালাক ও বিদাতী তালাক

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন– "ফকীহরা উল্লিখিত কুরআনী আয়াত ও হাদিস থেকে তালাকের আইন-কানুন প্রণয়ন করেছেন আর এখেকেই তাঁরা তালাককে সুন্নাত ও বিদয়াতে বিভক্ত করেছেন। অতএব, তালাকে সুন্নাত বলা হবে ওই তালাককে যা পবিত্র অবস্থায় (সহবাসের আগে) অথবা গর্ভাবস্থায় দেওয়া হয় যখন গর্ভের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তালাকে বিদয়াত হচ্ছে সেই তালাক যা হায়েজের অবস্থায় দেয়া হয় অথবা পাকীর অবস্থায় সহবাসের পরে দেওয়া হয়, এবং এটা জানা যায়নি যে, স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে বা গর্ভহীন আছে।

ইসলামে তালাকের এই প্রকারভেদ সম্পর্কে অনেক লোকই জ্ঞানী নয়। এজন্যে অনেকেই সুন্নাত ও বিদাতের পরওয়া না করেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। তারা হারাম-হালালেরও কোনো বাদ-বিচার করে না। তালাক কখন দেওয়া যায় আর কখন যায় না এটা জানে না বলেই তারা ভুলের পর ভুল করেই যায়। মুসলমানদের জন্যে এই অজ্ঞতা বড়ই লজ্জার কথা। আজকাল অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা, এমনকি দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট শিক্ষা সম্পর্কেও অনবহিত। ইসলামী শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে মুসলিম নর-নারীর এই অজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রতিটি মুসলমানকে ইসলামের এসব শিক্ষা সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা খুবই জরুরি। কারণ আল্লাহ নিজেই তাদেরকে তালাক সম্পর্কিত আয়াতেই সাবধান করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন না করে, আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করে। আল্লাহ বলেছেন–

"এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তারা স্বয়ং নিজেদের ওপর অত্যাচার করবে। তোমরা জান না, হতে পারে, আল্লাহ তাআলা এর পরে কোনো নতুন পন্থা সৃষ্টি করে দেবেন।"

একপক্ষ মনে করেন তালাকে বিদাত হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা তালাক হিসাবে কার্যকরী হয়ে যায়। তাঁদের মতে তালাকদাতা হারাম কর্ম করেছে সত্য; কিন্তু তাতে তালাক কার্যকরী হয়ে যায়। তা শুধু আল্লাহরই এক্তিয়ারে রয়েছে।

অন্যপক্ষ বলেন, এভাবে তালাক কার্য্যকরী হয় না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত হাদিস। এই হাদিসে স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন ওমরের বর্ণনা মোতাবেক আল্লাহর রাসূল তা নাকচ করে দেন এবং তাকে অকার্যকরী ঘোষণা করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন, "তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এক অর্থহীন ব্যাপার বলে অভিহিত করেন।"

আল্লামা ইবনে আব্দুল বারি বলেন– "এর বিরোধীতা বিদাতী এবং হীন লোকেরা ছাড়া আর কেউ করেনি।"

শওকানী তাঁর 'নায়নুল আওতারে' তালাক বিরোধীদের বর্ণনাকে তালাক সমর্থকদের বর্ণনা থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং 'সামআনী' ও তাঁর 'সুবিলুস সালাম' এ শওকানীর কথা সমর্থন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে 'তালাকে বিদয়াত'-কে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এই কর্ম আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়াই করা হয়। এজন্যে এ ধরনের কর্ম বাতিল হবে যার ওপর কোনো রকমের শরীয়তী আইন প্রবর্তিত করা যাবে না। এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে প্রিয়নবীর এই বাণী–

"যে কাজ সম্পর্কে শরীয়তের কোনো নির্দেশ নাই তা পরিত্যক্ত।" এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে "এটা বিদয়াত এবং প্রত্যেক বিদয়াতই বিভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তির ওপর কোনো শরীয়তী আইন প্রবর্তিত করা যায় না। এজন্যে এই তালাক কার্যকরী হবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে।

যাহোক, এসব মতভেদের কথা বাদ দিলেও, আমরা যখন তালাক সম্পর্কিত সর্বসম্মত আইন ও নীতির ওপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে একথা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ইসলামী সমাজে ব্যক্তির দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির ব্যবস্থাবলি যেভাবে করা হয় অন্য কোথাও তার চিন্তাও করা যেতে পারে না। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন এই সহজ-সরল ও সত্যপথে আমাদের পরিচালিত করেন।

তালাকের শিষ্টাচার

প্রশ্ন ওঠে, যদি স্বামীর শেষ আপস চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তার জন্যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে– তাহলে তার পন্থা ও উপায় কি? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর এই বাণীকে বুনিয়াদ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে–

"তালাক দু'বার। এরপর হয়তো সহজভাবে নারীকে রেখে দেওয়া হবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দেওয়া হবে।"[১৫৩]

উপরে বর্ণিত আয়াতের অর্থ মোতাবেক শরীয়তী তালাক তখনি স্বীকার করা হবে যখন তা কিছু সময়ের ব্যবধানে দেওয়া হবে। আয়াতের শাব্দিক অর্থেও

---

[১৫৩] সূরা বাকারা : ২২৯।

তাই বুঝা যাচ্ছে। এজন্যে আয়াতের ইঙ্গিত এ কথার দিকে রয়েছে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক পুনর্বহালের অধিকার শুধু দু'বার পাওয়া যাবে– এই শর্তে যে, তালাক কিছুদিন পরপর দেবে। কোনো কোনো উলামা এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, ইমরান বিন হোসাইন, আবু মুশা আশয়ারী, আবু দারদা এবং হুজাইফা বিন আল ইয়ামান (রা) প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ জন্যে একইবারে তিন তালাককে শুধু এক তালাক বলে মানা হয়েছে। রাসূলের আমল, হযরত আবু বকরের খিলাফতকাল এবং হযরত ওমরের খিলাফতকালীন দু'বছর পর্যন্ত এই বিধান ও নীতিই প্রচলিত ছিল। (কিন্তু পরে এই সুযোগের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের কারণে হযরত ওমর কিছুটা কড়াকড়ি করার প্রয়োজন বোধ করেন।) এ সম্পর্কে হযরত ওমর নিজেই বলেছেন–

"লোকেরা এমন এক ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে থাকে যাতে তাদের জন্য নম্রতা রাখা হয়েছিল, এজন্যে আমাদের মতে তা প্রবর্তন করে দেওয়া উচিত, অতএব তা প্রবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।"

অর্থাৎ এই যে, যখন হযরত ওমরের আমলে এই পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে, লোকেরা শরীয়তের নম্রনীতি থেকে অবৈধ উপকার অর্জন করতে শুরু করে এবং নবীর সুন্নাতের প্রতি উপেক্ষা করে বারংবার তালাক দিতে থাকে; কিন্তু রাসূলের ভক্ত প্রেমিক ওমর রাসূলেরই সুন্নাতের প্রকাশ্য বিদ্রূপ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একই সাথে দেওয়া তিনটি তালাকই কার্যকরী হবে বলে আদেশ জারি করেন যাতে রাসূলের সুন্নাতের বাহানায় সুযোগের অপব্যবহার করতে না পারে। এভাবে একই সাথে একই বারে দেওয়া তিনটি তালাককেই কার্যকরী হওয়ার কথা ঘোষণা করে তিনি তালাক নিয়ে ক্রীড়ারত লোকদের সতর্ক করে দেন যাতেকরে তালাকের অনুপাত হ্রাস পেতে পারে।

ইমাম নাসাঈ মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রা)-এর মাধ্যমে, একই বারে তিনটি তালাকের অবৈধতা সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন– প্রিয়নবীকে এমন এক লোকের ব্যাপারে জানানো হয় যে, একই সাথে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। এই ঘটনা শুনে প্রিয়নবী রাগে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন–

আল্লাহর কিতাবের সাথে কি এ ধরনের ঠাট্টা করা হবে? অথচ, আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।"

প্রিয়নবীর একথা শুনে দুই ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো–

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে কতল করে দেবো না?"

হযরত ওমরের জারিকৃত আদেশ সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে স্বয়ং তাঁর বর্ণনা মোতাবেক, এর মাধ্যমে লোকদের তালাকের প্রবণতা থেকে বিরত

রাখাটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা দেখা যায় যে, হযরত ওমরের এই নীতিও লোকদেরকে পুরোপুরি সংশোধন করতে পারেনি এবং তারা বরাবর একই ভুল করে যাচ্ছিল। এজন্যে এখন আমাদেরকে কেবল রাসূলের সুন্নাতের ওপরই অবিচল থাকা উচিত। কারণ এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ একই সাথে দেওয়া তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করতে হবে।

কোনো কোনো ইসলাম বিশেষজ্ঞের এই অভিমতও রয়েছে যে, একই সাথে তৃতীয় তালাকটি আদপেই কার্যকরী হয় না। বস্তুত এটা এক তালাকও হয় না, আবার তিন তালাকও হয় না, কারণ এটা হচ্ছে তালাকে বিদয়াত এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে আরো যথাযথ যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে।

যাহোক, এই বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা দেখানো যে, তালাকের মতো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। খোদা না করুন, কেউ যদি এই অবস্থার শিকারে পরিণত হয় তাকে অত্যন্ত ধৈর্য ও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিতে হবে যেন এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়। বলাবাহুল্য, ইসলাম মানবজীবনের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করে।

আচ্ছা, এবার এ ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে কি তখনিই তাদের মধ্যেকার সব সম্পর্কের অবসান ঘটে? পর মুহূর্তেই কি তারা পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে যাবে? এসব প্রশ্নেরই বিস্তারিত জবাব সামনের আলোচনায় তুলে ধরছি।

ইদ্দত

ইসলামী আইনশাস্ত্রে তালাকের পর একটি নির্ধারিত বিরতি-অপেক্ষাকে ইদ্দত বলা হয়। তালাক পাওয়ার পর স্ত্রী এই ইদ্দত পালন করে, এটা একটা শরীয়তী আদেশ। এই আদেশের অধীনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইদ্দত পালনকালে নিজের সাবেক দাম্পত্য অধিকার ও দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক সীমারেখা থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন জীবন শুরু করে। তখন তার ওপর স্বামীর প্রাধান্যেরও অবসান ঘটে এবং সে নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

ইদ্দতের বিধি-বিধানকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি :

১. সহবাসের আগেই যে তালাক দেওয়া হয় তার আদৌ কোনো 'ইদ্দত' নেই। এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত–

"হে ঈমানদারেরা! যখন তোমরা মোমীন নারীর সাথে বিয়ে কর এবং এরপর তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে থাক তাহলে তাদের পক্ষ থেকে ওদের ওপর কোনো ইদ্দত দরকারী নয়– যার পূর্ণতার দাবি তোমরা করতে পার। অতএব, তাদেরকে কিছু সম্পদ দাও এবং ভদ্রভাবে বিদায় কর।"[১৫৪]

২. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীটি যদি এমন বৃদ্ধ হয় যে, তার হায়েজ (মাসিক ঋতু) আসাটাই বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা এত অল্পবয়স্ক যে তার হায়েজ (মাসিক ঋতু) শুরুই হয়নি– তাহলে এমন নারীদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত–

"এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা হায়েয সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয়ে থাকে, (তাহলে তোমরা জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর একই আদেশ ওদের জন্যেও যাদের এখনো হায়েয আসেইনি।"

৩. হায়েয বা ঋতুবতী নারীদের ইদ্দত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন তিন হায়েয আর কেউ বলেন তিন পাকী। তাঁদের মতপার্থক্যের বুনিয়াদ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি–

"যেসব নারীকে তালাক দেওয়া হয়েছে তারা তিন 'কুরু' অপেক্ষা করবে।" 'কুরু' শব্দটি আরবিতে একইভাবে হায়েয এবং পাকী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের এই ঐক্যই হচ্ছে তাঁদের মতপার্থক্যের বুনিয়াদ।

৪. গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর তার যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত–

"এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের সীমা হচ্ছে (এই যে) তাদের গর্ভ খালাস হওয়া।"[১৫৫]

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইদ্দতের সময়ও নেহায়েত কম অপেক্ষা নয় বরং এটা এতো দীর্ঘ যে, তা একটি ভুলের সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট। এর দীর্ঘসূত্রতার অন্যতম উদ্দেশ্য আসলে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আরেকটি সুযোগ সরবরাহ করা।

---

[১৫৪] সূরা আহযাব : ৪৯।
[১৫৫] তালাক–৪।

ইদ্দতকালীন কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা

ইদ্দতকালীন সময়ে নারীর মান তার স্বামীর জন্যে একেবারে অচিনের মতোও হবে না আবার স্ত্রীসুলভও হবে না, বলা যায় ঠিক মধ্যম অবস্থায় থাকে। এই মধ্যম অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ শরীয়তের নিম্নবর্ণিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. তালাকের পরও নারীর মান অন্যান্য সব ব্যাপারে স্ত্রীর মতোই থাকে এবং ইদ্দতকালে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কোনো অধিকারই স্বামীর নেই। এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত ...

"হে নবী! যখন তোমরা নিজেদের নারীদের তালাক দাও তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দিও এবং ইদ্দতের সময় ঠিক ঠিক গণনা করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। তিনি তোমাদের প্রতিপালক। (ইদ্দতের সময়) তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করবে না এবং তারা নিজেরা বেরুবে না।"

এতে সন্দেহ নেই যে, এক ঘরে উভয়ের একসাথে বসবাস করানো এবং এত নিকটে রাখাটা উদ্দেশ্যহীন নয়, আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়ের মধ্যে সমঝোতার উত্তম সুযোগ সরবরাহ করা।

২. তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্যে ইদ্দতের সময় স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। অবশ্য খুব জরুরি কাজে বেরুতে পারে। অন্যথায় উদ্দেশ্যহীন বেরুলে সে গুনাহগার হবে; কিন্তু তাতে তার ইদ্দত বাতিল হবে না।

৩. ইমাম আবু হানীফার অভিমত হচ্ছে ইদ্দতের সময় নারীকে খুব সাজসজ্জা ও রূপচর্চার সাথে থাকা উচিত, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরা উচিত, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত– এবং এভাবে থাকা উচিত যাতে তার স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৪. ইদ্দতের সময় যদি স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে কেউ মারা যায় তাহলে উভয়েই একে অনের উত্তরাধিকারী হবে।

৫. ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নারী বিয়ে করতে পারবে না, ইদ্দতের সময় সে তার কাছেই থাকবে এবং ইদ্দতের সময় স্বামী যখনই ইচ্ছে করবে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারবে, তা স্ত্রী এটা পছন্দ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা আল্লাহ বলেছেন–

"তাদের স্বামী সম্পর্ক পুনর্বহালের ব্যাপারে সম্মত হলে তারা এই ইদ্দতের সময় তাদেরকে আবার নিজেদের স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী রয়েছে।"[১৫৬]

---

[১৫৬] সূরা বাকারা : ২২৮।

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এ ব্যাপারে দুজন সুবিচারককে সাক্ষী বানিয়ে নেবে। আল্লাহ বলছেন–

"এবং নিজেদের মধ্যে থেকে এমন দুজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নাও যারা হবে সুবিচারক।"[১৫৭]

কিন্তু ইদ্দতের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে স্বামী যদি তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায় তাহলে সেই অধিকার আর তার থাকবে না। ইদ্দতের পর নারী তার সাবেক স্বামীর জন্যে একেবারে অপর ও অপরিচিত নারীর মতো হয়ে যাবে এবং উভয়েই পরস্পরের অপর ও অপরিচিত জনের মতো হয়ে যাবে। এরপর নির্দিষ্ট আইন তোমাকে নতুন করে বিয়ে করেই কেবল তারা আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কায়েম করতে পারে এবং এ ব্যাপারে সাবেক স্বামীর প্রস্তাব গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের বিধিব্যবস্থা

ইদ্দতের সময়ে স্বামী যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করে নতুন জীবন শুরু করে এবং এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হলে আবার যদি এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় যার ফলে দ্বিতীয়বার তালাক দিতে হয় তাহলে আবার সেই আইনগুলো নতুন করে পালন করতে হবে যা আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এমনকি দ্বিতীয় তালাকের পরও যদি সে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায় তাহলে সে দ্বিতীয় ইদ্দতকালীন সময়ে তা করতে পারে।

কিন্তু তার জানা উচিত এরপর যদি সে আবার তালাক দেয় তাহলে তার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের আর কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সুযোগ ইতোমধ্যেই ব্যবহার করে নিয়েছে এবং তৃতীয়বার তালাক দেওয়ার সময় তাকে এটা মনে রাখতে হবে যে, এবার তার স্ত্রী জরুরিভাবে পৃথক হয়ে যাবে এবং হালাল করা ছাড়া সে আর তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারবে না। সুতরাং তৃতীয় তালাক দেওয়ার আগে সে হয় স্ত্রীকে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে রাখবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাসের এই বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন– "যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তার দুই তালাক দিয়ে দেয়, তাকে তৃতীয় তালাক দেওয়ার সময় আল্লাহকে ভয় করা উচিত (এবং দুই তালাকের পরই তার উচিত) চাইলে সে ভদ্রভাবে তার স্ত্রীকে রাখবে অথবা চাইলে ভদ্রভাবে পৃথক করে দেবে এবং স্ত্রীর অধিকারের দিকে পুরোপুরি লক্ষ রাখবে।

---

[১৫৭] সূরা তালাক : ২।

পুরুষকে আবার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের সুযোগ দানের পেছনে শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, স্ত্রী-বিচ্ছেদ এবং একাকীত্বের পুরোপুরি অনুভূতি জাগানো। এ সময় এমন বিরক্তি ও মানসিক পীড়া অনুভব করে যে, তা বর্ণনার অতীত। তালাক দেওয়ার আগে সে এই বিরক্তি ও মানসিক পীড়ার কথা পুরোপুরি অনুমান করতে পারেনি। তার এই অজ্ঞতার কারণেই হয়তো আল্লাহ তাকে এই দুঃখ ও মর্মপীড়ার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যেই এই বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। উপদেশ ও অভিজ্ঞতা একেবারেই পূর্ণ হয়ে যায় না বলে তাকে দু'দুবার এই সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সে তার বিষয় বিবেচনায় ভুল না করে এবং তার একাধিক সুযোগ লাভের অধিকারও পূর্ণ হয়।

এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন ব্যক্তি দু'দুবার তালাকের ফলাফল সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে তখন তৃতীয়বার তালাক সে সব কিছু জেনে-বুঝে এবং দেখে-শুনেই দেয়। সে যখন দেখে যে, স্ত্রীর বিচ্ছেদেই তার কল্যাণ তখন সে তালাক দেয়– নয়তো সে ভদ্রভাবে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে তাকে রেখে দেয়। এটা বস্তুত অজ্ঞ ও অবুঝ বান্দাদের প্রতি আল্লার এক বিশেষ মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি, তাদের দাম্পত্য বিভেদ ও সমস্যাবলির ইসলামী সমাধান এবং তালাকের শরীয়তী নীতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তালাকের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা এবং অকার্যকারিতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এসব আলোচনার ফলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং মানব সমস্যাবলির সমাধানে ইসলামের গভীর আন্তরিকতার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতেকরে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব ভিত্তিরও ভারসাম্যপূর্ণতার ছবি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম যে সহজ ও উদারনৈতিক জীবনাদর্শ এবং এতে যে চরমপন্থার কোনো স্থান নেই আমাদের আলোচনা থেকে সেই সত্যতাও ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে আমরা নারী সমস্যা নিয়ে হৈ-চৈকারী এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যবস্থার ষোলোআনায় মেকী উদ্বেগ প্রকাশকারী ভাই-বোনদের বলবো যে, কৃত্রিম মায়াকান্নার অভিনয় না করে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করুন; বুদ্ধি-বিবেকসহকারে ইসলামী সমাধান সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন এবং ইসলাম সম্পর্কে মূর্খতাপূর্ণ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। সত্যিকার অর্থে পড়াশুনা করে থাকলে আপনারাও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, নারী সমস্যা তথা দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যার সবচেয়ে সহজ ও উত্তম সমাধান শুধু ইসলামই পেশ করেছে। এই সত্যতা সম্পর্কে যদি আপনাদের কারো সন্দেহ বা ভিন্নমত থাকে তাহলে বলুন যে, মানবিক মর্যাদা, মানুষের স্বভাব ও সুযোগ-

সুবিধার সামগ্রিক দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ রয়েছে যে এসব সমস্যাবলির স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে?

এখানে আমরা ওসব লোকদেরকে গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনার আমন্ত্রণ জানাবো যারা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুখের এক ঠুনকো ঝটকায় দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটাতে চায়। তাদের বোঝা উচিত যে, শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের জন্যে এক সুখী, সুন্দর ও কল্যাণকর ব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন। এটা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে যে কতো অপরিহার্য ও উপকারী তা খুব ভালো করেই যেন তারা জেনে-বুঝে রাখে।

তালাক ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের দৃষ্টিতে

পেছনের দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা যে কেউ দাবি করে বলতে পারেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত কাজ। এর অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয় যখন এছাড়া অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আর এর অনুমতি দানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তিকে এক জটিল ও অসহ্যকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় এবং দুই চরমপন্থার মাঝখানে স্বস্তি ও মুক্তির পথরেখা এঁকে দেয়। ইসলামের তালাক সংক্রান্ত পুরো ব্যবস্থাটি অধ্যয়নের পর যেকোনো ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, এটাই সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান এবং এটাই একমাত্র বাস্তব উপযোগী জীবনব্যবস্থা।

মনে করুন, ইসলাম যদি তালাকের অনুমতি না দিতো তাহলে বাস্তব জীবনে যে কত কঠিন সমস্যাবলির সৃষ্টি হতো তার অনুমান করাও মুশকিল।

একটি পাগল বা ব্যাধিগ্রস্ত বা দুশ্চরিত্র বা অত্যাচারী ধরনের স্বামী অথবা স্ত্রী যদি একবার পরস্পরের গলায় বেঁধে দেওয়া হতো তাহলে সারাটি জীবন সীমাহীন তিক্ততা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেটে গেলেও পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে বাঁচার কোনো পথ থাকতো কি? এভাবে উভয়ের মধ্যে কোনো একজন যদি বদ্ধপাগল অথবা ভ্রষ্ট অথবা মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়তো অথবা কারো স্বামী যদি নির্মম নিষ্ঠুর অথবা স্ত্রী যদি কুলটা বা বদ-মেজাজি হতো তাহলে তালাকের উপায় না থাকলে তারা উভয়েই সারা জীবন অসহ্য মর্মপীড়ার যাতনায় ধুঁকে ধুঁকে কাটাতে বাধ্য হতো; উভয়ের মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব দারুণভাবে খর্ব হতো। এতেকরে অত্যাচারী স্বামী তার অপছন্দ স্ত্রীর সাথে জঘন্য জুলুম করতো এবং তাকে সবরকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জানোয়ারের মতো বেগার খাটাতে বাধ্য করতো।

এ ধরনের আরো অনিবার্য কারণ রয়েছে যার ভিত্তিতে ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের অনুমতি দিয়েছে। আর পৃথক হওয়ার

দুটি আলাদা নীতি ও ব্যবস্থা দিয়েছে যা নারীর ক্ষেত্রে খোলা আর পুরুষের ক্ষেত্রে তালাক বলে পরিচিত। নিঃসন্দেহে এ দুটি নীতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের মানবিক স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদার স্বভাবসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে।

খ্রিস্টবাদের দিকে তাকালে আমরা দেখি সেখানে ধর্মীয়ভাবে তালাকের কোনো ব্যবস্থা বা অবকাশই রাখা হয়নি। খ্রিস্টবাদী ধারণা মোতাবেক আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে একবার কোনো পুরুষ ও নারী আল্লাহর নাম নিয়ে একসাথে জীবনযাপনের পদক্ষেপ নিলে তারা উভয়ে একই শরীরের মতো হয়ে যায়, এরপর তাদের পরস্পর আলাদা হওয়া মোটেই ঠিক নয়। কারণ যে বন্ধন আল্লাহর নাম নিয়ে বাঁধা হয়েছে তা ছিন্ন করার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই।

কথিত আছে হযরত ঈসা (আ) তাঁর শিষ্যদের এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন–

"পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে এভাবে লেপ্টে যাওয়া উচিত যেন উভয় একদেহে একপ্রাণ হয়ে যায়। তারা দু'জন কখনো একে অন্য থেকে আলাদা হবে না কেননা যাকে আল্লাহ একত্রিত করেছেন তাকে মানুষ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"[১৫৮]

খ্রিস্টবাদে তালাকের অবকাশ শুধু এক অবস্থায় দেওয়া হয়েছে তা হলো যখন তাদের মধ্যে কোনো একজন দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করে (অর্থাৎ ব্যভিচার করে)। এছাড়া তালাক বৈধ হবার আর কোনো উপায় নেই।

বলাবাহুল্য, এ ধরনের বিধিনিষেধ হচ্ছে এক ধরনের চরম পন্থা, যা বাস্তব জীবনে কার্যকর করা অত্যন্ত মুশকিল, এমনকি অসম্ভব বলা যেতে পারে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় এক্ষেত্রে কিছুটা উদারনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেছে এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তালাকের অবকাশ বের করেছে।

খ্রিস্টধর্মে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভিচারের অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়। এভাবে যদি নারী তার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে করে তাহলে বাইবেলের আইন মোতাবেক সেও ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে।

মারকস এর বাইবেলে বলা হচ্ছে– "যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে তাহলে সে যেন তার সাথে ব্যভিচার (যেনা) করেছে। এভাবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সেও ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত হবে।"[১৫৯]

---

[১৫৮] ১৯ : ৬।
[১৫৯] মারকস ১০, ১১, ১২।

কিন্তু ইসলাম ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নারীকে নিজের ইচ্ছামতো যেকোনো পুরুষের সাথে বিয়ে করার স্বাধীনতা দান করে, তা তার প্রথম স্বামীর কাছ থেকে সে তালাক পেয়ে থাকুক বা খোলা অর্জন করে থাকুক। এভাবে পুরুষও দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ–

"স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ নিজের অফুরন্ত অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেককে লালন-পালন করবেন।"[১৬০]

উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, "এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যদি শরীয়তের আইন মোতাবেক তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে সাবেক স্বামীর চেয়েও উত্তম স্বামী এবং স্বামীকে সাবেক স্ত্রীর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন এবং উভয়ে দ্বিতীয় বিয়ের পর নিজেদেরকে উত্তম অবস্থায় পাবে এবং তাদের যাবতীয় সমস্যাকে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দিবেন।"

বস্তুত ইসলামের এই শিক্ষা মানবস্বভাবের সাথে একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুকূল।

অসংখ্যা ধন্যবাদ, সেই মহান দয়াময় আল্লাহকে যিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো সুন্দর ও সহজ জীবনব্যবস্থা দান করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হালালা

উপস্থাপনা : আল্লাহ বলেছেন–

"এরপর যদি (দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) তালাক দিয়ে থাকে তাহলে সেই নারী এরপর ওর জন্যে হালাল হবে না। তবে যদি তার বিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে হয় এবং সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন যদি প্রথম স্বামী এবং এই নারী উভয়ে এই ধারণা করে যে, আল্লাহর সীমায় কায়েম থাকবো তাহলে ওদের জন্যে একে অন্যের দিকে রুজু করাতে কোনো বাধা নেই।"

উপরের আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, যখন এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে নির্ধারিত ইসলামী আইনবিধি মোতাবেক দুই তালাক দিয়ে থাকে তখন সে এভাবে তার অধিকার নাকচ করে দেয়। এখন যদি সে তৃতীয়বার তালাক দেয় তাহলে এই নারী তার জন্যে হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। তবে যদি সে আরেক

---

[১৬০] সূরা নিসা : ১৩।

বিয়ে করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথেও যদি তার বনিবনা না হয় এবং সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন প্রথম স্বামী তার সাথে আবার বিয়ে করতে পারে।

ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এই কঠিন শর্তের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন– "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীকে শাস্তিদান এবং তার আক্কেল দুরস্ত করা। কেননা, কোনো আত্মসম্মানী স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য কোনো ব্যক্তির অঙ্কশায়িনী হতে দেখাটা সহ্য করবে না এবং এজন্যে সে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে হাজারবার ভেবে দেখবে যার কারণে সে চিরদিনের জন্যে তার স্ত্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।"

হালালার শর্তাবলি

ইমাম মুজতাহেদীনদের ধারণা মোতাবেক, তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্যে কেবল তখনি হালাল হতে পারে যখন সে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ করবে– তা হচ্ছে :

১. প্রথম স্বামীর তালাক দেওয়ার পর সে ইদ্দত পালন করবে।

২. এরপর অন্য কোনো ব্যক্তির, সাথে যথার্থ বিয়ে করবে।

৩. এবং তাদের উভয়ের মধ্যে সহবাস (দৈহিক মিলন) হবে।

৪. এরপর সে তাকে তালাক দেবে।

৫. এবং সে আবার ইদ্দত পালন করবে।

এরপর যদি প্রথম স্বামী চায় এবং সে নিজেও সম্মত হয় তাহলে উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারে।

হালালার অর্থ

সাধারণত এমন হয় যে, সাময়িক উত্তেজনার শিকার হয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, এরপর যখন অবস্থা সংগীন হয়ে উঠে, তার পারিবারিক শান্তি -শৃঙ্খলা তছনছ হয়ে যায় এবং স্ত্রীর বিচ্ছেদ তার জন্যে অসহ্য হয়ে উঠে তখন সে শরীয়তের আইনের ফাঁক অনুসন্ধান করতে শুরু করে। সে এর একটি ব্যবস্থা এভাবে করে যে, কারো কাছে গিয়ে এটা ঠিক করে যে, সে তার সাবেক স্ত্রীকে এই শর্তে বিয়ে করবে যে একবার সহবাস করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে, এভাবে সে তার সাবেক স্ত্রীকে নিজের জন্যে হালাল করার পন্থা খোঁজে এবং মনে করে যে, সে শরীয়তের বিধানের অনুসরণ করে অথচ আসল কথা হচ্ছে এভাবে সে শরীয়তের বিধানের সাথে ঠাট্টাই করছে।

এভাবে হালাল অর্থ যেন এই হয়– স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্যে হালাল করানো। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরনের কর্তাকে মুহাল্লাল এবং যার জন্যে এই কর্ম করা হয়েছে তাকে মুহাল্লাল্লাহু বলা হয়।

হালালার বিধি-নিষেধ

উপরে হালালার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ। কারণ এতেকরে কুরআনের বর্ণিত শর্ত ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। আল্লাহ যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তা হবে স্বাভাবিক সার্বজনীন সুন্নাত মোতাবেক বিয়ে। বিয়ের নামে কোনো নাটক অভিনয়ের কথা বলা হয়নি। যারা এই ধরনের উদ্দেশ্যপূর্ণ বিয়ের অভিনয় করে, তার সাথে শরীয়তের নির্দেশিত বিয়ের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নারী ও একটি পুরুষ নতুন আবেগ ও স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়ে নতুন জীবনের শুভসূচনা করে। এখানে উভয় উভয়ের সাথে আস্থা ও বিশ্বাসের শপথ ও প্রতিশ্রুতি দেয়। উভয়ে একে অন্যকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শান্তি ও স্বস্তি দান করে এবং পরস্পরকে আনন্দ-উল্লাসে উজ্জীবিত করে তোলে–

যেমন আল্লাহ বলেছেন–

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া এবং রহমত সৃষ্টি করেছেন।"[১৬১]

এভাবে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশবিস্তার করা। পবিত্র কুরআন এবং বিভিন্ন হাদিসে এর স্পষ্টিকরণ রয়েছে, যেমন এক হাদিসে প্রিয়নবী বলেছেন–

"অধিকতর প্রেমময়ী এবং সন্তান উৎপাদনশীল নারীর সাথে বিয়ে কর যেন আমার উম্মতের বৃদ্ধি ঘটে।"

অন্য একটি হাদিস হচ্ছে–

"বিয়ে কর, বংশবিস্তার কর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাও যেন হাশরের দিন আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য জাতির মোকাবিলায় গর্ব করতে পারি।"

এজন্যে আমরা দেখতে পাই যে, বিয়ের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাতে এতো বেশি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করা হয় যেমন ভরণ-পোষণ-মোহর-বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা ....।

বিয়ের বাস্তবতা কি এবং কিইবা তার উদ্দেশ্য; এ নিয়ে আমরা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ থেকে অবশ্যই বিয়ে ও হালালার মধ্যেকার

---

[১৬১] সূরা রুম : ২১।

পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। একদিকে বিয়ে হচ্ছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্ম, আর অন্যদিকে হালালা হচ্ছে একটি নির্লজ্জ নাটক অভিনয়।

প্রিয়নবী বলেছেন "কর্ম তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল" এবং হালালা সেই কর্ম যাতে কারো উদ্দেশ্যই মোহর আদায় করা বা একসাথে জীবনযাপনের থাকে না। এখানে পাত্র-পাত্রী কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না এবং বৈধ সন্তান উৎপাদনের কোনো উদ্দেশ্যও তাদের থাকে না।

মোটকথা, বাহ্যত হালালাকে বিয়ের মতো একটা রূপ দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে বিয়ের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে এর কোনো সম্পর্কই থাকে না। এ জন্যে হালালাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এক ধরনের প্রকাশ্য তামাশা বলেই গণ্য করা যায়।

হযরত ওসমান (রা) বলেছেন, "বিয়ে এমন এক ব্যাপার যাতে কোনো লুকোচুরি থাকে না।"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে এক ব্যক্তি অন্য এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানালেন যে, সে নিজের তালাক দেওয়া স্ত্রীকে নিজেরই ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয় যেন তার মাধ্যমে হালালা করা যায়। সে জিজ্ঞেস করলো, এভাবে কি মহিলাটি তার প্রথম স্বামীর জন্যে বৈধ হয়ে যাবে? ইবনে ওমর জবাব দিলেন– 'হবে না। কারণ বিয়ে এক ইচ্ছার নাম (আমরা তো রাসূলুল্লাহর আমলে এ ধরনের কাজকে (হালালাকে) যেনা (ব্যভিচার) বলে গণ্য করতাম।'

আর এই ভিত্তিতে হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, "হালালাকারী বা হালালাকারিণীকে যদি আমার আদালতে আনা হয় আমি তাদেরকে রজমের (পাথর বর্ষণ করে মৃত্যুদণ্ড) শাস্তি দেবো।"

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হালালাকারী এবং হালালাকারিণীদের ওপর অভিসম্পাৎ করেছেন। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হালালা বৈধ বিয়ে নয় বরং ব্যভিচার। কেননা আল্লাহর রাসূল বিয়েকারীদের ওপর কখনও অভিসম্পাত করতে পারেন না; বরং বিয়েকে তিনি আশীর্বাদই করেছেন।

প্রিয়নবী হালালাকারীকে 'ভাড়াটে যাঁড়' বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আকবা বিন আমের (রা) বর্ণনা করেছেন–

প্রিয়নবী একবার সাহাবাদের বলেন– "আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে যাঁড় সম্পর্কে বলবো না?" সাহাবারা বললেন– "কেন নয়, হে আল্লাহর রাসূল। প্রিয়নবী বললেন– "সে হচ্ছে 'মুহাল্লাল' (হালালাকারী)। আল্লাহ তাআলা মুহাল্লাল এবং মুহাল্লাল্লাহু উভয়ের ওপর অভিসম্পাৎ করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
নারী– মা ও স্ত্রী হিসেবে

উপস্থাপনা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে নিছক নারী ও পুরুষের সহ-মিলনের নামই নয়; বরং আসলে এটা সেই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং সেই বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার নাম যার বন্ধনে থেকে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক কামনা-বাসনার পূর্ণতা অর্জন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় এই বাস্তব সত্য কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একই কথা মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো নারী শুধু সন্তান উৎপাদন করেই মাতৃত্বের মর্যাদা পেতে পারে না। এটা আসলে সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির নাম যা নারীর অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এরই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে যাচ্ছি। এ সম্পর্কে বুনিয়াদি নীতি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতেই নির্ধারিত হয়েছে–

“এবং তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্যে সম-অস্তিত্ব স্ত্রীদের বানিয়েছে এবং তিনিই ওসব স্ত্রীদের কাছ থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভালো ভালো দ্রব্যাদি তোমাদের খেতে দিয়েছেন।”[১৬২]

আমরা দেখতে পাই যে, পশু-পাখিরাও নর ও মাদী পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে তাদেরও বংশবিস্তার হয়ে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে অবিদিত নই যে, পশু-পাখিদের মধ্যেও মাতৃ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। তাদের মায়েরাও একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত নিজের পেটে গর্ভধারণ করে রাখে, এরপর প্রসবের পরে সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহমমতা পোষণ করে। অত্যন্ত যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করে এবং খাওয়া ও থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে। মানুষ যদি ঠিক এটাই করে থাকে তাহলে জীবজন্তু, পশুপাখি আর মানুষের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকে? উভয়ের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থেকেই থাকে তাহলে তা হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা কেবল মানুষেরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

আমরা ইতঃপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদে বিয়ে শীর্ষক আলোচনায় এদিকে ইঙ্গিত করেছি যে, মানুষ দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাণী হিসেবে তার জৈবিক মান যা তাকে প্রাকৃতিক আইনের আওতাভুক্ত রাখে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার চারিত্রিক মূল্যবোধের বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এই দ্বিতীয়

---

[১৬২] সূরা নহল : ৭২।

ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধানের কোনো ভূমিকা থাকে না। এর পরেও এটা কেবল আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী যে, এই দুটি ক্ষেত্রে তিনি উভয়কে একে অন্যের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। জৈবিক দিক থেকে আল্লাহ মানুষকে নারী ও পুরুষে বিভক্ত করেছেন। উভয়ের সাংগঠনিক উপাদান এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি পেশি-কোষও পরস্পর থেকে বিভিন্ন। একইভাবে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উভয়েই মানবিক গুরুত্ব বরাবর হলেও কার্যকারিতার দিক থেকে উভয়েই ভিন্নধর্মী। বলতে গেলে উভয়েই পরস্পরবিরোধী বা অন্য কথায় পরস্পরের পরিপূরক। ঠিক নেগেটিভ এবং পজেটিভের মতো। বিদ্যুতের জগতে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, যদি নেগেটিভ ও পজেটিভ উভয়েই সমভাবে কাজ না করে, তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু এ পার্থক্য সত্ত্বেও গঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে উভয়ে একই ধাতুর তৈরি। এটাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিরহস্য। তিনি প্রতিটি বস্তুকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি জিনিসই পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

ইতঃপূর্বেকার আলোচনায় আমরা নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন গুণাবলির দিকেও ইঙ্গিত করেছি। যার সারমর্ম হলো পুরুষ শান্তি ও স্বস্তির ব্যবস্থা করে এবং তার মাধ্যমে নারী শান্তি ও স্বস্তি অর্জন করে। এ সম্পর্কে আমরা পবিত্র কুরআনের ভাষ্যও পেশ করেছি। তাতে নারী ও পুরুষের শান্তি ও স্বস্তি অর্জনের ব্যাপারে উভয়ের আধ্যাত্মিক গুরুত্বও স্পষ্ট হয়েছে।

এ পর্যন্ত কার আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষের দুটি দিক আছে। একটি বাহ্যিক আর অন্যটি আভ্যন্তরীণ এবং এই উভয় ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উভয়ের অনেক বড় বড় গঠনতান্ত্রিক ব্যবধান রয়েছে। যেমন নারীর নারীসুলভ বিশেষ গঠন কাঠামো রয়েছে যার কারণে পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য এবং এই পার্থক্যের কারণেই নারী সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে পুরুষ সেসব গুণাবলি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু পুরুষের আলাদা যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নারীর নেই। এতেকরে নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য স্পষ্ট; কিন্তু এই পার্থক্য বা বৈপরীত্য ও স্বতন্ত্র মানবতার বংশবিস্তারের জন্য একান্তই অপরিহার্য। মানব জাতির স্থায়িত্ব নারী পুরুষের এই গঠনগত বৈপরীত্যের ওপরেই নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা প্রতিনিয়তই এই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে পারি। নেগেটিভ ও পজিটিভ তারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু এই পার্থক্যই হচ্ছে তাদের সমমিলনের ভিত্তি। যদি তা না হতো তাহলে বিদ্যুৎ নামের কোনো অস্তি

ত্ব দুনিয়ার বুকে কখনো পরিলক্ষিত হতো না। কুরআনের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'বিবাহবিধি'। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

"এবং প্রতিটি জিনিসকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় বানিয়েছি।"

বস্তুত এই জন্যেই এটা করা হয়েছে যাতে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করে এবং এভাবে তারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় পর্যায়ে মানবজাতির জন্যে অধিকতর কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

বিবাহবিধি

বিবাহবিধির ইতিবাচকতা

মানবসমাজে নারী ও পুরুষের মান তাদের সব সামঞ্জস্যতা সত্ত্বেও ইতি ও নেতিবাচকতায় বিভক্ত। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য হলো উভয়ে নিজের আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হওয়া। এজন্যে এই পার্থক্যটা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; বরং বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জনেরই একটি উপায় এবং উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। এই বিবাহ-বিধির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন–

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই সত্তা থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।"[১৬৩]

এখানে তোমাদের শান্তি বা তৃপ্তির অর্থ আবেগ-প্রবণ অথবা যৌন তৃপ্তি নয়, যেমন কোনো কোনো লোক মনে করে থাকে, আসলে এর অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি। ইমাম রাযী এই শান্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এটা আন্তরিকতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই আধ্যাত্মিক অথবা আন্তরিক শান্তি প্রকাশ্য হয় না বরং অদৃশ্য হয়। এর সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত।

যাহোক, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে শান্তির অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি, যার অন্বেষণ পুরুষ মাত্রই করে থাকে এবং বিয়ের অর্থ আধ্যাত্মিক বিয়ে এবং অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, নারী ও পুরুষ উভয়ে মানুষ হিসেবে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের মধ্যেকার যে পার্থক্য রয়েছে তা মানবতার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

---

[১৬৩] সূরা রুম : ২১।

এতেকরে বিয়ের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এটা যথার্থভাবে জানা যায় যে, বিয়ের অর্থ শুধু দুটি দেহের মিলন নয়; বরং দুটি আত্মার মিলন। আর আত্মার সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের মাধ্যম হিসেবে দৈহিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। মূলত আধ্যাত্মিক মিলনটাই মুখ্য এবং দৈহিক মিলনটা গৌণ।

বিবাহবিধির উপকারিতা

এই পুরো আলোচনায় বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে 'বিবাহবিধির উপকারিতা।' পৃথিবীর যেকোনো কাজকর্ম তা আধ্যাত্মিক হোক বা বস্তুগত– একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্যের অধীনেই করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 'বিবাহবিধির উপকারিতা' সম্পর্কে বলেছেন–

"যেন তোমরা শান্তি অর্জন কর এবং তোমাদের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ যখন দুই দেহের মিলন হয় তখন বংশবিস্তার ঘটে। আর যখন দুই আত্মার মিলন হয় তখন তার ফলশ্রুতিতে শান্তি, ভালোবাসা এবং দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

অতএব আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মানবতার যে বীজ মানব অস্তিত্বেই সুপ্ত থাকে তাতে আত্মসজীবতা অর্জনের এবং সাফল্য লাভের কোনো ক্ষমতা থাকে না তাকে বিবাহবিধিই শক্তি সঞ্চার করে এবং তার ক্রমবৃদ্ধির সুযোগ সরবরাহ করে, এমনকি এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই বীজ একটি বৃক্ষের রূপ ধারণ করে একদিন তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। এরই ফুল-ফলের মিষ্টি সৌরভে মুগ্ধ উদ্বেলিত হয়ে উঠে মানবতার মনমেজাজ।

যদি কোনো দুর্ভাগা মানুষের জীবনে এই ফুল আর ফল দেখা না দিয়ে থাকে, যদি সে তার মিষ্টি ঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি মানবাত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে কোনোদিনই পরিচয় লাভ করতে পারবে না। তার অস্তিত্ব মানবিকতার মহোত্তম উপলব্ধি থেকে আজীবন বঞ্চিত থেকে যাবে। ফলে সে মহাপ্রকৃতির এমন এক নির্জীব ধুলোর মতো পড়ে থাকে যার না আছে কোনো উদ্দেশ্য আর না আছে কোনো মর্যাদা। এভাবে কোনো সমাজ যদি এই মানবিকতার আভ্যন্তরীণ গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞাত ও অপরিচিত হয়ে থাকে, যদি তার মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই সমাজকে আধ্যাত্মিকভাবে নির্জীব ও সারশূন্য সমাজ বলতে হবে। সেই সমাজ উন্নত মানবিক গুণবৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী মৌলিক উপাদান থেকে বঞ্চিত বলেই মনে করতে হবে।

ইমাম রাযীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার প্রেম-প্রীতি ও মানবিকতার অনুভূতি হচ্ছে তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগেরই প্রত্যক্ষ ফলাফল। তাঁর মতে এসব মহৎ ও পবিত্র অনুভূতি যৌন সম্পর্কের ফলশ্রুতি হতেই পারে

না। বস্তুত এটা একটা প্রাকৃতিক বিধি, যা আল্লাহর আদেশে প্রতিটি মানুষের মনে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অনন্য অনবদ্য প্রীতি-ভালোবাসার সৃষ্টি হয় যা অন্য কারো সাথে হয় না। তা সে যতই আপন হোক না কেন। আসলে এটা হচ্ছে আল্লাহরই বিশেষ দান– যা তিনি স্বামী-স্ত্রীকে দান করে থাকেন।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী 'তফসীরে কবীরে' আরও লিখেছেন– "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দয়ামায়া ভালোবাসা ও একের জন্যে অন্যের প্রতি যে ত্যাগ-তিতিক্ষার আবেগ অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় তা অন্য কোনো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের মধ্যেও হয় না।

এসব আবেগ ও অনুভূতি নিছক যৌন সম্পর্কের ফলাফল নয়। কারণ যৌন প্রবণতা তো যৌবন ঢলে পড়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতি বয়সের সাথে সাথে আরও বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা লাভ করে। এটা এই জন্যেই হয় কারণ তা আল্লাহরই দান। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি কেবল যৌন সম্পর্কই হতো তাহলে উভয়ের জীবন চরম তিক্ততা ও বিরক্তিতে ভরে যেত এবং তালাকের মাত্রা অধিকতর হতো। সুতরাং বলতেই হবে যে, ভালোবাসার এই আবেগ আল্লাহর পক্ষ থেকেই দান করা হয়। কেবল ভাবনা-চিন্তাকারী জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন। এই বাস্তবতাকেই আরো স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ বলেছেন–

"নিঃসন্দেহে, চিন্তাভাবনাকারীদের জন্য এতে বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।"[১৬৪]

ইমাম রাযীর উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মতেও স্ত্রীর ভালোবাসার আবেগ-অনভূতি যৌন তৃপ্তির ফলাফল নয়। তিনি পরিষ্কারভাবে এটাকে আল্লাহরই রহমতের বিশেষ অবদান বলে ঘোষণা করেন। এতে বোঝা গেল যে, তাঁর কাছেও দাম্পত্যের অর্থ হলো আধ্যাত্মিক দাম্পত্য। এটা হচ্ছে মহাপ্রকৃতির স্রষ্টারই প্রবর্তিত বিধি যা সরাসরি মানবাত্মার সাথে সম্পৃক্ত। এই স্রষ্টা প্রদত্ত বিধিই আত্মাকে করে সজীব এবং তার মধ্যে প্রেম-প্রীতি-দয়া ও মহানুভবতার সৃষ্টি করে। জড়বাদিতার এই সংসারে এই বিধির যথার্থ নামকরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এটা এমন এক মহান পর্যায়, যেখানে পৌঁছানোর জন্যে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধিকে আরো উদার ও প্রশস্ততর করতে হবে। তাছাড়া এর ব্যাপকতা ও গভীরতার অনুমান করা আমাদের পক্ষে মুশকিল হবে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সীমার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থেকে কেবল যৌনতৃপ্তি ও দৈহিক আনন্দ অর্জন পর্যন্ত

---

[১৬৪] কুরআন।

ই সীমিত থেকে যাবে। এজন্যে আল্লাহ আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে গভীরতর ও ব্যাপকতর করার উপদেশ দিয়েছেন।

সুতরাং এই বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ অবগতি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি এবং আমাদের দাম্পত্য জীবনে সেই সভ্য সচেতনতাকে জাগ্রত করে, সেসব উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতেকরে আমাদের মধ্যে সত্যিকার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার আবেগ সৃষ্টি হয়। আমরা যেন নিছক যৌন সম্ভোগ আর দৈহিক আনন্দের সংকীর্ণ সীমানায় সীমিত না থাকি বরং আমরা যেন একে অন্যের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির পক্ষে বা বিপক্ষে যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যাতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে আমরা পরস্পরের কতটুকু নিকটে আছি এবং আল্লাহ আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমরা তার কতটুকু পালন করছি! শুধু বিয়ে করে অথবা নিজের পারিবারিক অঙ্গনকে হাসি-খুশিতে ভরে দিলেই আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব পালনের কাজ শেষ হয়ে যায় না। স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে এটা জেনে নিতে হবে যে, তাদের প্রীতি-ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের বুনিয়াদ কি? তারা যদি একথা অনুভব করে থাকে যে, এই ভালোবাসার সম্পর্ক মানবিক বাসনা, রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও উন্নত মানবিক মূল্যবোধের পরিণতি– তাহলে তাদের জানা উচিত যে, এটাই সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক যাকে আল্লাহর কুরআনে ভালোবাসা ও দয়ার নাম দেওয়া হয়েছে– এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। কিন্তু এছাড়া সম্পর্কের বুনিয়াদ যদি অন্যকিছু হয় তাহলে জেনে রাখতে হবে যে, এ সম্পর্ক আর এই ভালোবাসা কোনোদিনই কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে না। কেন হবে না– তার কারণ নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব।

মা ও সন্তানসংক্রান্ত বিধি

মা ও সন্তানের মধ্যেকার প্রীতি-স্নেহের সম্পর্ক মানুষের প্রকৃতিগত। বস্তুগত বা বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। এটাও সম্পূর্ণভাবে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সন্তান হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের আধ্যাত্মিক ফসল, এজন্যেই এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার ওপর ভিত্তিশীল। দুনিয়াতে এমন কোনো মানদণ্ড নেই যার মাধ্যমে মা ও সন্তানের মধ্যকার প্রীতি সম্পর্ককে ওজন করা যায়। আমরা কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, এসব এমন এক প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে হচ্ছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তার আসল লক্ষ্য অর্জন করতে

পারে। আর যেহেতু এই সম্পর্কের মূল হচ্ছে হৃদয় তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হৃদয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

– "ওদের কাছে হৃদয় আছে; কিন্তু তারা ভাবনা-চিন্তা করে না।"[১৬৫]

– "তিনিই যিনি মোমেনদের হৃদয়ে স্বস্তি নাযিল করেছেন।"[১৬৬]

– "শীঘ্রই আমি কুফরকারীদের হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি করাবো।"[১৬৭]

– "এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। অতঃপর এটা পাথরের মতো হয়ে যায়।"[১৬৮]

– "এরপর তাদের দেহ ও তাদের হৃদয় কোমল হয়ে আল্লাহর যিকিরের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে।"[১৬৯]

– "ওসব (আগের পরের) পথভ্রষ্টদের হৃদয় একই রকম।"[১৭০]

– "এবং আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ের কথা জানেন এবং তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।"[১৭১]

হৃদয় বলতে সাধারণ অর্থে মানুষের বক্ষতলের হৃদপিণ্ডকেই বোঝানো হয়ে থাকে; কিন্তু পবিত্র কুরআনে হৃদয়ের অর্থ কোনো বিশেষ অঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়নি বরং কুরআনের দৃষ্টিতে তার অর্থ মানবপ্রকৃতির সেই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ সাধারণ প্রাণী থেকে অনেক উপরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়ে থাকে। এরই মাধ্যমে মানুষের মধ্যে খোদাপ্রেম-খোদাভীতি এবং তার সান্নিধ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। এই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক বাস্তবতা যার প্রভাব আমরা অনুভব করতে পারি; কিন্তু তার আসল অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্ণ অবগতি অর্জন করতে পারি না, কারণ এর সম্পর্ক মানুষের আভ্যন্তরীণ আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেমন প্রিয়নবী বলেছেন–

"মানুষের হৃদয় খোদার অঙ্গুলির মাঝখানে রয়েছে।"[১৭২]

আল্লাহর কুরআনেও একই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

"জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝখানে রয়েছেন।"[১৭৩]

---

[১৬৫] সূরা আরাফ : ১৭৯।
[১৬৬] সূরা ফাতাহ : ৪।
[১৬৭] সূরা আনফাল : ১২।
[১৬৮] সূরা বাকারা : ৭৪।
[১৬৯] সূরা যুমার : ২৩।
[১৭০] সূরা বাকারা : ১১৮।
[১৭১] সূরা আহযাব : ৫১।
[১৭২] আহমাদ।

এই হচ্ছে বাস্তবতা আর বিধিবিধান যা মানুষের বিবেকে ক্রিয়াশীল থাকে, আর এই উদাহরণের মাধ্যমেই আমরা বিবাহবিধি এবং মা ও সন্তানসংক্রান্ত বিধি বুঝতে পারি।

এভাবে মাতৃত্ব বলতে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব আর দুধ খাওয়ানোকেই শুধু বোঝাবে না বরং মাতৃত্বের স্থান আরো উপরে, ঠিক আধ্যাত্মিক পর্যায়ের। মা কেবল গর্ভধারণ আর লালন-পালন করেন না; বরং তাঁর সন্তানকে চারিত্রিক গুণাবলিতেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তার সন্তানকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। এই সত্যিকারের মানুষই বিশ্বমানবতার মঙ্গল ও কল্যাণের পথ সুগম করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন–

"এবং তিনি আল্লাহই যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সত্তা থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেসব স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও পৌত্রাদি তোমাদের দান করেন এবং ভালো ভালো খাদ্যদ্রব্য তোমাদের দান করেন।"[১৭৪]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

"তোমাদের প্রতিপালক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা কারো ইবাদত করবে না কিন্তু শুধু তাঁর। মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। যদি তোমাদের কাছে তাদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়জন থাকেন তাহলে তাদের 'উহ' পর্যন্ত বলবে না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলবে না; বরং তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং নম্রতা ও দয়ার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং দোয়া করবে যে, "(হে) প্রভু! এঁদের প্রতি রহমত নাযিল কর, যেভাবে তাঁরা রহমত ও স্নেহের সাথে আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"[১৭৫]

এই পবিত্র আয়াতে খোদাতায়ালা মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাঁদের সেবার যত দিক ও পর্যায় থাকতে পারে তার সব দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি এসবকিছুকেই নিজ এবাদতের দিকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মনীষী ফখরুদ্দিন রাযী বলেন, "মাতা-পিতার আনুগত্য এবং আল্লাহর এবাদতের দিকে এই তীব্র তাগিদের আসল কারণ হচ্ছে মানব সৃষ্টির আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম তাঁকেই সম্মানদান এবং তাঁরই এবাদত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এরপরই মাতাপিতার প্রতি সম্মান দিতে বলেছেন। এতেকরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা বস্তুত আল্লাহর ইবাদতেরই এক পবিত্রতম অঙ্গ।

---

[১৭৩] সূরা আনফাল : ২৪।
[১৭৪] সূরা নাহল : ৭২।
[১৭৫] সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩, ২৪।

যেমন, পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে–

“এবং বাস্তব কথা এই যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্যে নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে ধারণ করেছে এবং দুই বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এজন্য আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।[১৭৬]

উপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এমনকি মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আল্লাহর শোকর আদায়ের সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এভাবে মাতা-পিতার সেবাও ইবাদতের মান পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একটি বিশেষ দিকনির্দেশ এই দিয়েছেন যে, মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে আনুগত্যের খোদায়ী পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতার সেবার দায়িত্ব পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন– “আল্লাহ তাআলা, তাঁর ছাড়া অন্য কারো উপাসনাকে নিষিদ্ধ করেছেন; কিন্তু সেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেবা হচ্ছে উপাসনার পরবর্তী স্থান। এ থেকে দেখা যায় যে, সেবা কেবল বৈধই নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরিও। যেমন মাতা-পিতার সেবা করা ওয়াজিব বা জরুরি।”

মোটকথা, সেবাপরায়ণতা এমন এক গুণ যা সন্তানের মনে মাতা-পিতার আনুগত্যের আবেগ সৃষ্টি করে। এই অনুভূতিতে উদ্বেলিত হয়ে সন্তান মাতা-পিতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এভাবে মাতা-পিতার খেদমতের মাধ্যমেও সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের সেবাপরায়ণতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান সকল মানুষের মনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিধি। সন্তান ও মাতা-পিতার মধ্যেকার এই সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার ওপর ভিত্তিশীল। সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাতা-পিতা সন্তানদের লালন-পালন করেন এবং সেই একই আধ্যাত্মিক অনভূতির তাগিদে সন্তানও পিতা-মাতার সেবা ও সম্মান করে।

এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি আল্লাহই মানুষের মনে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যে আদিকাল থেকেই মাতা-পিতার সেবা ও সম্মান করা সমগ্র মানবতার কাছে অন্যতম স্বাভাবিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সভ্য অসভ্য সব জাতির সব মানুষই এই একটি ব্যাপারে একই অনুভূতি পোষণ করে। এতে জানা যায় যে, এই অনুভূতিটি মানব প্রকৃতিতেই শামিল থাকে।

---

[১৭৬] সূরা লোকমান : ১৪।

এই যে স্বভাবগত অনুভূতিতে সব মানুষই উদ্বেলিত, তার গোড়ায় পানি সেচ করেন কে? .... তিনিই হচ্ছেন মা। মা-ই তাঁর স্বাভাবিক মমতাগুণে বাধ্য হয়ে গর্ভধারণ, প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং তাকে লালন-পালন করে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার জন্যে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেন। অবুঝ অবস্থায় একটি শিশুকে বুদ্ধিমান ও সক্ষম মানুষে পরিণত করার পেছনে একটি মায়ের কত যে সাধনা, ধৈর্য, পরিশ্রম ও সংকল্পের দুস্তর দিগন্ত অতিক্রম করে আসতে হয় তা কেবল মায়েরাই জানেন। আল্লাহই মায়ের অন্তরে এই ধৈর্য, সাধনা, পরিশ্রম ও সংকল্পের মনোভাব জাগিয়ে দেন এবং মায়েদের দুঃখ-কষ্ট আর ধৈর্যসাপেক্ষ দীর্ঘ সংগ্রামের গুরুত্বের স্বীকৃতি এবং মর্যাদাও দেন তিনিই। পবিত্র কুরআনের আয়াতেই এ বাস্তবতাই যথার্থভাবে চিত্রিত হয়েছে। যখন আল্লাহ্ বলেছেন–

“এবং বাস্তব কথা এই যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্যে নিজেই তাগিদ করেছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে ধারণ করেছে এবং দু'বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এজন্যে আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।”[১৭৭]

মা ও সন্তানসংক্রান্ত বিধির উপকারিতা

মা ও সন্তানসংক্রান্ত বিধির উপকারিতার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের মধ্যে আনুগত্য ও সেবাপরায়ণতার গুণ। এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা তার উপকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি যা মানবজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যেকার স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক এবং সেবা ও আনুগত্যের সনাতন ঐতিহ্য অবক্ষয়মান দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা এই অভিশপ্ত পরিণতির কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এখানে আমরা শুধু এই নিয়েই আলোচনা করবো যে, যদি আজকের মানবতা প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ত্যাগ-তিতিক্ষা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সেবা আনুগত্যের বৃহত্তম আবেগ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে মানুষ হিসেবে তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে! এই মানুষরাই যখন অতি সামান্য এক মাংসপিণ্ডের মতো অসহায় ও গুরুত্বহীন ছিল তখন মাতা-পিতা কিভাবে তাদের সাথে দয়া-নম্রতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদের অতি সামান্য দুঃখ-

---

[১৭৭] সূরা লোকমান : ১৪।

কষ্টেও তাঁরা অস্থির বিচলিত হয়ে উঠেছেন এবং নিজেরা শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে হলেও তাদেরকে সঠিকভাবে সুখে ও নিরাপদে রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আজ সেই মাংসপিণ্ডের মতো অক্ষম-অসহায় শিশুরা যখন সক্ষম-সবলতা অর্জন করে বড় হয়েছে তখন পিতা-মাতার সেই মহান অবদানের কথা যেন একদম ভুলে গেছে। তারা আজ পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবার দায়িত্বকে উপেক্ষা করে দারুণ অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। এখন অকৃতজ্ঞ মানুষ আজ মাতা-পিতার খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজনকে পর্যন্ত অস্বীকার করছে। বস্তুত এ ধরনের অকৃতজ্ঞ মানুষকে মানুষ বলাই ভুল। এরা বিবেকহীন হয়ে নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করেছেন।

আমরা দেখতে পাই যে, মাতা-পিতার অবাধ্যতাসহ সবরকমের নোংরামি এবং নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন সত্ত্বেও এমন অনেক জাতি ও দেশ রয়েছে যারা বৈষয়িক দিক থেকে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং যাদের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার বা নিঃস্বার্থ সেবার কোনো আবেগ উদ্দীপনা থাকে না– তারা বাহ্যিক যতই উন্নতি করুক না কেন, মানুষ হিসেবে কি তাদের কোনো গুরুত্ব আছে? নির্জীব জীবন্ত লাশের মতো এসব যান্ত্রিক লোকগুলোর কি আছে কোনো মান-মর্যাদা? যে সমাজে টাকাটাই আসল কথা, সেখানে স্বার্থপরতাই ব্যক্তির মৌলিক গুণ; যেখানে মানুষ অন্য মানুষের অধিকার আর মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, সেখানে সেই সমাজকে যান্ত্রিক বলা যেতে পারে সত্য; কিন্তু মানবসমাজ বলা যেতে পারে না। কারণ সেখানে পবিত্রতা ও মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই। সত্যিকারের কোনো মানুষ এই যান্ত্রিক সমাজে স্বস্তিতে থাকতে পারে না।

আমরা আমাদের যুগ ও সমাজের যতই পর্যালোচনা করি ততই ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ইসলামী শিক্ষার প্রভাব আমাদের সামনে উজ্জ্বল রয়েছে। এই ইসলামের মাধ্যমেই আমরা এই সত্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি যে, মায়ের পদতলেই সন্তানের বেহেশত।

এ থেকে শুধু এটা অনুধাবন করা উচিত হবে না যে, ইসলাম মাতা-পিতার সেবা ও আনুগত্যের উপকারিতা বলতে শুধু তার নৈতিক উপদেশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি পর্যন্তই সীমিত রাখে না; বরং তাকে আল্লাহর ইবাদতেরই একটি অংশ হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের কাজে-কর্মে বাস্তবায়নের আদেশ দেয়।

এতেকরে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মানবজীবনে ইবাদতের সীমা কতো ব্যাপক, এই ইবাদতের সীমায় সব রকমের ন্যায় ও সৎকর্ম শামিল থাকে

যা মানুষ মহৎ উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকে। এতেকরে কর্তা ছাড়া অন্য কারো তেমন কোনো উপকার হয় না; বরং ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের মাধ্যমে কর্তা নিজেই তার সেবা ও মহত্ত্বের মাধ্যমে সমাজে নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে, তার মধ্যে এক নতুন ভদ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, যাবতীয় অর্থহীন ও গুরুত্বহীন তৎপরতা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার সব কাজকর্ম মূল্য ও মর্যাদার দিক থেকে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে; মোটকথা তার পুরো জীবনটা হয়ে ওঠে অনন্য সুন্দর।

বলাবাহুল্য, মাতা-পিতা ও সন্তানসংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভরশীল। এসব বিধি-বিধান প্রাকৃতিক আইন-বিধির তাঁবেদারী করে না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আদেশের সাথে সম্পৃক্ত। কর্মেই তার পরিচয়। এদিকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেন। এর আসল তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। এসব কিছু মানুষের স্বাভাবিক আইন-কানুনের অতীত এবং সার্বজনীন ব্যাপার। মানুষ বস্তুত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে তখনই পূর্ণতা অর্জন করে এবং সত্যিকারের অর্থে মানবজীবন কল্যাণমুখী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে যখন সে এসব বিধি-বিধানের যথার্থ অনুসরণ করে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, যে সমাজে সততার সমাদর বৃদ্ধি পাবে, যেখানে মানুষ পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসবে, পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি প্রকাশ করবে। জনসাধারণের সৎকর্ম ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে এবং তাদের পুরো জীবনের ওপর যখন বাস্তব ও অদৃশ্য জগতের আধ্যাত্মিক আলো ছড়িয়ে থাকে– তখন এ ধরনের সমাজ স্বাভাবিকভাবে সব রকমের নোংরামি ও বেলেল্লাপনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এক একটি সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে, সমাজের প্রতিটি লোক নিরাপদ, সন্তুষ্ট ও সুখী জীবনের আমেজ-অনুভূতি নিয়ে বাঁচবে। আর এটাই সত্যিকারের আদর্শ সমাজ বলে গণ্য হবে।

বিবাহবিধি ও সন্তানসংক্রান্ত বিধি বাস্তবায়নের শর্ত

পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ করে থাকবেন যে, আমরা বিবাহবিধি এবং সন্তান সংক্রান্ত বিধির এই দীর্ঘ আলোচনার কোথাও কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাইনি। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমান যুগে এসব বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন ও তার উপকারিতার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না কেন? আমরা যে চিত্র তুলে ধরেছি বাস্তবে তার কোনো ছাপ দেখা যায় না কেন? আমাদের কথা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণ কি? এসব প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। অথচ এটাও ঠিক যে, এসব বিধি-বিধান থেকে উপকার অর্জনের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কোথাও উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ দেখা যায় না। বলুনতো, বীজ বপন না করে কি গাছ এবং তার ফলের আশা করা যায়?

উল্লেখ যে, আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান ও তার ফলাফল দেখানোর জন্যে কিছু শর্ত-শরীয়তের দাবি রাখে। যেভাবে স্বাভাবিক বিধি-বিধান ও নিজ কার্যকারিতার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রয়োজন বোধ করে। আমরা আগে যেমন বলেছি এই উভয় ধরনের বিধি-বিধান ও আধ্যাত্মিকতার গোত্রভুক্ত। এজন্যে এসবের প্রভাব ও ফলাফল এবং উপকারিতা কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ও শর্তের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

নিচে আমরা এ ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করবো :

১. প্রথম শর্ত এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন শরীয়তের শর্ত ও নীতি মোতাবেক হবে। এরই মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতার সৃষ্টি হতে পারে। এটা অত্যন্ত মহৎ চিন্তা যা বিবাহবিধি এবং সন্তানসংক্রান্ত বিধিকে বলিষ্ঠতর করে এবং তাতে কোনো রকমে কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেয় না। কেননা, এই উভয় বিধি-বিধানের উন্নতির আসল হেতু ব্যক্তির যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহত্ত্বের অনুভূতি এবং এই মহত্ত্বের অনভূতি যেনা বা ব্যভিচার থেকে কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা, যেকোনো ধরনের যৌন নোংরামি মানুষের বিবেকে নিরাপত্তাবোধ এবং আত্মমর্যাদার কোনো অনভূতি সৃষ্টি করে না। সুতরাং যদি কোনো সমাজে যৌন নোংরামির প্রচলন শুরু হয়ে থাকে, এবং সেখানকার জনগণ যদি নোংরামিকে কোনো রকমের আপত্তিকর কিছু মনে না করে তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, তাদের বিবেক সেই নোংরামিকে সমর্থন করছে অথবা তাকে কোনো রকমের মানবিক মূল্যবোধ বলে গণ্য করছে; বরং এ ধরনের যৌন নোংরামিকে যেকোনো সমাজের লোকই অত্যন্ত ঘৃণা এবং নিকৃষ্ট পর্যায়ের অপরাধ বলে মনে করে। বিবাহবিধির বাস্তবায়নে এবং তার সম্প্রসারণে বিঘ্নতায় এ ধরনের পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এতেকরে মানুষের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যেই আমরা দেখতে পাই ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারকারিণী অর্থাৎ অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মধ্যে কখনো প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-সহানুভূতি-দয়া-ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি মহৎ আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি হয় না, যেমনটা বৈধ উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকারী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, যেসব বিষয়াবলি বিবাহবিধির পরিপন্থি তা সন্তান-সংক্রান্ত বিধিরও পরিপন্থি। সুতাং যে সন্তান অবৈধ যৌন সম্পর্ক বা ব্যভিচারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সেই অবৈধ সন্তানের জন্যে তার মায়ের মনে যথার্থ স্নেহ-মমত্বের অনুভূতি কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তার মন নিরাপত্তা ও পবিত্রতার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল। ঠিক একইভাবে অবৈধ সন্তানের মনেও ব্যভিচারিণী মায়ের জন্য সেই গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার মনোভাব জাগতে পারে

না। অপরদিকে একটি বৈধ সন্তান যেমন তার মাতা-পিতার পূর্ণ স্নেহ-ভালোবাসা পায় তেমনি সেও যথার্থভাবে তার মাতা-পিতাকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

অবৈধ মা এবং অবৈধ সন্তানের মধ্যেও যে এক ধরনের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমরা অস্বীকার করবো না; কিন্তু সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো রকমের পবিত্র ভাব বা শ্রদ্ধার অনুভূতি থাকতে পারে না, সে ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহর আনুগত্য ও শরীয়তের সীমায় থেকে যে পবিত্রতা, স্নেহ, ভালোবাসা ও সম্মানবোধ অর্জিত হতে পারে তা অন্য কোনো ভাবে অর্জন করা যায় না। মাতৃত্বের পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধের ওপরই সন্তান ও সমাজের পবিত্রতা ও মর্যাদা নির্ভরশীল। সুতরাং যে সমাজে মায়ের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পবিত্রতা নিশ্চিত নয়, সে সমাজে কোনো রকমের মহৎ মানবিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব টিকে থাকা মুশকিল।

শতত স্মরণযোগ্য যে, মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর পাঠানো জীবনধারণের বিধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হচ্ছে বিবাহবিধি ও সন্তান সংক্রান্ত বিধির ভিত্তি। সুতরাং যে ব্যক্তির মন-প্রাণ আল্লাহর ভালোবাসা ও তার আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত, তার পক্ষে নিজ সন্তানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলি সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইমরানের স্ত্রীর আদর্শকে একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক এমনই গভীর ও অকৃত্রিম ছিল যে, তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকেও আল্লাহর সেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁর সেই গভীর আন্তরিকতার পবিত্রতম ফলশ্রুতি ছিল তার সেই কন্যাসন্তান যিনি পরিণত বয়সে পৌঁছে পুরো বিশ্বমানবতাকে সততা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। পবিত্র কুরআনে ইমরানের স্ত্রীর প্রার্থনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

"আমার প্রভু! আমি এই শিশুকে– যা আমার গর্ভস্থ রয়েছে তা তোমাকে উৎসর্গ করছি, যে তোমারই কাজের জন্যে উৎসর্গীকৃত থাকবে। আমার এই প্রস্তাবকে কবুল কর। তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।"[১৭৮]

এভাবে তিনি নিজেই নিজের অধিকার ত্যাগ করেন এবং আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেন এবং আল্লাহও তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে দুনিয়ার আদর্শ সন্তানের মর্যাদা দান করেন। নিঃসন্দেহে এটা মাতৃত্বের এক অনন্য সুন্দর উদাহরণ। এই আদর্শ সন্তান ছিলেন হযরত মরিয়ম (আ)। তাঁর সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

[১৭৮] সূরা আলে ইমরান : ৩৫।

"অবশেষে তার প্রতিপালক সেই মেয়েটিকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করেন এবং তাকে অত্যন্ত সতী মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলেন।"[১৭৯]

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে গোটা দুনিয়াতে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং সেই ছেলে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে যেসব গুণাবলি দান করেন সে ব্যাপারে তিনিই বলেন–

"এবং নিজ মায়ের অধিকার আদায়কারী বানিয়েছেন এবং আমাকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও কঠোর বানাননি।"[১৮০]

তিনি আরো বলেন–

"এবং আমাকে কল্যাণময় করেছেন– যেখানেই আমি থাকি এবং নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন– যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি।"[১৮১]

আমরা জানি হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর দেওয়া গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হয়ে ইহুদি, জড়বাদী এবং অন্যান্য বাতিল-শক্তির শিবিরে কি প্রচণ্ড প্রকম্পন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি দুনিয়ার মানুষের সামনে যে নৈতিক শিক্ষা দান করেছেন তা চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মতে এ বিষয়ের স্পষ্টিকরণের জন্যে এই উদাহরণটিই যথেষ্ট ছিল। এরপর অন্যকোনো উদাহরণ পেশ করার আদৌ দরকার নেই।

২. বিবাহবিধির কার্যকরী উপকার অর্জনের দ্বিতীয় শর্ত হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মজবুত সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছাড়া যথার্থ দাম্পত্য জীবনের কল্পনা করা যায় না। মানসিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস এবং মহত্ত্ব ও উদারতা দাম্পত্য সম্পর্কের অনিবার্য দাবি। তারা যে একজন অন্যজনের জন্যে অপরিহার্য এই অনুভূতিও তাদের থাকতে হবে।

আর সেই অনুভূতি অনেকটা এ রকমের হবে যে, স্বামী স্ত্রীকে শান্তি ও স্বস্তির উৎস মনে করবে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে প্রেমিক ও দায়িত্বশীল মনে করবে। স্বামী মনে করবে যে, স্বস্তি ও শান্তির জন্যে স্ত্রী হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, আর স্ত্রী এটা মনে রাখবে যে, তার নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সহায়তার জন্যে পুরুষের প্রাধান্য খুবই জরুরি। উভয়ে উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক মনে করবে। স্ত্রী কখনো স্বামীর প্রয়োজন থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। সার্বিকভাবেই তার স্বামীর সহায়তা দরকার। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে নারী এক দুর্বল অস্তিত্ব। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও পালন এবং মাসিক ঋতু প্রভৃতি তার সামনে এক

---

[১৭৯] সূরা আলে ইমরান : ৩৭।
[১৮০] সূরা মরিয়ম : ৩২।
[১৮১] সূরা মরিয়ম : ৩১।

চিরন্তন ও স্বাভাবিক বিড়ম্বনা। এজন্যে সবসময় তার একজন মজবুত অবলম্বনের দরকার। নারীর এই দাবি ও চাহিদা কেবল তার স্বামীর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে। এজন্যে সে পুরুষের পক্ষ থেকে কোনো রকমের নির্লিপ্ততা বা অবহেলাকে কখনো সহ্য করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের এই বুনিয়াদ যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাদের পারস্পরিক অবস্থা ও প্রতিশ্রুতি যদি ভঙ্গ হয়ে যায়, যদি তাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও পবিত্র মহানুভবতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়– তাহলে বুঝতে হবে যে, দাম্পত্যের মূল উদ্দেশ্যই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এরপর গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু যৌন সম্ভোগ আর বৈষয়িক স্বার্থের সংকীর্ণতায় সীমিত হয়ে পড়ে। এভাবে তারা মৌলিক মানবিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এরপর তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, দয়া, ভালোবাসা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কোনো মহৎ গুণই অবশিষ্ট থাকে না।

এ ধরনের সম্পর্ককে অবশ্য আমরা ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্তও করতে পারি না। কারণ ব্যভিচারীদের মধ্যে কোনো রকমের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকে না। অপরদিকে স্বামী ও স্ত্রী দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে কিন্তু ইসলামের নির্ধারিত নীতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক অনেকটা বিড়ম্বিত হয়ে পড়ে।

বিষয়টিকে উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বলা যেতে পারে– যেমন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আয় উপার্জন করে এবং দিনভর পরিশ্রম করে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে, তাদের চেষ্টা-সাধনা আর সংগ্রাম শুধু বেশি থেকে বেশি টাকা আয় করে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন পর্যন্ত সীমিত থাকে। ঝকঝকে চকচকে মোটরগাড়ি, প্রাচুর্যময় ঘরবাড়ি আর দামি পোশাক-পরিচ্ছদ ও দামি বিলসিতার সামগ্রী অর্জনই হয় তাদের এতো সব ব্যস্ত-তৎপরতাময় জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনবোধে তারা জীবনের বাজি লাগাতেও প্রস্তুত। বলাবাহুল্য, এ ধরনের মানসিকতায় আক্রান্ত স্বামী-স্ত্রীর ঘরে প্রকৃত সুখ-শান্তি, প্রেম-প্রীতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য। তাদের জীবন স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে এবং তারা এক নির্জীব নিস্পৃহতার শিকারে পরিণত হয়। যেহেতু স্ত্রী স্বামীর মতোই আয়-উপার্জন করে সেহেতু স্বামীর প্রতি তার মনে বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা বা গুরুত্বের ইমেজ অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীও নিজেকে স্ত্রীর সামনে বড় অর্থহীন জীব মনে করে। এভাবে তাদের পারিবারিক জীবনে যে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয় তাতেকরে দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের মূল বুনিয়াদটাই ধসে পড়ে যা তারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আজকের আধুনিক সমাজে দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কের যে দারুন অধঃপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ মূলত এটাই।

বস্তুত পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে স্ত্রী অর্থাৎ মহিলাদের ওপর। স্ত্রী বা মহিলারাই হচ্ছে পারিবারিক সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এখন যদি সেই স্ত্রী বা মহিলারাই তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমা ডিঙিয়ে কল-কারখানায় বা অন্যান্য পুরুষালী কাজের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে হেস্ত-নেস্ত হতে থাকে তাহলে সারাদিনের অস্বাভাবিক খাটুনির পর তারা ঘরে ফিরে আর কি দায়িত্ব পালন করবে?

পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে নারীর ওপরে পুরুষের দায়িত্বশীলতা। এখন যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমানভাবে আর্থিক আয় উপার্জন করে অর্থাৎ স্ত্রীও স্বামীর মতো মেহনত-মজদুরী করে আয়ের মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করে তাহলে উপার্জনকারী হিসেবে স্বামীর যে গুরুত্ব ছিল তা বহাল থাকবে কোন যুক্তিতে?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এখানে আমরা মহিলাদের চাকরি করার বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন নিয়ে কোনো আলোচনা করছি না। আমরা এখানে কেবল অবস্থা পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাই তুলে ধরছি যা বিবাহবিধির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হতে পারে এবং সেসব কারণও তুলে ধরছি যার পরিণতিতে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। রইলো নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্যের কথা। তা সে সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোচনা করার অবকাশই কোথায়?

এই যে আজকের এসব জটিল সমস্যাবলি, এর জন্যে কেবল নারীকেই দায়ী করা চলে না; বরং পুরুষরা নারীদের চেয়ে বেশি অপরাধী। পুরুষ তার স্ত্রীর অর্থ উপার্জনের তৎপরতাকে শুধু যে শীতল মনে সহ্য করে তা নয়; বরং স্ত্রীর উপার্জনে আর্থিক উন্নতি ঘটছে বলে আত্মতুষ্টিও অনুভব করে; কিন্তু মামুলি কয়েকটা টাকার জন্যে তার দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি ধসে পড়েছে সেদিকে সে দেখেও না দেখার ভান করে এবং বুঝেও না বুঝার ভান করে। আজ পুরুষ যে নারীর শান্তি ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে সেজন্যে পুরুষের বৈষয়িক লালসাই প্রধানত দায়ী। আর এমন লোভী ও স্বার্থপর কাপুরুষরা নারীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে যে অসমর্থ ও অযোগ্য তাতে সন্দেহ কি? সেই কারণেই আজ দাম্পত্য সম্পর্ক পারিবারিক জীবনে অভিশপ্ত পরিণতি ডেকে এনেছে। যে জীবন মহৎ মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত এবং শুধু অর্থ ও স্বার্থের গোলামে পরিণত হয়ে রয়েছে তাদের ভাগ্যে এই পরিণতিই স্বাভাবিক। তারা কোনো দিনই প্রকৃত সুখ-শান্তি-স্বস্তি ও সন্তুষ্টি পেতে পারে না। এরা ধনে-সম্পদে যত উন্নতিই করুক না কেন মানুষের মর্যাদা পাবে না কোনোদিন।

নিঃসন্দেহে এসব কারণেই ইসলামের নির্ধারিত বিবাহবিধির সেসব সুফল অর্জিত হচ্ছে না যা অর্জিত হবারই কথা। ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি এসব অদূরদর্শী তৎপরতার কারণেই আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক এতোটা ঠুনকো ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, একান্ত মামুলি মতবিরোধও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে পড়ে।

এরপর এতেকরে যে মায়ের মমতার ওপর কতো বিরাট প্রতিকূল প্রভাব পড়ে তা সহজেই অনুমান করা চলে, যে মহিলা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে কলে-কারখানায়-অফিসে-আদালতে গলদঘর্ম হয় তার স্বাভাবিক অনুভূতি ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ধরনের মহিলারা নম্রতা-লজ্জাশীলতা ও নারীসুলভ কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তারা তখন নিজেদের আয়-উপার্জনের জন্যে গর্বিতা হয়ে পড়ে এবং আরো অধিক উপার্জনের নেশায় মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব নির্জীব-নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং কোনোরকমে নৈতিক-চারিত্রিক বা ইসলামী শিক্ষা তাদের আর আকর্ষণ করে না। এরপর তাদের মধ্যে সততা ও পবিত্রতার ভাবমূর্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে– সে তো স্বাভাবিক কথা।

স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল যৌন ক্রিয়ার সক্ষমতার নামই বিয়ে নয় এবং কোনো মহিলা সন্তান উৎপাদন আর তার লালন-পালন করেই মাতৃত্বের মহান মর্যাদা পেতে পারে না। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী আদর্শের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যার অধীনে একটি পুরুষ ও একটি নারী পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বন্ধন আসলে একটি নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বন্ধন নয়; বরং এটা হচ্ছে দুটি মানুষের মধ্যেকার মিলনসেতু। এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ এতই মহান ও তাৎপর্যময় যে, নিছক জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে যে সুফল দেখা দেয় তাকে এক কথায় সদয় ভালোবাসা বলা যায়। মা ও সন্তান-সংক্রান্ত ব্যাপারটিও ঠিক একই পর্যায়ের। মায়ের মমতার অর্থ শুধু সন্তান প্রসব আর দুধ খাওয়ানোই নয়; বরং মায়ের মমতা হচ্ছে একটি নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মা তার সন্তানের মধ্যে এমন অনির্বাণ আলোর স্ফূরণ ঘটায় যা গোটা সমাজ তথা বিশ্বমানবতাকে সুপথ দেখায়। ইসলামের শিক্ষা ও উদ্দেশ্যকে এই ব্যাপকপ্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝার চেষ্টা করতে হবে। ইসলাম এভাবেই তার পারিবারিক নীতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজীবনের সর্বত্র এমন এক সর্বাত্মক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা সমাজে প্রচলিত যাবতীয় বৈষয়িক বিড়ম্বনা ও কু-প্রথাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শান্তির বুনিয়াদের ওপর সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর মূল শক্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে তার আধ্যাত্মিক রৌশনি।

উল্লেখিত বাস্তবতার আলোকে এটা আমরা ভালো করেই অনুমান করতে পারি যে, বিবাহসংক্রান্ত এবং মা ও সন্তান সংক্রান্ত ইসলামিক বিধি-বিধানের কার্যকরী সুফল অর্জিত না হওয়ার কারণ কি? বিবাহ ব্যবস্থা থেকে আধ্যাত্মিকতার বিলুপ্তি ঘটলো কেন? এবং মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আনুগত্যের সহানুভূতিই বা বিনষ্ট হলো কেন?

(৩) বিবাহবিধির কার্যকরী সুফল অর্জনের তৃতীয় শর্ত হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তাদের সম্পর্ক বৈষয়িক স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে থাকবে। মোটকথা, বিয়ে-শাদীর উদ্দেশ্য এমন এক আধ্যাত্মিক ফল অর্জন করা যা পার্থিব কোনো উপায়ে লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন বলেছি, নিছক সন্তান উৎপাদনই বিয়ের উদ্দেশ্য নয়; বরং বিয়ে হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নাম যার মাধ্যমে একটি পুরুষ ও একটি নারী পূত-পবিত্র এক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং আল্লাহর ইবাদতের পর এর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি; কেননা, এই বিয়েই মানব সম্পর্কীয় ধারাবাহিকতায় এমন এক সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করে যা মানব অস্তিত্বকে পাক-পবিত্র এবং তার বিবেককে করে সজীব-সুন্দর।

আর এই সম্পর্কের সবচেয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, মানবতাই হচ্ছে মানুষের সম্পদ অর্থাৎ তার আকীদা, বিশ্বাস, তার কর্ম, তার নীতি ও চরিত্র যদি ঠিক হয় তাহলে সব কিছুই ঠিক। এভাবে উভয়ের ভালোবাসা হয় আধ্যাত্মিক ভালোবাসা। যাবতীয় আবিলতা থেকে পবিত্র এই ভালোবাসা তার বিবেক ও আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। এই কারণেই স্বামী ও স্ত্রীর জন্যে প্রথম ও প্রধান জরুরি ব্যাপার এই যে, তারা পরস্পরকে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবে এবং এসব ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এর পরেই তারা উত্তম স্বামী ও স্ত্রী বলে বিবেচিত হবে।

বিবাহবিধি ও সন্তানবিধির সুফল অর্জনের জন্য উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের পালনই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

উপরে আলোচিত গুণাবলির আলোকে যদি দেখা যায়, তাহলে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে সবচেয়ে অনুসরণযোগ্য উদাহরণ পেশ করে। এই সম্পর্ক ছিল যাবতীয় অর্থ ও শর্তের ঊর্ধ্বে এক মহৎ ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যেকার দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর আর তাঁদের ভালোবাসা ছিল গভীরতর। ভালোবাসার এই মহান আবেগ-অনুভূতি ছিল তাঁদের মহৎ চিন্তাধারা এবং উন্নত চরিত্রের উৎকৃষ্ট ফসল। বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য বা বয়সের ব্যবধান তাঁদের অনবদ্য দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র প্রতিকূলতার সৃষ্টিও করতে পারেনি। যাঁরা প্রিয়নবী ও হযরত খাদিজা (রা)-এর

দাম্পত্য জীবনের কথা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা জানেন যে, প্রিয়নবীর রিসালাত অর্জনের আগেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল মজবুত ও স্থিতিশীল এবং প্রিয়নবীর রিসালাত অর্জনের পর এই সম্পর্ক হয় আরো গভীর এবং আরো মধুর। এর অনুমান এই ঘটনা থেকেও করা যেতে পারে, যখন প্রথম ওহী পেয়ে প্রিয়নবী অত্যন্ত আতঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে হযরত খাদিজা (রা)-এর কাছে পৌঁছে বলেন যে–

"হে খাদিজা! আমি নিজের প্রাণের আশঙ্কা করছি।"

এমন অবস্থায় অন্য কোনো স্ত্রী হলে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরের কথা, নিজেই ভয়ে কেঁপে উঠতো; কিন্তু হযরত খাদিজা প্রিয়নবীকে কি বলেন শুনুনতো– "কখনো না; আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না, কেননা আপনি তো দয়ালু ব্যক্তি। দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের আপনি আতিথ্য করেন; যারা ক্লান্ত তাদের বোঝা তুলে নেন, দরিদ্রদের জন্যে আয়-উপার্জন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লোকদের সাহায্য করেন।"

এভাবে আমরা আরো দেখতে পাই যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের কঠিন মুহূর্তগুলোতে যখন প্রিয়নবী কখনো কখনো চিন্তিত বা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন তখন এই হযরত খাদিজা (রা) প্রিয়নবীকে সাহস যোগাতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন। এসব কারণেই, হযরত খাদিজা (রা)-এর ইন্তেকালে প্রিয়নবী এতটা দুঃখিত হন যে, ইতিহাসে সেই বছরটি "দুঃখের বছর" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

প্রিয়নবী ও হযরত খাদিজার মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা ছিল তা ছিল অনন্য ও অনবদ্য। প্রিয়নবী কখনো হযরত খাদিজার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। গভীর আন্তরিকতা ও সীমাহীন ভালোবাসার আবেগসহকারে তিনি হযরত খাদিজাকে স্মরণ করতেন। হযরত খাদিজার প্রতি প্রিয়নবীর এই গভীর ভালোবাসা দেখে তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন, "কি ভাগ্যবতী সেই স্ত্রী যাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর মহান স্বামী তাঁর প্রশংসা করেন।"

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তাতে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে বিবাহবিধি এবং মা ও সন্তানসংক্রান্ত বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় মানবিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক শর্ত ও ব্যবস্থাবলির দিকে ইঙ্গিত করেছি– যা এসব ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে এবং এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করা।

প্রসঙ্গত আমরা আবার বলবো যে, সেই উভয় বিধি-বিধানের বাস্তবায়নে যদি বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ না করা হয় তাহলে তা থেকে কখনো কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হবে না। ফলে তা বাগানের সেই ফুলগাছগুলোর মতো হবে যা রোপণের পর মালিকের আর স্পর্শই পায়নি এবং উপযুক্ত দেখাশুনার অভাবে তা শুকিয়ে

গেছে। গাছগুলোকে সজীব ও সতেজ রেখে ফুল উৎপাদনের ন্যূনতম শর্ত ও বিধানগুলো মানা হয়নি বলে ফুল উৎপাদন তো দূরের কথা– গাছটিকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন– ওসব বিধি-বিধানকে কার্যকরী করার জন্যে যে জিনিসটির দিকে প্রথম দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো আল্লাহর অধিকার। এরপর যেসব উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ যে সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এটা হচ্ছে উল্লেখিত বিধি-বিধান বাস্তবায়নের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। আর এর নিকৃষ্টতম পদ্ধতি হচ্ছে ব্যভিচার অথবা নারীর এমন চাকরি-বাকরি যাতে সে পর-পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে বাধ্য হয় এবং সন্তানদের লালন-পালন এবং স্বামীর সেবাযত্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কও সন্তোষজনকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পিতা-মাতার জন্যে তাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সেই পবিত্র আবেগ অনুভূতিরও সৃষ্টি হয় না যা শরীয়ত সৃষ্টি করাতে চায়।

এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা যখন আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক দাম্পত্য জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামী নীতি ও বিধি-বিধানের সন্ধান ও পর্যালোচনা করি তখন তার সহজ-সুন্দর ও বাস্তবানুগ শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে আমরা মুগ্ধচিত্তে আল্লাহর প্রশংসা করতে বাধ্য হই। দেখুন একটি ছোট্ট আয়াতে আল্লাহ আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

"তোমাদের নারীরা তোমাদের ক্ষেত্রের মতো; তোমাদের স্বাধীনতা আছে যেভাবে চাও নিজের খেতে যাও; কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা করো এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচ। খুব ভালো করে জেনে রেখো যে, একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। (এবং হে নবী যারা তোমার হেদায়াত মেনে নিয়েছে) তাদেরকে (কল্যাণ ও সৌভাগ্যের) সুখবর দিয়ে দাও।"[১৮২]

মায়ের অধিকার

ইসলাম মানুষকে ভালোবাসা, দয়া, আনুগত্য এবং ভদ্রতা ও নম্র ব্যবহার শিখায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে এসব মহতি গুণের পরিচয় দিতে বলে। ইসলামের সব আদেশ-নিষেধ ও ব্যবস্থায় এবং সবরকমের পরামর্শ ও উপদেশে মানুষকে এসব মহতি গুণাবলি অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মা, মায়ের মহত্ত্ব, মায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা কোনো কোনো জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে, আবার কোনো কোনো জায়গায় মাতা-পিতার কথা একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সব জায়গাতেই

[১৮২] সূরা বাকারা : ২২৩।

মাতা-পিতার প্রতি অকৃত্রিম, স্থায়ী ও শর্তহীন ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি এবং মাতা-পিতার সেবাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালোবাসার এই অনুভূতি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ইসলামের উদ্দেশ্য, বিশেষকরে প্রতিটি সন্তানের মনে এই পবিত্র ও মহৎ অনভূতির স্থায়ী প্রকাশ ইসলাম দেখতে চায়। কারণ এই পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্ব আসলে মাতা-পিতারই মহান অবদান। এখানে সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্যে পিতার শ্রম-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা আর মায়ের স্নেহ, মমতা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার অবকাশ আমাদের নেই। মা ও পিতার এসব স্নেহ-দয়ার কথা বাদ দিলেও সন্তানের অস্তিত্বটাই মাতা-পিতার পক্ষ থেকে এমন এক অবদান যার সত্যতা অস্বীকার করার সাধ্য কারো থাকতে পারে না।

মানুষের ঠুনকো অস্তিত্বটা আসলে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। এসব খাওয়া-পরার আয়োজন, ফ্যাশন, বিলাসিতা সব কিছুই একান্ত অর্থহীন ব্যাপার। মানুষের মানবিক মূল্য ও গুরুত্ব তখনই হবে যখন সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার চারপাশের পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলিকে দেখে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তার আদেশের সামনে মাথা নত করে দেবে। এই বিশেষ জ্ঞান ও উপলব্ধিই মানুষকে অন্যান্য জীব ও প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করে। মানুষ এই আসল জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে মহাপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণ করে, চিন্তা-ভাবনা করে এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। এরই মাধ্যমে সে পায় আত্মার সজীবতা। এই পর্যায়ে পৌঁছেই মানুষ পৃথিবীর সবরকম দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি অর্জন করে এবং এই পৃথিবীর জীবনেই সে বেহেস্তের সুখ-শান্তি পবিত্রতা ও কল্যাণময়তার অধিকারী হয়ে ওঠে। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মের এই মঞ্জিলে পৌঁছে মানুষ তার অমরত্ব অর্জন করে। এমতাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের মোকাবিলায় দুনিয়ার শক্তি ও সম্পদকেই তার কাছে একান্ত তুচ্ছ মনে হয়। এই হচ্ছে সেই পরম কাম্য আধ্যাত্মিক মান যা একজন সত্যিকারের মোমেন মুসলমান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।

আর যে ব্যক্তি এই মহান নেয়ামতের একটি সামান্যতম অংশও পেয়ে যায় তাহলে জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত মনে করতে হবে। আর এই যে সৌভাগ্য মানুষ অর্জন করার সুযোগ পায় তার জন্যে সে প্রকৃতপক্ষে মাতা-পিতার কাছেই ঋণী থাকে। মাতা-পিতার মাধ্যমেই তো সে এই জীবন এবং জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করে থাকে। এই জন্যেই আল্লাহ মানুষকে তার

মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার, তাঁদের সেবা করার এবং তাঁদের অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

"হে নবী! ওদের বল যে, 'এস, আমি তোমাদের শোনাবো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর কি বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।"[১৮৩]

আরেকটি আয়াত হচ্ছে–

"এবং তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।"[১৮৪]

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাঁর প্রতি শোকর আদায়ের সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর আদায় করারও নির্দেশ দিচ্ছেন–

"এবং এটা সত্য কথা যে, আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জানার জন্যে নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্টের ওপর কষ্ট স্বীকার করে তাকে নিজের পেটে রেখেছে এবং দুই বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে (এই জন্যেই আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর কর এবং নিজ মাতা-পিতার শোকর আদায় কর। আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।"[১৮৫]

উপরের আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা করলে দুটি বাস্তবতা স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়–

এক. এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মাতা-পিতার সম্মান করার নির্দেশ দেওয়া এবং তাও আল্লাহর পরস্পরই মাতা-পিতার সম্মান করার আদেশ এই কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার উভয়ই একই রকম মান-মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত।

দুই. এই যে, তাঁদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদের সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকা এবং তাঁদের ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাঁদের নিষেধকে শিগগীরই পালন করা সন্তান মাত্রেরই ফরয। (অবশ্য তাঁরা যদি ইসলাম বিরোধী কোনো হুকুম দেন তাহলে তা মানা সন্তানের জন্যে বৈধ নয়।)

উপরে বর্ণিত দুটি অধিকারের ক্ষেত্রে মা এবং বাপ উভয়ের স্থান সমান। এ ক্ষেত্রে উভয়েই সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী। তবে দুটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে মা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারিণী।

---

[১৮৩] সূরা আনআম : ১৫১।
[১৮৪] সূরা নিসা : ৩৬।
[১৮৫] সূরা লোকমান : ১৪।

প্রথম স্থান : গর্ভধারণ ও দুধ খাওয়ানো এমন দুটি স্বতন্ত্র দায়িত্ব যা কেবল মায়ের ওপরই বর্তায়। পবিত্র কুরআনেও মায়ের এই দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাকে যে কতো দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্য সাধনার পরীক্ষা দিতে হয় তা সবারই জানা কথা। এ জন্যে মায়ের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অধিকার খুবই যুক্তিসঙ্গত।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন–

"তার মা কষ্টের পর কষ্ট উঠিয়ে তাকে পেটে ধারণ করেছে" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত কলাকৌশল মোতাবেক মা সন্তানের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত হয়। আর "দু-বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে" এর অর্থ হলো, মা কেবল তার অস্তিত্বের মাধ্যমই হয়নি; বরং তার কারণে তার জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানও হয়েছে। আর এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মা অত্যন্ত উচ্চতর ও বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছে; সুতরাং মায়ের সেবা আল্লাহর ইবাদতের মতো হয়ে যায়। এই জন্যেই প্রিয়নবী ﷺ মায়ের সেবাকে ইবাদতেরই অন্যতম রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। (সর্বসম্মত)

এভাবে মায়ের অবদান শুধু জন্মদান পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং তার চেয়ে এগিয়ে মা সন্তানের লালন-পালন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানও করেন। এজন্যে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক, যার উল্লেখ আমরা ইমাম রাযীর কথায় করেছি।

দ্বিতীয় স্থান : তাঁর দ্বিতীয় মর্যাদা এই যে, সন্তানসংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়ন তার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে, এটি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নাম যা কেবল মায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এরই মাধ্যমে আল্লাহ সন্তানের স্বভাবে সেই গুণাবলির সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সে মাতা-পিতার অধিকার জানতে পারে এবং তার মনে মাতা-পিতার জন্যে শ্রদ্ধার অনুভূতি ও চেতনা জাগে।

মনে করুন ভবিষ্যতে কোনো সময় যদি প্রজনন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণুর সংমিশ্রণে কৃত্রিম উপায়ে কিছু তৈরি করতে সক্ষমও হয়ে যায় তাহলে তা দেখতে শুনতে জীবন্তের মতো দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সত্তার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ থাকবে। কোনো শিশু এই স্তর মায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এজন্যে মানবশিশুকে মায়ের পেট থেকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আসাটা একটি প্রাকৃতিক শর্ত। এছাড়া মানবশিশুর মধ্যে সেই মানবিক গুণাবলির বিকাশ কখনো হবে না যার উল্লেখ কুরআনে করা হয়েছে।

মায়ের আর একটি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা হচ্ছে– তিনি সন্তানের মধ্যে বিবেচনা ও অনুভূতি শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে থাকেন। এটা আল্লাহর এক অনন্য দান। এই কারণেও মায়ের মর্যাদা বাপের তুলনায় অনেক বেশি।

সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার বাপের তুলনায় তিনগুণ বেশি। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবু হোরায়রার বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের সেই সহীহ হাদিসটি উল্লেখ যাতে বলা হয়েছে–

"এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সাথে অবস্থানকারীদের মধ্যে কে আমাদের উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি উপযুক্ত?" প্রিয়নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো। প্রিয়নবী ﷺ আবার একই জবাব দিলেন– "তোমাদের মা।" এরপর লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো। প্রিয়নবী ﷺ বললেন– "তোমাদের পিতা।"

এ জন্যে হাদিস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, বাপের তুলনায় মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশি।

উল্লেখ যে, আমরা এখানে মায়ের সেসব অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি না যা আদায় করা প্রত্যেক সন্তানেরা অবশ্য কর্তব্য। যেমন মায়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, তাঁর ব্যয়ভার বহন করা, সেবা করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা মায়ের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারের কথাই বলছি। নয়তো মায়ের সাধারণ অধিকার এবং মর্যাদা যে কতো বেশি তা প্রিয়নবীর হাদিস থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়–

একবার এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর ﷺ দরবারে এসে বললো– ওগো আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই; কিন্তু আমি তার উপযুক্ত নই। প্রিয়নবী জিজ্ঞেস করলেন– "তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি জবাবে বললো– "হ্যাঁ, আমার মা জীবিত আছেন।" প্রিয়নবী ﷺ বললেন– "যাও, অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে মায়ের খেদমত কর। যদি তুমি এমন কর তাহলে তুমি হজ, ওমরা এবং জিহাদ তিনটির পুণ্য পাবে।"[১৮৬]

এরই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি হাদিস ইবনে মাজা, নাসাঈ এবং হাফেজ প্রামাণ্য দলিলের সাথে বর্ণনা করেছেন–

এক ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ-এর দরবারে এসে বললো "ওগো আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশ নিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে

---

[১৮৬] তাবরানী।

উপস্থিত হয়েছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– "তোমার মা কি বর্তমান আছেন?" লোকটি জবাব দিল– "হ্যাঁ!" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– "তাঁর সাথেই থাক এবং তাঁর সেবা কর, কেননা বেহেশত তাঁর চরণতলেই রয়েছে।"[১৮৭]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এসব বাণীর মাধ্যমে মায়ের উচ্চতর মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। এভাবে ইসলাম মায়ের মর্যাদা ও সেবায় মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও মায়ের এমন উচ্চতর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পর্দা নারীর ভূষণ

উপস্থাপনা

পর্দা শব্দটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বয়ং মুসলমানদের জন্যেই অপরিচিত এবং অস্পষ্টবোধক ছিল। অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্দার বিভিন্ন অর্থ বের করা হয়। সুতরাং অনেক লোক বিভ্রান্তিবশত পর্দার অর্থ বলতে নারীকে অন্ধকার ঘরে বসিয়ে রাখাকে বুঝিয়েছে, যেখান থেকে নারী যেন কোথাও আসতে বা যেতে না পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, বিয়ের পর মেয়েরা শুধু নিজের পিতৃগৃহ ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত করতে পারতো না এবং স্বামীর গৃহ থেকেই শেষবারের মতো তার জানাযা বের হতো। এটাকে তারা তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের প্রতীক মনে করতো এবং এটা ছিল তাদের কাছে বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয়। এ ধরনের বিদঘুটে অবস্থায় নারী যদি কোনো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়তো তাহলে এমনকি ডাক্তারকেও রোগিণীকে দেখার অনুমতি দেওয়া হতো না। কেবল মেয়ের পিতা, ভাই এবং শ্বশুর তাকে দেখার সুযোগ পেতো। এছাড়া রোগিণীকে কেউ দেখতেও পেত না, তা কেউ ডাক্তার হোক বা কোনো নিকটাত্মীয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি কিছুটা কম ছিল। সেক্ষেত্রে মেয়ে নিকটাত্মীয়দের বাড়ি যাতায়াত করতে পারতো। তবে এই আসা-যাওয়ার অনুমতি ছিল শুধু রাতের বেলায় কারণ তখন তার ওপর পর-পুরুষের দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। আর ধনী পরিবারের মেয়েরা পালকি বা পশুচালিত যানবাহনে যাতায়াত করতো; কিন্তু এসব পালকি ও যানবাহনের দরজা-জানালা খুব ভালো করে বন্ধ রাখা হতো। যদি দরজা জানালা না থাকতো তাহলে পুরো পালকি বা বাহনটিকে কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো।

---

[১৮৭] হাদিস।

যাহোক, পদব্রজে হোক বা যানবাহনে উভয় অবস্থাতেই নারীকে কড়া পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা মেনে চলতে হতো। কাপড়ের উপর আরো কাপড় ঢেকে তার পুরো অস্তিত্বটাকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হতো যে, আপাদমস্তক শরীরের সবকিছুই পুরু পর্দার অন্তরালে হারিয়ে যেতো এবং পর্দাটা এতই লম্বা হতো যে, তার একটি অংশ মাটিতেই লুটোপুটি খেতো। এই কঠোর পর্দা ব্যবস্থা আজও কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। পর্দার এই স্ব-প্রবর্তিত ব্যবস্থা শহরের ও গ্রামের ধনী ও অভিজাত লোকদের একটি ফ্যাশনে পরিণত ছিল।

সুতরাং বিখ্যাত আধুনিকতাবাদী কাসেম আমীন বেগের মতো লোকেরা যখন নারী স্বাধীনতার পতাকা তোলেন তখন সমাজে পরিচালিত এ ধরনের কঠোর পর্দা ব্যবস্থারই সমালোচনা করে একে ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেন এবং এও বলেন যে, এটা ইসলামের নির্দেশিত মানবিক সাম্যের বিরোধী, কারণ এতেকরে নারীর ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। এসব যুক্তির বুনিয়াদের ওপর তাঁরা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে নিজেদের পক্ষে দলভুক্ত করেন।

উম্মুল মোমেনিনদের পর্দা

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, পুরো কুরআন শরীফে পর্দা সম্পর্কে একটিমাত্র আয়াত রয়েছে। আর এ আয়াত উম্মুল মোমেনিন অর্থাৎ প্রিয়নবীর ﷺ স্ত্রীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর পটভূমিতে রয়েছে সেই বিখ্যাত ঘটনা যা কুরআনের ব্যাখ্যাকাররা তাঁদের তফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করেছেন। কুরআনের পর্দাসংক্রান্ত সেই আয়াতটি হচ্ছে–

'হে ঈমানদারগণ! নবীর গৃহসমূহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, খাবার সময়ও উঁকি দিও না। তবে হ্যাঁ, তোমাদেরকে যদি খেতে ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। যখন খাবার খেয়ে নেবে তখন চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেকো না। তোমাদের এসব ব্যবহার নবীকে দুঃখ দেয়; কিন্তু তিনি লজ্জার কারণে কিছু বলেন না, আর আল্লাহ সত্যকথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চেয়ে নিও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্যে উত্তম পন্থা। তোমাদের জন্যে এটা কখনো বৈধ নয় যে, আল্লাহর রাসূলকে দুঃখ দেবে এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদের সাথে বিয়ে করাও বৈধ নয়। এটা আল্লাহর কাছে বিরাট পাপ। তোমরা কোনো কথা প্রকাশ কর বা গোপন কর– আল্লাহ সব কথাই জানেন।"[১৮৮]

---

[১৮৮] সূরা আহযাব– ৫৩।

এ আয়াতকেই পর্দার আয়াত বলা হয়। এ আয়াত অবতরণের অনেক আগেই শুধু ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ অনুধাবনের আলোকেই এবং আল্লাহর ওহীর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই হযরত ওমর উম্মুল মোমেনীনদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুতরাং হযরত ওমর একাধিকবার প্রিয়নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করেন যে, "ওগো আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন যে তাঁরা যেন পর্দা করেন।" কিন্তু যেহেতু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি স্বাধীন ছিলেন না, তাই তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করেন। বুখারী-মুসলিমে হযরত আনাস বিন মালেকের বর্ণনা মওজুদ রয়েছে। তাতে রয়েছে, হযরত ওমর প্রিয়নবীর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন–

"ওগো আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার কাছে ভালোমন্দ সব রকমের লোক আসে। হয়তো ভালো হবে, যদি আপনি আপনার পাক-পবিত্র স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিয়ে দেন!" 'সুতরাং এ পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং এর অবতরণ সেই প্রাতঃকালে হয় যেদিন প্রিয়নবী হযরত যয়নব বিনতে জায়েদকে বিয়ে করেন।

শুধু তাই নয়। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক হযরত ওমর-এর অভিমত ছিল– এই পর্দা সে রকমের হবে যে, কেউ যেমন তাঁদের গৃহে যাবে না তেমনি তাঁরা নিজেরাও ঘর থেকে বেরুবেন না। এমনকি কেউ যেন তাঁদের দেখতে না পায়।

হাদিসের বর্ণনায় আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে উম্মুল মোমেনিন হযরত সাওদাহ বিনতে জাময়া (রা) এক রাতে নিজের কোনো প্রয়োজনে পর্দাসহকারে বাইরে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত ওমরের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। যেহেতু তিনি দীর্ঘাকৃতির ছিলেন এজন্যে হযরত ওমর তাঁকে চিনে নেন এবং বলেন;

"খোদার শপথ হে সাওদা (রা)! আপনি আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকোতে পারেন না। দেখেই চেনা যায়, সুতরাং আপনি বাইরে বের হবেন না।" একথা শুনে হযরত সাওদা (রা) প্রিয়নবীর ﷺ কাছে উপস্থিত হন এবং পুরো ঘটনা খুলে বলেন– প্রিয়নবী ﷺ তখন হযরত আয়েশার গৃহে নৈশভোজ গ্রহণ করছিলেন। একথা শুনে প্রিয়নবী এলহামী অবস্থায় পড়েন এবং বলেন–

"তোমাদের জন্যে এই অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বেরুতে পারবে।"

(এই ঘটনা, ইমাম বুখারীর সহীহ হাদিস এবং তফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন তাবারী, ইবনে কাসীর এবং কুরতুবীতে দেখা যেতে পারে। প্রামাণ্য দলিলের জন্যে ওসব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।)

হাফেয ইবনে হাযার ফতহুল বারীতে লিখেছেন– "পর্দার আয়াত অবতরণের পর হযরত ওমর এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন যে, পর্দাবৃতা কোনো মহিলার ব্যক্তিত্ব যেন চেনা না যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। তাঁকে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করতে বারণ করে দেওয়া হয় এবং উম্মুল মোমেনিনদেরকে নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বেরুবার অনুমতি দেওয়া হয় যেন তারা কোনো অসুবিধায় না পড়েন।"

উপরের বিস্তারিত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উম্মুল মোমেনিনদের জন্যে যে ধরনের পর্দা ফরয করা হয়েছিল তা তাদের মুখমণ্ডল এবং হাতের পর্দা ছিল। তা তাঁদের পর্দাবৃত ব্যক্তিত্বের পর্দা ছিল না।

বিখ্যাত ফকীহ কাজী আয়াম এ প্রসঙ্গে বলেন– "এ ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, উম্মুল মোমেনিনদের ওপর যে ধরনের পর্দা করা ফরয করা হয়েছিল তাতে মুখমণ্ডল ও হাত শামিল রয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রেও এসব খোলা রাখার অনুমতি ছিল না– তা স্বাস্থ্যের ব্যাপারই হোক বা অন্য কিছু।"

একই দেখাদেখি অভিজাত মহলের মহিলারাও নিজেদের জন্যেও সেই ধরনের পর্দা বেছে নেন যা আল্লাহ উম্মুল মোমেনিনদের জন্যে পছন্দ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম ব্যবহার অনুসরণ করা। অতএব, প্রিয়নবীর ﷺ আমল থেকেই তার অনুসরণ চলছে; কিন্তু পরবর্তী যুগে পর্দার ব্যাপারে আরো অতিরিক্ত বিধিনিষেধ ও বাড়াবাড়ীর সমন্বয় ঘটে– যেমন আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এভাবে পর্দার নামের কঠোর প্রথা সমাজে প্রচলিত হতে শুরু করে এবং এক শ্রেণির লোক এটাকে তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের অংশে পরিণত করে নেয়। এভাবে তারা পর্দার ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকেই খর্ব করে। তাদের পর্দাটা ইসলামী না হয়ে একটা প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। (সুতরাং কেউ বিয়ের পয়গাম দিয়েও নিজের হবু স্ত্রীকে দেখার অনুমতি পায় না। অথচ শরীয়তে তার অনুমতি রয়েছে; কিন্তু শরীয়তের বিধানের দিকে তাদের দৃষ্টি কি থাকবে তারা তো সামাজিক প্রচলন নিয়েই বেশি মাথা ঘামায়।)

মুসলিম নারীর পর্দা

পর্দা মুসলিম নারীর সেই স্বতন্ত্র ভূষণ যা ইসলাম তার জন্যে নির্ধারিত করেছে। ইসলাম পর্দার মাধ্যমে অন্ধকার যুগের অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনী প্রথার মূলোচ্ছেদ করেছে এবং পর্দাহীন সমাজে সৃষ্ট যাবতীয় বেলেল্লাপনা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করে দেওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এখানে ইসলামের মহৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত করার জন্যে এবং ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব কার্যকরী করার জন্যে অন্ধকার যুগের কিছু ঘটনার উল্লেখ

করা উচিত ছিল– যা থেকে এটা বুঝা যেতো যে, ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করে নারীজাতিকে কি দারুণ বিপর্যয় ও দুরবস্থা থেকে রক্ষা করেছে। এতেকরে সেসব লোকদের মুখোশও উম্মোচিত হয়ে পড়তো যাঁরা নারীকে কেবল পাশবিক উল্লাসের সম্বল বলে মনে করে; কিন্তু সেসব ঘৃণ্য-জঘন্য-যৌন নোংরামির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের পবিত্র মনকে তমসাচ্ছন্ন করতে চাই না।

তবে অন্ধকার যুগের সামাজিক পরিবেশের একটা চিত্র তুলে ধরার জন্যে পবিত্র কুরআনে যেসব প্রয়োজনীয় আয়াত বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করার পরামর্শ আমরা অবশ্যই দেবো। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতে অন্ধকার যুগের বিভিন্ন বদ-অভ্যাস, কুসংস্কার ও অশ্লীলতার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত নোংরামির জন্যে তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এমনসব আইনবিধিও প্রণয়ন করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন করে ওইসব অপরাধ প্রবণতা, নোংরামি ও অশ্লীলতা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে।

এসব আয়াত অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে যে, অন্ধকার যুগে নারীর অবস্থা কত বেদনাদায়ক ছিল এবং ইসলাম কিভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে নারী ছিল শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত। ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে অবনতির অতল তল থেকে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে এনে আসন দিয়েছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষাদীক্ষায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি আধ্যাত্মিকভাবেও উচ্চতর মর্যাদা দান করেছে। আগে যেখানে নারীকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতেও সবাই অপ্রস্তুত ছিল, সেখানে ইসলামই শুধু তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করেছে এবং তাকে সেবা করা ও শ্রদ্ধা করাকে আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছে।

নিচে আমরা ইসলামের এমন কিছু বিশেষ মূলনীতির উল্লেখ করবো যা সামষ্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো সমাজের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

১. সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইসলামের সব বিধি-বিধানে নারী-পুরুষ উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআনে একদিকে যেমন বলা হয়েছে যে–

"হে নবী! মুমিন নারীদের বলুন যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি নিচে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে।"

সেখানে সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে–

"হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলুন যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি নিচে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে।"

বলাবাহুল্য, পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষ উভয়কে একই বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. ইসলাম, মনমগজের পরিচ্ছন্নতা, মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা গঠন, এবং সামাজিক পরিবেশকে অশ্লীলতা ও অপরাধপ্রবণতার যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করতে চায়। কারণ যাবতীয় পাপ, অপরাধ ও নোংরামির উৎস মানুষের মন্দ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে ইসলাম নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। কারণ নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং পবিত্র কুরআনে উভয়েরই সংশোধনে আইন জারি হয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন–

"নবীর স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল হতে চাও। তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটাই উত্তম পন্থা।"[১৮৯]

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, নারী ও পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ের পরিশোধন করা। সুতরাং আয়াতের পরবর্তী বাক্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়কে সবরকমের কলুষতা থেকে মুক্ত রাখা এবং হৃদয়কে পূতঃপবিত্র করে তোলা। ইমাম এই কুরআনী বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–

"…. এর অর্থ এই যে, চোখের মাধ্যমে পাপের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং দৃষ্টির উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্যে করা হছে যে, হৃদয়ের আবেগকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে চোখ অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। পুরুষ হোক বা নারী– উভয়ই অতি সহজে ও অতি শিগগীর দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সবসময় নিচের দিকে দৃষ্টি রাখবে– উপরে তাকাবেই না! না তা নয়। যদি তাই হতো তাহলে এটা ভীষণ কষ্টকর হতো, কারণ মানুষ সমাজে থাকে, তাকে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে হয়। এখন যদি সবসময় নিচের দিকেই চেয়ে হাঁটতে হয় তাহলে নানারকম অসুবিধার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইসলামের এই কথা যে "নিচের দিকে দৃষ্টি রেখো" তার আসল অর্থ হচ্ছে মনকে সেসব চিন্তা ও বাসনা থেকে মুক্ত রাখ যাতে মন কলুষ ভাবনায় জড়িয়ে পড়তে পারে। পবিত্র কুরআন মোমিন পুরুষ ও মোমিন নারীকে এই শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন তাদের মন-মেজাজকে ভ্রান্ত বিষয়াবলিতে জড়িত

---

[১৮৯] সূরা আহযাব : ৫৩।

না করে এমনসব কল্যাণমূলক কাজে মনোযোগ দেয় যাতে সমাজের উপকার ও উন্নতি হয়। তারা যেন এমন সব বিষয়াবলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যাতে জীবনের উন্নত ও মহত্তম মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যেন নিজেকে নিজে চিনতে ও জানতে পারে। এসব বিষয় মানুষের সাহস ও উদ্যম বাড়ায়, চিন্তাকে সুদূরপ্রসারী করে এবং হীন ও তুচ্ছ তৎপরতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এসব আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ব্যক্তি যখন তার পরিবেশের দিকে তাকায় তখন তার মনে সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে। এরপর সে তুচ্ছ ব্যাপারসমূহের দিকে আকর্ষণ বোধ করে না। যেমন হঠাৎ কোনো সুন্দরী-রূপসী নারীর দিকে চোখ পড়লেও তার মনমেজাজে কোনোরকম মন্দ ভাব জাগে না, সে তার দৃষ্টি ও চিন্তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেন এ ব্যাপারটা কিছুই নয় এবং সে দেখা মাত্রই তার দৃষ্টিকে অন্যত্র ফিরিয়ে নেয়। একই অবস্থা একজন মোমেন নারীরও।

৩. তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে সৎ, পূতঃপবিত্র, নম্র ও ভদ্র করে গড়ে তোলে। অন্ধকার যুগে নর-নারী যেমন অসংখ্য রকমের পাপাচার, কুপ্রথা ও কুকর্মে অভ্যস্থ ছিল তেমনি নৈতিক ও চারিত্রিকভাবেও তারা ছিল দেউলিয়া। সেই সমাজের নারী-পুরুষ অবাধে অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতো।

অন্ধকার যুগের অসংখ্য কুপ্রথার মধ্যে একটি ছিল নারীদের সৌন্দর্য ও দেহপ্রদর্শনীর প্রথা। তারা পথ চলতে গিয়ে রূপের প্রদর্শনী করতো, কখনো চপলা, কখনো চঞ্চলা, কখনো থমকে থমকে, কখনো থেকে থেকে বিভিন্ন রকমের কসরৎ ও অভিনয় করে পথ চলতো। আর এভাবে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তারা লোকদের ব্যভিচারের জন্যে উস্কাতো।

ইসলাম অন্ধকার যুগের এই কুপ্রথা ও অশ্লীলতাকে উচ্ছেদ করে ঘোষণা করে যে– "বর্বর যুগের রূপচর্চা ও দেহপ্রদর্শনী করে ঘোরাফেরা করো না।"[১৯০]

অর্থাৎ তাদের আদেশ দেওয়া হলো যে, ইসলাম আবির্ভাবের আগে যেভাবে তোমরা রূপচর্চা ও প্রদর্শনীর যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাও। প্রথমত, তোমরা বিনা দরকারে ঘর থেকেই বের হয়ো না। আর যদি দরকারবশত বেরুতেই হয় তাহলেই এভাবে বের হবে যেন মর্যাদা ও শালীনতা ক্ষুণ্ন না হয়। আর তার উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেদের উপর চাদর ঢেকে পর্দা কর যেন মনে হয় যে তোমরা পূতঃপবিত্র এবং সভ্রান্ত মহিলা। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

"হে নবী! নিজের স্ত্রীদের এবং মেয়েদের এবং মুসলমান নারীদের বলে দাও যে, 'তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের ঘোমটা টেনে দেয়।' এই

---

[১৯০] সূরা আহযাব : ৪।

ব্যবস্থায় একথা অধিকতর প্রত্যাশাযোগ্য যে, তাদের চিনে নেওয়া যাবে এবং তাদের বিরক্ত করা হবে না।"[১৯১]

উল্লেখ যে, চাদর এবং ঘোমটা টানার অর্থ এই হবে যে, নারীর সব গোপন অঙ্গ তাতে ঢাকা পড়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর আকরামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে– এর অর্থ হচ্ছে এমন চাদর যা তার মাথা, চুল এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে নেয়।

অন্ধকার যুগে আরেক নোংরামির উল্লেখ করে ইবনে কাসীর বলেন– "রাতেরবেলা শহরের গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা বিভিন্নস্থানে ওঁৎপেতে বসে থাকতো এবং যাতায়াতকারিণী নারীদের উত্যক্ত করতো; কিন্তু কোনো মহিলা যদি পর্দায় থাকতো তাহলে তাকে কোনো রকমের বিরক্ত না করে নিরাপদে চলে যেতে দিতো।"

উপরের আয়াতের পরই এই নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এতে অসৎ লোকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয় যে, তারা যদি তাদের মন্দ কার্যকলাপ পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ বলেন–

"যদি মুনাফেকরা এবং ওসব লোকেরা যাদের মনে মন্দ প্রবণতা রয়েছে এবং ওরা যারা মদিনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে নিজেদের কার্যকলাপ থেকে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তোমাদের দাঁড় করিয়ে দেবো, এরপর তারা এই শহরে খুব করেই তোমাদের সাথে অবস্থান করতে পারবে। তাদের উপর সব দিক থেকে অভিশাপের বৃষ্টি পড়বে, যেখানেই যাবে ধরা পড়বে এবং শোচনীয়ভাবে মারা পড়বে।[১৯২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণির অপরাধের মান একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং তাদের জন্যে একই রকম শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। সাধারণত নারীদের সাথে নোংরা আচরণকারীদের অপরাধ রাজনৈতিক চক্রান্ত কারীদের অপরাধের তুলনায় অনেক হাল্কা মনে করা হয়; কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় ধরনের অপরাধ একই শাস্তির আওতায় পড়ে এবং দুটি অপরাধই সমানভাবে জঘন্য। এক ধরনের লোক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে দেশ ও সরকারের ক্ষতি করলে অন্য ধরনের লোকেরা তার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের গোড়ায় কুঠারাঘাত হানে।

এভাবে ইসলাম পুরো বিশ্বমানবতাকে অসৎ ও অশ্লীল কার্যকলাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম মানবতাকে শরীয়তের

---

[১৯১] সূরা আহযাব : ৫৯।
[১৯২] সূরা আহযাব : ৬০-৬১।

আইনের অনুসারী হবার আমন্ত্রণ জানায় যা নারীর শালীনতা ও সম্মান করার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম সমাজকে গুণ্ডা-বদমাশদের নোংরা তৎপরতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে অত্যন্ত বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। এভাবে পুরো মানবতাপূর্ণ মর্যাদা ও পবিত্রতার সাথে নিরাপদে বাঁচার সুযোগ পাবে।

৪. চতুর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষকে সেই স্বাভাবিক বিধির নিরিখে সৃষ্টি করেছেন তারা যেন তারই আলোকে জীবনযাপন করে। অর্থাৎ পুরুষ তার নির্ধারিত কর্মক্ষেত্র ও সীমালঙ্ঘন করবে না এবং নারীও তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ও সীমালঙ্ঘন করবে না। পুরুষের জন্যে নারীর বেশ ধরার এবং নারীর জন্যে তার স্বাভাবিক বেশ ছেড়ে পুরুষের বেশ ধরার কোনো বৈধতা নেই। পুরুষ ঠিক পুরুষের মতো থাকবে আর নারী ঠিক নারীসুলভ স্বাভাবিকতা নিয়ে থাকবে। কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ করবে না।

সহীহ হাদিসে ইবনে আব্বাস একটি হাদিস এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

"আল্লাহর রাসূল, নারীর বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।"[১৯৩]

অন্য একটি হাদিসে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন–

"আল্লাহর রাসূল, নারীদের মতো পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের ওপর এবং পুরুষদের মতো পোশাক পরিধানকারিণী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।"

নারী ও পুরুষদের বেশ ধারণকারীদের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করে থাকে। এ ধরনের নর-নারীকে সবাই ঘৃণা করে। কেননা এতেকরে একদিকে যেমন নারী ও পুরুষ উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব হয় তেমনি তাতেকরে যৌন উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়ে থাকে যা দর্শনমাত্রকেই উত্তেজিত করে। এই জন্যে যেকোনো রুচিবান ভদ্রলোক নারী-পুরুষের ছদ্মবেশকে ঘৃণার চোখে দেখেন। ইসলাম যে এটাকে ঘৃণার চোখে দেখে তার আরো একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার প্রকৃতিগত বৈপরিত্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা, কারণ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কেন যে তিনি সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় বানিয়েছেন তা আমরা বুঝে না থাকলেও এর পেছনে যে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তাছাড়া নর-নারীর সৃষ্টি প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং তারা পরস্পরের কাছে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এখন নারী ও পুরুষের পরস্পর পরস্পরের বেশভূষা অবলম্বন করার মাধ্যমে শুধু যে তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব হয় তাই নয়, আসলে এতেকরে

---

[১৯৩] হাদিস।

প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধাচরণও করা হয়। এতেকরে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনের বিরাট অপরাধ হয়। এদিক থেকে তা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় ব্যাপার।

স্মরণ রাখা দরকার যে, মানবতা হচ্ছে এক ব্যাপকভিত্তিক আইন-বিধিরই নাম; বরং মানবতার অর্থ হচ্ছে এক সর্বব্যাপী বিধি-বিধানেরই বাস্তব রূপ। এখন যদি কেউ মানুষ হয়ে মানবিক আইন-বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নিজেই তার স্বাভাবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আসলে এমন ব্যক্তি তার বিবেক-বুদ্ধির দেউলিয়াপনারই প্রমাণ পেশ করে– তার মানবিক জ্ঞানশক্তি যে লোপ পেয়েছে সে তারই সাক্ষ্য পেশ করে। এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব জীবনের আসল পথ থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাদের আসল স্বভাবের পথে পরিচালিত করতে চায় এবং তাদেরকে জীবনের সত্যিকার অর্থ খুঁজে বের করার আমন্ত্রণ জানায়। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রতিটি নর ও নারীকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুধাবনের জন্যে উৎসাহিত করে। পুরুষের বেশধারী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষদের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তারা জীবনের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে রেহাই পেতে চায়– যা নর বা নারী হিসেবে তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পলায়নপরতার এই আগ্রহই স্বাভাবিক আইনের বাস্তবায়নকে ব্যাহত করে। একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠন ও তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। বলাবাহুল্য, ইসলাম এ ধরনের যাবতীয় ক্ষতিকর প্রবণতা ও কার্যকলাপের সব উপায় ও মাধ্যমের বিলুপ্তি সাধনে বদ্ধপরিকর যা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থি হতে পারে।

৫. ইসলামের বিবেচনায় নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘরবাড়ি। এটা নারীর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এর সাথে বিদ্রোহ করার অর্থ হচ্ছে তার নিজের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথেই বিদ্রোহ করা। নর বা নারী যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি মোতাবেক কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা সমাজ সঠিকভাবে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করবে।

নারীর স্বভাবের দাবি হচ্ছে সে ঘর-বাড়ির সীমানায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। এর অন্যথা কাজ করলে অর্থাৎ তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ জন্যেই আল্লাহ প্রিয়নবীর স্ত্রী, মেয়ে এবং মুসলিম নারীদেরকে নিজেদের মান-মর্যাদার সাথে ঘর-বাড়িতে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘর-বাড়িতে শান্তি ও সম্মানের সাথে অবস্থান করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কর। বস্তুত এটাই তোমাদের স্বভাবসম্মত পন্থা। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্ষতি অনিবার্য।

কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের সামনাসামনি হওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়। আর অপরিহার্য প্রয়োজনের কোনো সীমা কুরআন নির্ধারণ করেনি। এ ব্যাপারে বিবেচনার ভার মানুষের বিবেকের ওপরই বর্তাবে। কারণ বিবেকই সবচেয়ে উত্তম বিবেচক।

এভাবে নারী তার অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং কোনো দ্বীনি প্রয়োজনেও বাইরে বেরুতে পারে। যেমন হযরত সাওদাহ (রা)-এর ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনীয় ব্যাপারে প্রিয়নবী নারীদের বাইরে বেরুবার অনুমতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর তার তফসীরে আরো বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন−

"আত্মমর্যাদার সাথে নারীদের নিজ নিজ গৃহে অবস্থানের" অর্থ হচ্ছে নিজেদের গৃহেই অবস্থান কর এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরিও না। আর দ্বীনি প্রয়োজনের মধ্যে নামাযের জন্যে মসজিদে আসাটাও শামিল রয়েছে।

যদি কোনো প্রয়োজনে বা ঘটনাচক্রে পরপুরুষের সামনাসামনি হয়ে পড়তে হয় তাহলেও কিছু আসে যায় না, তবে পরপুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় শরীয়তের সেসব আদেশ-নিষেধ ও শর্ত শরীয়তের দিকে লক্ষ করতে হবে যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি আমরা এখানে তুলে ধরছি।

উম্মুল মোমেনীন এবং অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে জানা যায় যে, মদিনার পথে এবং হজ আদায়ের সময় কোনো কোনো সাহাবাদের সাথে তাঁরা সামনাসামনি হয়ে পড়তেন। এতে কোনো রকমের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। তবে এ ধরনের অবস্থায় দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে।

১. এ ধরনের সামনাসামনি সাক্ষাৎ যেন নির্জন একাকীত্বে না হয়। এ ধরনের সামনাসামনি অবস্থা ঘরে বা বাইরেও যেন নির্জন একাকীত্বে না হয়। এ ধরনের সামনাসামনি অবস্থা ঘরে বা বাইরেও হতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই; কিন্তু এ ধরনের সাক্ষাতের সময় স্বামী বা বাপ-ভাই এ ধরনের মুহাররমদের মধ্যে কেউ সাথে থাকা খুবই জরুরি। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রিয়নবী বলেছেন−

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে সে কোনো নারীর সাথে একাকীত্বে (যেন− কখনো সাক্ষাৎ না করে; তবে হ্যাঁ, যদি তার সাথে মুহাররমদের মধ্যে কেউ থাকে।"

বুখারী শরীফের জন্য একটি হাদিস হচ্ছে−

"কেউ কোনো নারীর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করবে না; অবশ্য যদি তার সাথে কোনো মুহাররম থাকে।"

(উল্লেখ যে, মুহাররম হচ্ছে শরীয়তের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে নারীর সেসব নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে করা তার জন্যে নিষিদ্ধ বা হারাম, যেমন বাপ-ভাই, চাচা-মামা ইত্যাদি।)

তবে হাদিসের অর্থ বা উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইসলাম পুরুষ বা নারীর ওপর কোন আস্থা পোষণ করে না। না তা নয়। আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য পথকেও বন্ধ করে দেওয়া। এ জন্যেই পরপুরুষ ও পরনারীর মধ্যে একাকীত্বে সাক্ষাৎকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিনা অনুমতিতে কাউকে কারো ঘরে প্রবেশ থেকে বারণ করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম আরো কিছু নিষেধ আরোপ করে বিশৃঙ্খলা ও বিপদের সব সম্ভাব্য পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। নর-নারীর বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়া এর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং প্রিয়নবী এই উদ্দেশ্যেই পরনারী ও পরপুরুষকে পরস্পর একাকীত্বে দেখা সাক্ষাৎকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। প্রিয়নবী বলেছেন–

"সাবধান! নারীদের কাছে একাকীত্বে যেয়ো না। কসম সেই পবিত্র সত্তার যার অধিকারে রয়েছে আমার প্রাণ; কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করবে না– অবশ্য এই জন্য যে, তাদের দু'জনের মাঝখানে একজন শয়তান থাকে।"

কিন্তু যদি একাকীত্ব না হয় বা একাকীত্ব হলেও নারীর সাথে তার কোনো মুহাররম থেকে থাকে তাহলে এ ধরনের সাক্ষাতে কোনো আপত্তি নেই।

২. দ্বিতীয় শর্ত এই যে, নারী তার রূপের প্রকাশ বা দেহ প্রদর্শনী বর্জন করবে। সে শরীয়তের নির্ধারিত সীমায় থাকবে। সেই সীমা কি? তা নিচের আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে–

"এবং নিজের রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করো না; সেই রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া যা স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যায়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন– "রূপসৌন্দর্য দু'ধরনের রয়েছে। একটি হচ্ছে স্বাভাবিক এবং অন্যটি কৃত্রিম। স্বাভাবিক রূপসৌন্দর্য বলতে আমাদের অর্থ হচ্ছে সেই রূপসৌন্দর্য যা তাকে প্রকৃতিই দান করেছে। আর কৃত্রিম রূপসৌন্দর্য হচ্ছে তা, যা নারী তার স্বাভাবিক রূপ সৌন্দর্যের পরিস্ফুটনের জন্যে সাজগোজ করে থাকে। যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, প্রসাধনী ইত্যাদি।[১৯৪]

[১৯৪] কুরতুবী দ্বাদশ খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা।

উপরের আয়াতে বর্ণিত– "যা স্বয়ং প্রকাশ হয়ে পড়ে।" তার অর্থ হচ্ছে রূপসৌন্দর্য দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি যা প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং অন্যটি গোপনীয় থাকে। প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন অভিমতের উল্লেখ করেছেন। যেমন কাতাদাহর মতে রূপসৌন্দর্যের অর্থ হচ্ছে কাঁকন, আংটি, সুরমা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়নবীর এই হাদিসটিরও উল্লেখ করেন। প্রিয়নবী বলেছেন–

"কোনো নারীর জন্যে, যে আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, এটা বৈধ নয় সে তার নিজের হাত দুটিকে অর্ধেকের ওপর খোলা রাখে।"

এভাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের অর্থ কাঁকন–আংটি ইত্যাদি। এর সমর্থনে তিনি এই ঘটনাভিত্তিক হাদিসের উল্লেখ করেন যে, "একবার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁদের ওখানে এলো। সেই সময় প্রিয়নবীও সেখানে পৌছান। প্রিয়নবী তাকে দেখে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নেন। এ দেখে হযরত আয়েশা বলেন–

"ওগো আল্লাহর রাসূল! (এটাতো আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী।" একথা শুনে প্রিয়নবী বললেন– "যখন মেয়ে সাবালিকা হয় তখন তার চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া কোন জিনিস খোলা রাখা উচিত নয়।"

এরপর আরো একটি অভিমতের উল্লেখ করেন। অন্যান্য অভিমতের তুলনায় এটাই বেশি প্রামাণ্য ও যথার্থ বলে মনে হয়। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্যের অর্থ হলো চেহারা ও হাতের তালুর সাথে ওইসব অলংকারও যা সাধারণত এই দুটি অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন আংটি, কাঁকন, প্রসাধনী ইত্যাদি।

যেমন আমরা আগেই বলেছি, এই অভিমতটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, নামায আদায়ের সময় লোকদেরকে সতর ঢেকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নারীদেরকে সারা শরীরের শুধু মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক মহিলাদের হাতের কনুই পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এসব মহিলার সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি তা হতো তাহলে এসব অঙ্গকে নামাযের সময় খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হতো না। এই অনুমতিকে সামনে রেখে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।"[১৯৫]

---

[১৯৫] তাবারী, অষ্টাদশ খণ্ড ৯৪ পৃ.।

কুরতুবী, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ এবং মাসউদ বিন আকরামার উদ্ধৃতি দিয়ে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করছেন এবং তা এই যে, প্রকাশ্য রূপ-সৌন্দর্যের অর্থ সুরমা, কাঁকন, অর্ধেক হাতের প্রসাধনী, বালি, আংটি ও অন্যান্য অলংকার– মণীষীদের মতে এসব জিনিস প্রকাশ্য রূপ সৌন্দর্যের পরিপন্থি নয়।[১৯৬]

রূপসৌন্দর্যের অন্য আরেক প্রকার হচ্ছে গোপনীয়। এর মধ্যে হাঁসলী, বাজুবন্দ, পায়েল, মাথা ও বাহুর অলংকার ইত্যাদির প্রদর্শনী বৈধ নয়। এ ব্যাপারে পাক-কুরআনের এই আয়াতে স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছে–

"এবং নিজের রূপ-সৌন্দর্যকে প্রকাশ করো না, ওই রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া যা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারা নিজেদের বক্ষের উপর নিজেদের চাদরকে বগলদাবা করে নেবে এবং নিজেদের রূপসৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না, অবশ্য ওসব লোকদের সামনে (যেমন) স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, সৎছেলে, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, আপন নারী, নিজ গোলাম, সেসব পুরুষ সেবক যারা নারীদের ব্যাপারে কোনো আকর্ষণ রাখে না অথবা ওঁসব ছেলে যারা এখনো নারীদের পর্দার ব্যাপারে অবহিত নয়। (এবং তাদেরকে আবেদন দাও যে) তারা চলার সময় নিজেদের পা মাটির উপর এভাবে না ফেলে, যে রূপসজ্জা তারা লুকিয়ে রেখেছে (শব্দের মাধ্যমে) তার প্রকাশ ঘটে।"[১৯৭]

কুরতুবী, প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্য ও রূপসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন– "রূপসৌন্দর্য কোনটা প্রকাশ্য হয় এবং কোনটা গোপনীয়। প্রকাশ্য রূপসৌন্দর্য দেখা মুহাররম ও অপরিচিত প্রত্যেকের জন্যেই বৈধ; কিন্তু গোপনীয় রূপসৌন্দর্য শুধু তারাই দেখার অনুমতি পাবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহর কুরআনে বলা হয়েছে।

এই ছিল পর্দা সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরি কথা যা আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করেছি। এ ধরনের পর্দার ব্যবস্থা করা নারী ও পুরুষ সবার জন্যেই জরুরি। এর অনুসরণ করে মন-মেজাজের পবিত্রতা অর্জন করা যেতে পারে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা কোনো অর্থেই বৈধ নয়। কারণ এছাড়া অন্য সব পথই ক্ষতিকর এবং তাতেকরে সমাজে বিভিন্ন ধরনের নোংরামি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

---

[১৯৬] কুরতুবী, দ্বাদশ খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা।
[১৯৭] সূরা নূর : ৩১।

সারকথা

পর্দাসংক্রান্ত এই দীর্ঘ আলোচনার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের নির্দেশিত পর্দা ব্যবস্থা নিছক কোনো প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি নয়; বরং এটা হচ্ছে একটি যুক্তি। বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি হচ্ছে এক ধরনের স্থবিরতা। তাতে কোনো রকমের রদবদলের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনবোধে রদবদলের অবকাশ থাকে। জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের দাবি মোতাবেক তা কোনো সময় কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হয় আবার কোনো সময় কিছুটা শিথিলতা দেখানো যেতে পারে। এর অনুসরণ অন্ধ ও বধিরদের মতো হয় না; বরং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মতো হয়ে থাকে। যেহেতু এটি একটি জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যবস্থা তাই এর অনুসরণের জন্যে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন অপরিহার্য।

এতক্ষণ আমরা পর্দা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। এবার আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবো।

১. ঘর-সংসারের মর্যাদা

২. নারীর রূপলাবণ্য ও প্রসাধন

৩. নারী-পুরুষের মর্যাদা

ঘর-সংসারের মর্যাদা

ইসলাম তার অনুসারীদের ঘর-সংসারের প্রতি মনোযোগ ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে আদেশ দেয়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম এমনসব আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছে যা ঘর ও পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ করে। নিচে আমরা এসব আইন-কানুন তুলে ধরছি।

১. ইসলামী সমাজের কোনো সদস্যের জন্যে ঘর ও পরিবারের বিভিন্ন ঘটনাবলি জানার জন্যে গোয়েন্দাগিরি করা অথবা উঁকিঝুঁকি মারা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক চারিত্রিক অপরাধ। এই হাদিসটি থেকে এই অপরাধের জঘন্যতা প্রমাণিত হয়। প্রিয়নবী বলেছেন–

"যদি কোনো ব্যক্তি তোমাদের অনুমতি ছাড়া তোমাদের ঘরে উঁকি মারে এবং তোমরা যদি তার চোখে কাঁকর মার যাতে সে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে (এর জন্যে) তোমাদেরকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১৯৮]

এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তখন দরজা খোলা ছিল। প্রিয়নবী বললেন–

"যাও, আলাদা সরে দাঁড়াও, চোখে চোখে অনুমতি নেওয়া হয় না।"[১৯৯]

---

[১৯৮] বুখারী, মুসলিম।

এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর পদ্ধতি ছিল তিনি যখন কারো ঘরে যেতেন তখন দরজার ডানে বা বামে সরে দাঁড়াতেন এবং তিনবার আসসালামু আলাইকুম বলতেন।

২. তিনটি সময় এমন রয়েছে যখন সেবক-সেবিকাদের বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি ঘরের ছেলে-মেয়েদেরকেও ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি নিতে হয়। আর অনুমতি তখনই দেওয়া যাবে যখন অনুমতিদাতা নিজে পর্দা করে থাকে এবং আত্মমর্যাদাবান হয়ে থাকেন। উল্লেখিত তিনটি সময় হচ্ছে–

(ক) ফজরের নামাযের আগে, কেননা ফজরের পূর্বে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ উচিত নয়।

(খ) যোহরের সময় যখন মানুষ নিরিবিলি আরাম করতে চায়।

(গ) এশার নামাযের পরে যখন ব্যক্তি ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

"হে ঈমানদাররা! তোমাদের দাসী-গোলাম এবং তোমাদের সেসব ছেলে যারা এখনো বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি, তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে, ফজরের নামাজের আগে এবং যোহরের সময় যখন তোমরা পরিধেয় খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদের জন্যে পর্দার সময়। এর পরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের ওপর এবং ওদের ওপর কোনো পাপ হবে না। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিজের বাণীসমূহের কার্যকরণ করেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও ওয়াকিবহাল।"[২০০]

৩. কারো গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎ অথবা কারো কাছে প্রয়োজনীয় ফরমায়েশের জন্যে সময় নির্বাচনের ভার ব্যক্তির মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শরীয়ত যে তিনটি সময়কে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেপুলেদের জন্যেও যেখানে অনুমতিসাপেক্ষ ঘোষণা করেছে তার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে সেই তিনটি সময় কারো সাথে সাক্ষাতের জন্যে উপযুক্ত সময় নয়। সুতরাং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এই তিন সময়ে কারো ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। এই তিনটি সময় ছাড়া অন্য সময়ও কারো ঘরে যাওয়ার বেলায় ভালো করে ভেবে দেখে নেওয়া উচিত যে, তাতেকরে আরো বিরক্তির কারণ ঘটবে নাতো! আর তা জানার পর প্রথমে সালাম জানিয়ে কারো গৃহে প্রবেশ করবে। এটা ব্যক্তির বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় কার কাছে যাওয়া উচিত বা উচিত নয়। যেমন মনে করুন, আপনার কোনো বন্ধু দীর্ঘ সফরের পরে গৃহে ফিরেছেন এবং সফরের ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। তখন বিবেকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়াই উচিত। তখন তার কাছে যাওয়া উচিত নয়।

---

[১৯৯] আবু দাউদ।

[২০০] সূরা নূর : ৫৮।

অন্য একটি উদাহরণ নিন। মনে করুন আপনি আপনার কোনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান; কিন্তু আপনার বন্ধু তখন পরিবারের লোকদের সাথে যদি আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, স্পষ্টত তাতে পুরুষ ও মহিলা সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন। সুতরাং সে সময় তাঁর কাছে যাওয়া আপনার পক্ষে উচিত নয়।

কখনও কখনও এমনটিও হয় যে, আপনি ভেবেচিন্তে সঠিক সময়েই কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন; কিন্তু গিয়ে দেখেন যে, আপনার বন্ধু তার নিজের লোকদের মধ্যে রয়েছে বা বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার ভদ্রতা হবে যে, আপনি চুপচাপ ফিরে আসবেন যেন কেউ আপনার আগমনটাই টের না পায়। নিচের আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

"হে ঈমানদাররা! নিজের ঘর ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না গৃহস্থদের অনুমতি পাও এবং তাদের প্রতি সালাম না পাঠাও। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা। আশা করা যায় তোমরা এর প্রতি লক্ষ রাখবে আবার ওখানে যদি কাউকে না পাও তাহলে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যদি তোমাকে বলা হয় যে 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যেও। এটা তোমাদের জন্যে পবিত্র পন্থা। এবং যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা খুব ভালো করে জানেন।"[২০১]

এই ছিল মোটামুটি কয়েকটি ধরনের নির্দেশাবলি। অন্যান্য ব্যাপারগুলো মানুষের বিচার ও বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মানুষকে তার আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার তাগিদ করা হয়েছে এবং কারো বাড়িতে যাওয়ার আগে ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, তার যাওয়ার ফলে কারো কোনো অসুবিধা হবে কি-না, যদি এমন কোনো আশঙ্কা থাকে তাহলে না যাওয়াই উচিত। পবিত্র কুরআনের মূলত এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারো ঘরে যাতায়াতের জন্যে এটা হচ্ছে নিম্নতম শর্ত। এমনকি ঘরে প্রবেশের আগে স্বামীকেও স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে এবং তা করা স্বামীর জন্যে উত্তম। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন–

"এটাই উত্তম যে, ঘরে প্রবেশ করার আগে স্বামী স্ত্রীকে আহ্বান জানাবে, হঠাৎ করে ঢুকে পড়বে না, যেন সে তাকে এমন অবস্থায় না পায় যে অবস্থায় দেখা তার পছন্দনীয় নয়।"

মা এবং বোনদের ঘরেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে তা তারা সবাই একই গৃহেই থাকুক না কেন। এই অনুমতি গ্রহণ করা শুধু উত্তমই নয়; বরং একান্ত প্রয়োজনীয়ও। হযরত আবদুল্লাহ বিন সামুদের অভিমত হচ্ছে "মায়ের

---

[২০১] সূরা নূর : ২৭-২৮।

কাছে যাওয়ার আগে অনুমতি নেওয়া জরুরি।" আতা বিন আবিমাস্ রাব্বাহ (রা) হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমাদের পৃষ্ঠপোষকতাধীনে কয়েকজন এতিম বোন্ রয়েছে। তারা আমাদের সাথেই থাকে, তাদের কাছে যাওয়ার জন্যেও কি অনুমতি নিতে হবে?" ইবনে আব্বাস জবাবে বলেন– "হ্যাঁ।" ইবনে রাব্বাহ বললেন, "আমাকে অনুমতি ছাড়াই যেতে দিন।" কিন্তু আব্বাস তা প্রত্যাখ্যান করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাদের উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?" ইবনে রাব্বাহ বললেন, "কখনো না, কখনো না।" এরপর ইবনে আব্বাস বললেন, "তাহলে তাদের অনুমতি নিয়ে যেও।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন– "আনুগত্য কি তোমার পছন্দ নয়?" ইবনে রাব্বাহ বললেন– 'হ্যাঁ'। এরপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি অনুমতি নিয়েই ভেতরে যেও।"

বলাবাহুল্য, যেখানে স্ত্রী, মা ও বোনের ঘরে প্রবেশের জন্যে এতোটা কড়াকড়ি আদেশ সেখানে অপর স্ত্রীলোকদের ঘরে ঢোকার ব্যাপারে যে কড়া বিধিনিষেধ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি; কিন্তু কিভাবে অনুমতি নেওয়া হবে? অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে প্রিয়নবীর শিক্ষা হচ্ছে– অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার ডানে অথবা বামে দাঁড়িয়ে সালাম জানাবে এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইবে। যদি ঘর থেকে কোনো জবাব না আসে তাহলে ফিরে চলে আসবে।

তবে আজকের যুগে পল্লী অঞ্চলে সেই ব্যবস্থা অনেকটা চলতে পারে। কারণ পল্লীতে দরজা প্রায় সারা দিনই খোলা থাকে এবং কোনো কোলাহলও থাকে না; কিন্তু শহরের ঘরবাড়িতে দরজা প্রায় সারা দিনই বন্ধ থাকে তাই শুধু সালামের শব্দ ভেতর পর্যন্ত নাও পৌঁছতে পারে। এজন্যে এ ধরনের অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনাকারীকে ঘরের দরজায় তিনবার টোকা দিতে হবে, যদি 'কলিং বেল' থাকে তাহলে কলিং বেল টিপতে হবে। এভাবে তিনবার দরজায় টোকা দান বা তিনবার কলিং বেল টেপার পর অনুমতি পেলে তো ভালো– নয়তো ফিরে যেতে হবে।

নারীর রূপ-লাবণ্য ও সাজসজ্জা

নারীর রূপচর্চা ও সাজসজ্জার ব্যাপারে ইসলাম কোনো বয়সের বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। স্ত্রী তার স্বামীর পছন্দমতো পোশাক পরিচ্ছদ, সুগন্ধি দ্রব্যাদি এবং অলংকারাদি ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, নারীর নারীসুলভ মানবিকতাই হচ্ছে তার আসল রূপসৌন্দর্য এবং উৎকৃষ্ট অলংকার। নারীর নারীসুলভ মানসিকতাই হচ্ছে তার আসল রূপসৌন্দর্য এবং উৎকৃষ্ট অলংকার। নারীর নম্রতা, শিষ্টতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সততাই হচ্ছে তার প্রকৃত গুণাবলি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

"স্মরণ রাখ আল্লাহর নিদর্শনাবলি এবং জ্ঞানবুদ্ধির যা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুন্দরতর এবং ওয়াকিবহাল।"[২০২]

এই জ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যার দাবি হচ্ছে যে, তার মধ্যে নম্রতা ও ভদ্রতার বৈশিষ্ট্য বিকশিত হবে এবং তার জ্ঞানবুদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটবে। এটাই হচ্ছে নারীর আসল রূপ, আসল ভূষণ। তার চরিত্রই তার সর্বোত্তম অলংকার। এ ব্যাপারে মহান ওমর বিন আব্দুল আজীজের বোন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন– "যে মনে খোদাভীতির অলংকার থাকে, অন্য কোনো অলংকার তার মোকাবেলা করতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তিই কোনো না কোনো গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত থাকে। আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে দানশীলতা এবং দয়া। আল্লাহর শপথ, ক্ষুধার সময় সুস্বাদু খাদ্য আর শীতল পানীয় গ্রহণের চেয়ে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হচ্ছে দয়া, সহানুভূতি ও ভালোবাসা দান করা। খোদার কসম, আমি আজ পর্যন্ত অতি মূল্যবান কোনো জিনিসের দিকে আকর্ষণ বোধ করিনি; কিন্তু সৎকর্ম এবং খোদাভীতির ব্যাপারে আমি ঈর্ষাকাতর থাকি। আমার শ্রেষ্ঠ কামনা-বাসনা এই যে, আমিও যেন পুণ্যবতী এবং খোদাভীরু হতে পারি; কিন্তু এই অমূল্য সম্পদ শুধু কি কামনা করলেই পাওয়া যেতে পারে?"

বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, এই কথাগুলো বলেছেন একজন মহান রাষ্ট্রনেতা ও মুসলিম জাহানের সর্বজনপ্রিয় খলিফার বোন। তিনি চাইলে দুনিয়ার যেকোনো মূল্যবান জিনিস, যেকোনো অলংকার অনায়াসে অর্জন ও ব্যবহার করতে পারতেন। সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মূল্যের সৌখিন বস্ত্র, হীরা-মুক্তার স্তূপ তাঁর পদচুম্বনের জন্যে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু এসব বিলাসদ্রব্যাদি ছিল তাঁর কাছে আবর্জনার মতো তুচ্ছ। এসব দ্রব্যাদির দিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণও তিনি বোধ করেননি। তিনি আসলে প্রকৃত অলংকার খুঁজে বের করেছিলেন– তা হচ্ছে সততা ও খোদাভীরুতা। তাই তিনি বলেছেন– "যে মনে খোদাভীতির অলংকার থাকে, অন্য কোনো অলংকার তার মোকাবিলা করতে পারে না।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের বাহ্যিক রূপচর্চা ও সাজসজ্জাকে 'মুবাহ' অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন বলা হয়ে থাকে। যে নারী তার আসল রূপ অর্থাৎ মানবিক গুণাবলিতে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে, তার কাছে এসব বাহ্যিক রূপচর্চা ও ঠুনকো সাজসজ্জাকে বড়ই অর্থহীন মনে হবে। সুতরাং কোনো মেকিপনা ও ঠুনকোপনার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না।

---

[২০২] সূরা আহযাব : ৩৪।

পোশাকের সৌন্দর্য

নারীকে তার ব্যক্তিগত অবস্থা মোতাবেক পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। তার আর্থিক অবস্থা যদি রেশমি বস্ত্র পরার অনুমতি দেয় তাহলে তা সে পরতে পারে। (উল্লেখ যে, ইসলামের বিধান মোতাবেক নারীর জন্যে রেশমি বস্ত্র ও সোনা ব্যবহার করা বৈধ করা হয়েছে)। এভাবে অন্যান্য কাপড়ও সে ব্যবহার করতে পারে। একথা মনে রাখা উচিত যে, মানুষের প্রকাশ্য রূপ তার অভ্যন্তরীণ রূপেরই পরিচয় বহন করে। সুতরাং নারীর বস্ত্র তার ক্রয়ের সময় তার মান ও বর্ণের দিকে বিশেষ লক্ষ দেওয়া উচিত যাতে তা শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এর অন্যথা, যদি নিজের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করে অথবা এমন চটকদার রং বাছাই করে যা তার দ্বীনী আগ্রহের পরিপন্থি হয় বা যে পরিচ্ছদে তার লজ্জা ও শালীনতা বজায় না থাকে, যে পোশাক পরলে তার শারীরিক কাঠামো বা বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে সেই পরিচ্ছদ শুধু যে শরীয়ত বিরোধী তাই নয়; বরং তাতেকরে সেই নারীর চারিত্রিক অধঃপতন এবং জ্ঞান-বুদ্ধির দেউলিয়াপনারই প্রমাণ স্পষ্ট হয়। এ ধরনের আঁটসাঁট বা চটকদার পোশাক সমাজে যতই প্রচলিত বা যতই প্রশংসনীয় হোক না কেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ঘৃণ্য পোশাক বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম নারীকে সোনার অলংকার ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছে। এ ব্যাপারে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

"একবার (সম্রাট) নাজ্জাশী প্রিয়নবীর খেদমতে কয়েকটি অলংকার উপহার পেশ করেন, তার মধ্যে সোনার একটা আংটিও ছিল এর মুক্তোটি ছিল হাবসার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করেন এবং তার নাতি আমামা বিনতে জয়নবকে ডাকলেন এবং স্নেহের সঙ্গে তার আঙুলে পরিয়ে দেন।"

সোনাসহ রুপা, ইয়াকুত, জমরুদ, আশমাস প্রভৃতি হীরা-মুক্তা ব্যবহারের অনুমতিও নারীর রয়েছে। কেননা আল্লাহ এসব পদার্থের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে কোনো ঘোষণা দেননি। এ ছাড়া নারী অন্যান্য হীরা-মুক্তা ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারে এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াতটির উল্লেখ করা যায়–

"উভয় (সমুদ্র) থেকে তোমরা তাজা মাংস (মাছ) অর্জন করে থাক এবং ব্যবহারের জন্যে অলংকারের সামগ্রী বের করে থাক।"[২০৩]

---

[২০৩] সূরা ফাতের : ১২।

বলাবাহুল্য, সমুদ্র থেকে যেসব মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী উত্তোলন করা হয় তার মধ্যে হীরা, মুক্তা ইত্যাদিও শামিল রয়েছে। যেমন এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

"এসব সমুদ্র থেকে মণিমুক্তো এবং আরজান (হীরা) বের হয়ে থাকে।"[২০৪]

সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার

নারী সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে এর ব্যবহার করা উচিত নয়; কিন্তু স্বামীর উপস্থিতিতে এর ব্যবহার উত্তম। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "হযরত উসমান বিন মাসউনের স্ত্রী আগে সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহার করতেন, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেন। একদিন এই অবস্থাতেই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে যান। হযরত আয়েশা (রা) তাকে এই অবস্থায় দেখে অত্যন্ত বিস্মিতা হন এবং তাঁকে সুগন্ধ দ্রব্যাদি বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কারণ তখন তাঁর স্বামী কাছে ছিলেন না। তিনি প্রশ্ন শুনে বললেন "ওগো উম্মুল মোমেনীন! উসমানতো সংসার বর্জনের তালে আছে। সংসারের দিকে পরিবার-পরিজনের দিকে তার কোনো লক্ষ্য নেই।" একথা শুনে হযরত আয়েশা প্রিয়নবীর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। সুতরাং এরপর একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের দেখা পেয়ে বললেন–

উসমান! তুমিতো মুমিন এবং তৌহিদবাদী তাই না?"

উসমান বললেন–

"ওগো আল্লাহর রাসূল! এতে সন্দেহ কি?

এ কথা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

"আচ্ছা, তাহলে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেপুরের দিকে লক্ষ্য এবং আগ্রহ দেখাও।"[২০৫]

ইমাম শওকানী এই হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন "তার সুগন্ধাদি বর্জনে হযরত আয়েশার বিস্ময় এ কথারই প্রমাণ যে, সধবা স্ত্রীদের জন্যে এর ব্যবহার মুস্তাহাব এবং মুস্তাহাসান।"

---

[২০৪] সূরা রহমান : ১২।
[২০৫] হাদিস।

সাজসজ্জার পদ্ধতি

সাজসজ্জার দু'টি প্রচলিত রীতিনীতি রয়েছে।

১. একটি হচ্ছে কৃত্রিম পদ্ধতি। যার মাধ্যমে শরীরের বিশেষ কোনো অংশকে ক্ষত করে, বা কাটাকাটি করে চিত্র বা রেখা অঙ্কন করা। অথবা অন্য কোনোভাবে শরীরের স্বাভাবিক ত্বক নষ্ট করে কৃত্রিম কিছু লাগানো। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা কোনোক্রমে বৈধ নয়।

২. স্বাভাবিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে সুরমা, খেজাব এবং অন্যান্য আধুনিক প্রসাধন দ্রব্যাদির ব্যবহার করার কোনো বাধা নেই।

কৃত্রিম পদ্ধতি

রূপচর্চা ও সাজসজ্জার কৃত্রিম পদ্ধতি যেমন দাঁতের সজ্জার জন্যে দাঁতকে চিরে তার মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করা বা দাঁতকে ছোট করা অথবা শরীরের অন্য কোনো অংশকে কেটেকুটে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হারাম। যেকোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা বলতে বাধ্য হবেন যে, এ ধরনের প্রয়াস অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচয়বাহক। বস্তুত স্বভাব-সৌন্দর্যের সাথে এর বিন্দুমাত্র মিলও নেই, (অথচ আজকাল তথাকথিত বিউটি পার্লারগুলোতে এ ধরনে বিদঘুটে রূপচর্চার ব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হয়।)

নিঃসন্দেহে, ইসলাম, নারীদের রূপচর্চা ও সাজসজ্জায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে না। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম নারীর রূপচর্চা ও সাজসজ্জাকে শুধু পছন্দই করে না; বরং তাকে উৎসাহিতও করে এবং এই বিষয়টি ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও; কিন্তু রূপচর্চা ও সাজসজ্জার নামে এমন সীমালঙ্ঘন করা যাতে শরীরকেও বিগড়ে দেওয়া হবে– তা কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কুৎসিত প্রবণতা মহত্তম উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। সুতরাং এই কুপ্রথার অবসান একান্তই অপরিহার্য।

তবে, কারো শরীরের কোনো অংশে যদি কোনো অবাঞ্ছিত পরিবৃদ্ধি ঘটে বা তার স্বাভাবিক দেহকাঠামোকে বিগড়ে দিচ্ছে বা তার মানবিক পীড়ার কারণ ঘটাচ্ছে তাহলে চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কেউ কোনো অঙ্গের এই অংশ কেটে ফেলে তাহলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা তাতেকরে ব্যক্তির জীবন তিক্ততায় ভরে ওঠার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এমন কোনো আপদ থেকে মুক্তির জন্যে কেউ যদি তার কোনো অঙ্গের বাড়তি অংশ কেটে ফেলে তাহলে

তাতে ইসলাম কোনো বাধা দেয় না। কারণ ইসলাম মানুষের দৈহিক ও মানসিক শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে চায়। ইসলাম সহজ-সরলতারই নাম; কিন্তু কেউ বিনা কারণে শুধু বিকৃত রূপচর্চার জন্য অঙ্গহানি করতে পারবেন না। যারা এমন কর্ম করে তারা আসলে তাদের মানসিক দুর্বলতারই প্রমাণ পেশ করে। ইসলাম কোনো অবস্থাতেই এ ধরনের অপকর্মের অনুমতি দিতে পারে না।

'নায়নূল আওতার' এ সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে– "দুই কিংবা চারটি দাঁতের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করা যেমন বৃদ্ধারা এবং প্রৌঢ়ারা নিজেদের বয়স কম দেখানোর জন্যে এবং দাঁতকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের শূন্যতা ছোট মেয়েদের দাঁতে দেখা যায়। কিন্তু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মহিলারা দাঁত বড় হয়ে গেলে পরে এমনটি করে। ইমাম রাযীর মতে এটা একটা হারাম কাজ।"

স্বাভাবিক পদ্ধতি

রূপচর্চা ও সাজসজ্জার স্বাভাবিক পদ্ধতি বলতে আমাদের অর্থ হচ্ছে সুরমা, খেজাব এবং অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্যাদির মাধ্যমে কৃত ব্যবস্থাবলি। এ ধরনের দ্রব্যাদি ব্যবহার কোনো আপত্তি নেই। যদিও এসব আল্লাহর প্রকৃত সৃষ্টির রূপ পরিবর্তন করে তবুও তা অবৈধ নয় কারণ এই পরিবর্তন স্থায়ী নয়; বরং সাময়িক এবং খুব শিগগিরই অথবা কিছুক্ষণ পর তা মিলেমিশে মিটে যায় এবং চেহারা আসল রূপ ধারণ করে। 'নায়নুল আওতার'-এর গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে বলেন–

"বলা হয়েছে হারাম শুধু ঐসব জিনিসের ব্যবহার যা স্থায়িভাবে অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তা যদি স্থায়ী অবশিষ্ট থাকার মতো না হয় যেমন– সুরমা, খেজাব ইত্যাদি তাহলে ইমাম মালেক এবং অন্যান্য উলামাদের মতে তার ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।"

নারীর সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্যেই হওয়া উচিত

উপরে রূপচর্চা ও সাজসজ্জার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা কেবল স্বামীকে আনন্দিত করার জন্যে এবং তার মনে নিজের জন্যে ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে; বস্তুত নারীর রূপচর্চা এবং সাজসজ্জার উদ্দেশ্য কেবল এটাই এবং শুধু এটাই হওয়া উচিত। এর বিপরীত কোনো মহিলা যদি পরপুরুষকে দেখানোর জন্যে রূপচর্চা ও সাজসজ্জা করে থাকে তাহলে ইসলাম তার অনুমতি দেয় না। কারণ তা বিশৃঙ্খলা ও নোংরামির মাধ্যমে হয়ে থাকে। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ কেবল সতী, চরিত্রবান এবং পরহেযগার নারীদেরকেই পছন্দ করেন। আমরা ইতোমধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করে এসেছি যে, নারী তার কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে আর কোনোটা পারবে না।

মেলামেশা

আধুনিক যুগে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এক সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা যেমন জটিল তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সত্যিকথা হচ্ছে নারী যদি সতী ও পবিত্র থাকতে চায় তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধি কখনো এই অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন করতে পারে না। কারণ, আমরা যাকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বলছি, তা দৃষ্টি বিনিময়, সামনাসামনি মুখোমুখি হওয়া আর তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা ছাড়া আর কিছু?

ঘরোয়া মেলামেশা

(ক) কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তিকে তার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারে না। সে স্বাগত জানাবার জন্যেও কোনো পরপুরুষের কাছে যেতে পারবে না। তবে একান্ত অপরিহার্য কোন প্রয়োজনে সে পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে এবং এ ব্যাপারে তার স্বামীও যেন অবহিত থাকে অথবা আগত লোকটি এমন হবে যে, তার ঘরে আপনজনদের মতো প্রায় যাতায়াতকারী হয়। যেমন পল্লী অঞ্চলে হয়ে থাকে।

(খ) স্ত্রী এবং স্বামীর নিকটাত্মীয়দের উচিত তারা যেন বেশি যাতায়াত না করে। আর যদি প্রয়োজনবোধে এসেও থাকে তাহলে যেন বিনা কারণে বেশিক্ষণ বসে না থাকে। কারণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"শোন! পুরুষ নারীদের কাছে যেতে বিরত থাকবে।" সাহাবা জানতে চাইলেন, "আল্লাহর রাসূল দেওরের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেওর তো মৃত্যু!"

...বীর এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর কাছে দেওরের যাতায়াত করা ... কেননা স্বামী ও স্ত্রীর এই নিকটাত্মীয় ঘরে প্রায় সবসময় ... তার সাথে বেশি মেলামেশা করা হয় তাহলে ... পারে। কখনো কখনো তো হত্যা বা

... বোঝা যায় যে, স্বামীর ভাই আর নিকট ... বিধি-নিষেধ রয়েছে যেখানে, সেখানে বন্ধু-বান্ধব ...র প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বাইরের মেলামেশা

আমরা আগেই বলেছি যে, নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর। এজন্যে তার বাইরে বের হওয়া সম্পর্কে কিছু দরকারী আইনবিধি থাকা আবশ্যক যেন কোনো রকমের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হতে পারে এবং তার মান-মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে। তবে নারীকে ঘরেই বন্ধ করে রাখতে হবে এমন কথা ইসলাম বলে না, কারণ ঘরের বাইরেও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ থাকতে পারে তা নারী হোক বা পুরুষ। সুতরাং কোনো নারীকে একেবারে ঘরের বাইরে বেরুতে না দেওয়া উচিত নয়। নারীও তার বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে বা নিকটাত্মীয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্যে বাইরে যেতে পারে।

মহিলারা নামায আদায়ের জন্যে মসজিদেও যেতে পারে। তবে মহিলাদের জন্যে ঘরে নামায আদায় করাটাই অধিকতর উত্তম। এ ছাড়া চিকিৎসা, বিদ্যার্জন, চারিত্রিক-নৈতিক ও আদর্শিক জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেও নারীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এমন কোনো স্থানে তাদের যাওয়া উচিত নয় যেখানে দুশ্চরিত্র গুণ্ডা-বদমাস লোকদের আনাগোনা হয়ে থাকে।

নারী তার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হাট-বাজার এবং খেত-খামারেও যেতে পারে। এভাবে প্রয়োজনের তাগিদে অন্য কোথাও যেতে বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে সত্যিসত্যিই প্রয়োজন থাকতে হবে। প্রিয়নবীর আমলে সাহাবাদের (রা) স্ত্রীরা প্রয়োজনবোধে যেকোনো জায়গায় যেতেন। ইসলামই নারীদের এই অনুমতি দিয়েছে।

থিয়েটার-সিনেমা

গঠনমূলক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধরনের নাট্যাভিনয় বা নির্দোষ সিনেমা অথবা অন্য কোনো সুন্দর স্থানে ভ্রমণ-পর্যটনের অনুমতিও রয়েছে। এখানে উল্লেখ যে, এসব বিনোদন মাধ্যমগুলো আসলে মন্দ জিনিস নয়; বরং এক শ্রেণির অসৎ লোক এসব মাধ্যমকে অশ্লীলতা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করেছে আজকাল সমাজবিরোধী লোকেরা নাটক ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এম নোংরামি ও কদর্য চিত্র তুলে ধরছে যার ফলে পুরো সমাজেই চরিত্রহী যৌন অপরাধ প্রবণতার সয়লাবে ডুবু ডুবু করছে। বিভিন্ন ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির কাজে আজকের সিনেমা-থিয়েটারসমূহ অত্যন্ত ভূমিকা পালন করছে। ফলে আজ মানবিকতা ও মানুষের চা দারুণভাবে অবক্ষয়মান। সুতরাং নীতি ও চরিত্র বিরোধী

ছায়াছবি বা নাট্যাভিনয় দেখার কোনো যৌক্তিকতা থাকতেই পারে না। অবশ্য চরিত্র গঠনমূলক বা শিক্ষামূলক পরিচ্ছন্ন ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয় দেখতে কোনো মানা নেই। কারণ ইসলামই মানুষের সৌন্দর্য ও বিনোদনপ্রীতির স্বাভাবিক আগ্রহকে অস্বীকার করে না। ইসলাম বরং নির্দোষ ও পরিচ্ছন্ন আমোদ-প্রমোদকে উৎসাহিত করে। হাদিস শরীফে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, প্রিয়নবী নিজেই হযরত আয়েশাকে হাবশীদের খেলা দেখিয়েছিলেন।

ভ্রমণকেন্দ্র ও পার্ক

আজ পর্যন্ত আমরা ইসলামে কোনো কথা শুনিনি বা পড়িনি, যাতে নারীদেরকে ভ্রমণকেন্দ্র, পার্ক বা মুক্ত আবহাওয়ায় বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রিয়নবীর আমলে নারীরা শহরের বাইরেও যাতায়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন– "আমি আমার স্বামী যুবাইরের খামার থেকে নিজ মাথায় বোঝা নিয়ে মদিনায় পৌঁছাতাম।" উলামারা এ থেকে প্রমাণ করেন যে, সংক্ষিপ্ত সফরে নারীকে বিনা মুহাররমে সফর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আজকাল আমাদের পল্লী অঞ্চলের নারীরা নিজ ঘরবাড়ি থেকে খেত-খামারে যাতায়াত করে। এতে কোনো বাধা নেই। আমার মতে-তো শহর ও পল্লীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তবে শহর এলাকায় নারীদের সাথে দুর্ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বেশিই দেখা যায়। সুতরাং এ ধরনের মন্দ পরিবেশে নারীদের বাইরে বেরুনো উচিত নয়। এমতাবস্থায় অসৎ ও অসভ্য লোকদের দমন করা এবং সামাজিক পরিবেশকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখা হচ্ছে শহর-প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব। এ ধরনের নিরাপত্তাহীন অবস্থায় প্রশাসনকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার আদেশ আল্লাহ পাক কুরআনের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রিয়নবী ﷺ-কে বলেছেন–

"যদি মুনাফেক এবং ওসব লোকেরা যাদের মনে নষ্টামি রয়েছে এবং যারা উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, যদি এসব তৎপরতা থেকে বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তোমাকে উঠিয়ে দাঁড় করাবো। এরপর তারা এই শহরে অত্যন্ত মুশকিলেই তোমার সাথে অবস্থান করতে পারবে।"[২০৬]

---

[২০৬] সূরা আহযাব : ৬০।

সাধারণ যানবাহনে

আজকাল বড় বড় শহরে সাধারণ যানবাহনের অভাবজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, ফলে নারীতো নারী এমনকি পুরুষরাও ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যায়। এমতাবস্থায় যাত্রাপথ যদি তেমন দীর্ঘ না হয় তাহলে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করাটাই ভালো অথবা আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে ট্যাক্সী, রিক্সা ইত্যাদি ভাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু যদি ভাড়া অতিরিক্ত হয় বা অন্য কোনো আর্থিক সংকট থাকে তাহলে সাধারণ যানবাহনে যাতায়াত করা যেতে পারে। সাধারণ যানবাহনে লোকজনের ভিড় থাকে বলে নারীদের যাত্রা নিরাপদ হয়– কোনো গুণ্ডা-বদমাস তাদের বিরক্ত করার সুযোগ পায় না। সুতরাং উলামারা নারীদের সাধারণ যানবাহনে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন হজের সময় ভিড়ের কারণে নারী-পুরুষের একত্র মেলা-মেশার ব্যাপারে উলামারা কোনো বিধিনিষেধ সম্পর্কে নিরবতা পালন করেছেন। পবিত্র কাবাশরীফের তওয়াফের ক্ষেত্রেও একই নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা এসব উপলক্ষে অধিক জনসমাগমের ফলে কোনো রকমের নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা থাকে না এবং কারো মনে অসৎ ভাবনাও জাগতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়
নারীর অধিকার ও দায়িত্ব

নারীর উত্তরাধিকার
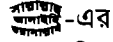
উপস্থাপনা : আমরা আগেই বলেছি যে, প্রাচীনকালে নারীর উত্তরাধিকার লাভের কোনো কল্পনাও মানুষের ছিল না। ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কোনো জিনিসের ওপরই তার উত্তরাধিকার বা মালিকানা স্বীকৃত ছিল না। উল্টো নারীকেই ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। এমনকি একাদশ শতক পর্যন্তও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্ত্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের দুশো বছর পরও অমুসলিম সমাজগুলোতে এ ধরনের জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইসলাম আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বছর পরে পনেরো 'শ সাতষট্টি সালে পাশ্চাত্যে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এর অধীনে কয়েকটি বিশেষ জিনিসের মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ থেকে অনুমান করে দেখুন যে, ইসলাম যেখানে পনেরো 'শ বছর আগে নারীজাতির পুরো অধিকার, মালিকানা ও উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে ইসলামের এক হাজার বছর পর পাশ্চাত্যে নারীকে নামেমাত্র যে অধিকার দেওয়া হলো তাও খুব সীমিত পর্যায়ের এবং আংশিক।

একথা তো সম্ভবত প্রত্যেকেই জানেন যে, আরবরা নারীকে উত্তরাধিকার অর্জনের যোগ্যই মনে করতো না। কেননা নারী ছিল দুর্বল, ঘোড়ার পিঠে চাবুক হানিয়ে ঝড়ের তেজে ধাবমান হওয়ার শক্তি তার ছিল না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করাও ছিল তার পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধে বিজয়লব্ধ ধনসম্পদ কুক্ষিগত করতেও সে ছিল অক্ষম, সুতরাং এসব কারণে তারা নারীকে ওয়ারিশ সূত্রের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখে। আরবসমাজে কেবল ছেলেদেরকেই উত্তরাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হতো, কেননা তারা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শত্রুর দাঁতভাঙা জবাব দিতে সক্ষম ছিল। অতএব অন্ধকার যুগের আরব-সমাজে উত্তরাধিকার পাওয়ার প্রথম যোগ্য বড় ছেলে। এরপর ক্রমিকভাবে অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকার স্বত্ব বণ্টন করা হতো; কিন্তু এমন ছেলে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম নয় তাকেও উত্তরাধিকার দেওয়া হতো না। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে কেবল কন্যা সন্তানই রেখে যেত তাহলেও তার উত্তরাধিকার স্বত্ব তার মেয়েরা পেত না; বরং সবকিছু চাচাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো।

ইসলামই সর্বপ্রথম মেয়েদের উত্তরাধিকার দান করে

অন্ধকার যুগে আরব সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা সম্পর্কিত বিষয়াবলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি; কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্ধকার যুগের যাবতীয় অন্যায়-অবিচার ও অসাম্যের অবসান ঘটানো হয় এবং মেয়ে তথা নারীজাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওহুদ যুদ্ধের পর হযরত সায়াদ বিন রবী (রা)-এর স্ত্রী প্রিয়নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন "ওগো আল্লাহর রাসূল! সায়াদ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি দুজন বিবাহযোগ্য মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর চাচা সব সম্পত্তি দখল করলেন। এখন ওদের বিয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে যা সম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়।"

প্রিয়নবী ﷺ একথা শুনে বললেন– আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। এর পরই উত্তরাধিকার সম্পর্কিত এই আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ বলেন–

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। যদি (মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ) দুয়ের থেকে বেশি হয় তাহলে তাদেরকে 'তরকা'র দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হোক, আর যদি একটি মেয়েই ওয়ারিশ হয় তাহলে অর্ধেক 'তরকা' আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে তার মাতা-পিতার প্রতিজনকে 'তরকা'র ৬ষ্ঠ অংশ পাওয়া উচিত আর যদি সে সন্তান না রেখে যায় এবং শুধু মাতা-পিতাই যদি তার ওয়ারিশ হয় তাহলে মাকে তৃতীয় অংশ দেওয়া হোক, আর যদি মৃত ব্যক্তির ভাই বোনও থাকে তাহলে মা ৬ষ্ঠ অংশের অধিকারিণী হবে। (এসব অংশ সে সময় লেখা হবে) যখন মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হবে। তোমরা জান না যে, তোমাদের মাতা-পিতা এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে যে উপকারের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর রয়েছে! এসব অংশ আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিঃসন্দেহে সব বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু ছেড়ে গেছে তার অর্ধেক অংশ তোমরা পাবে যদি সে সন্তানহীনা হয়। আর যদি সন্তান থাকে তাহলে 'তরকা'র এক-চতুর্থাংশ তোমাদের অবশ্য তার ওসীয়ত যদি পুরো করে দেওয়া হয় আর তার ঋণ যদি আদায় করে দেওয়া হয়– এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের 'তরকা' থেকে এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাকে; নয়তো যদি সন্তান থেকে থাকে তাহলে তাদের (স্ত্রীদের) অংশ হবে অষ্টমাংশ, অবশ্য তোমাদের কৃত ওসীয়ত পূরণ করার এবং তোমাদের যে ঋণ রয়েছে তা আদায় করার পর।

আর যদি পুরুষ অথবা নারী (যার মীরাস বণ্টনের অপেক্ষায় রয়েছে) নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে; অবশ্য তার এক ভাই বা এক বোন যদি বর্তমান থাকে তাহলে ভাই এবং বোন প্রত্যেকেই ষষ্ঠাংশ পাবে, আর ভাই-বোন যদি একাধিক থাকে তাহলে মোট 'তরকা'র এক-তৃতীয়াংশের তারা সবাই শরিক হবে যদি তার কৃত ওসীয়ত পূরণ করা হয় আর যে ঋণ ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করে দেওয়া হয়– এই শর্তে যে, তা যেন ক্ষতিকর না হয়। এই আদেশ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত জ্ঞানী, সর্বদর্শী ও পরম সহনশীল।"[২০৭]

যখন এই আয়াত নাযিল হয় তার পরপরই প্রিয়নবী ﷺ সেই দুটি মেয়ের চাচাকে ডেকে বললেন–

"সায়াদের উভয় মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাকে অষ্টমাংশ তারপরে যা অবশিষ্ট বাঁচবে তা তোমার।"

দুনিয়ার ইতিহাসে মেয়েদের উত্তরাধিকার দখলের এটাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই প্রাপ্য।

মেয়েদের তথা নারীজাতির এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিয়নবীকে কত যে সংগ্রাম-সাধনা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা যেকোনো সুবিচারকামী বিপ্লবী চিন্তাবিদ অনুমান করতে পারেন। কত শতাব্দী ধরে প্রচলিত প্রথা ও অন্যায় অত্যাচারের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাকে বদলে দেওয়া সহজ কথা ছিল না। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহর আদেশ মোতাবেক অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপসহীন জেহাদ করতে থাকেন। এভাবে তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার পর দুনিয়াতে প্রথমবারের মতো নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন। এর মাধ্যমেই নারীজাতির সত্যিকারের মুক্তির পথ সুনিশ্চিত হয়।

ইসলামের এই বিপ্লবী সাফল্যের পেছনে যেমন রয়েছে প্রিয়নবীর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম-সাধনা, তেমনি নারীদের মুক্তি অর্জনের এই নতুন আদর্শ বাস্তবায়নে গোটা সমাজ-পরিবেশটাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অনেক পুরুষতো এই আদেশ শুনে শঙ্কা প্রকাশ করে পরস্পর নানারকম কথাবার্তা বলতে লাগলো। কেউ কেউ বললো– "কি অবাক কথা। এখন স্ত্রীরা চতুর্থাংশ পাবে, মেয়েদেরকে অর্ধেকাংশ দিতে হবে আর ছোট ছেলেপুলেদের 'তরকা'র অংশ দিতে হবে। অথচ তারা কেউ যুদ্ধ করে না আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদও কুড়িয়ে আনে না।" এরপর এসব ব্যক্তি নিজেরাই ভেবেচিন্তে বললো– "থাক থাক, আপাতত চুপচাপ সব

[২০৭] সূরা নিসা : ১১-১২।

কিছু শুনে যাও। সময় কাটার সাথে সাথে এসব কথা সবাই ভুলে যাবে অথবা এ ধরনের আইন আদেশগুলোতে পরিবর্তন করা হবে।" কিন্তু তাদের সেই ধারণার বিপরীত প্রিয়নবী ﷺ নারীদের অধিকার দানের কথা যেমন ভুললেন না. তেমনি নারীদের অধিকার সংক্রান্ত আইন-আদেশে কোনোরকম সংশোধনও করেননি; বরং বরাবর তিনি এসব আইন-আদেশকে কার্যকরী করেন এবং লোকদেরকে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্যে বাধ্য করেন। প্রিয়নবীর সেই ইসলামী বিপ্লব যে কতো সার্বজনীন ও সর্বাত্মক ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে; কিন্তু আজ পর্যন্ত নারীদের অধিকারসংক্রান্ত ইসলামী আইন ও আদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে কার্যকরী হচ্ছে। যুগ ও পরিবেশ বদলেছে সত্যি; কিন্তু কোনো যুগের কোনো পরিবেশে ইসলামের আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি কখনোই। ইসলাম যে সর্বমানবিকতার চিরন্তন ও স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা এটা তারই অন্যতম বাস্তব দৃষ্টান্ত। বস্তুত আল্লাহর আদেশে প্রিয়নবী ﷺ যে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন করেন তা সর্বকালের সর্বদেশের সর্বমানবতার জন্যেই কল্যাণকর এবং অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা। কারণ এটা এই বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানুষদের স্রষ্টারই দেওয়া জীবনব্যবস্থা; এটা কোনো ভাবনাবিলাসীর খামখেয়ালিপনা নয়।

তরকায় (ত্যক্ত সম্পত্তিতে) নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি কথা :

নারীর তরকার ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে এই আয়াতটি–

"পুরুষদের জন্যে এই সম্পদে অংশ রয়েছে যা মা, বাপ এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে। তা কম হোক বা বেশি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত রয়েছে।"[২০৮]

কিন্তু মনে রাখতে হবে, নারীর অংশ ওয়ারিশদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে আর তা মৃত ব্যক্তির সাথে তার নৈকট্য ও দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এভাবে বিভিন্ন নিকটাত্মীয়দের সাথে তার স্থানও বিভিন্ন রকম হতে থাকে, নিচে আমরা তা স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

১. (ক) তরকায় বোন ভাইয়ের অর্ধেকাংশ আর তার যুক্তিপ্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত–

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।"

(খ) কিন্তু ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোনো ভাই বা বোন না থাকে এবং মেয়ে একা হয় তাহলে সে পুরো তরকার অর্ধেকাংশ পাবে। আর তার যুক্তিপ্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত–

"যদি মেয়ে একা হয় তাহলে সে তরকার অর্ধেক অংশ পাবে।"

---

[২০৮] সূরা নিসা : ৭।

(গ) আর যদি মেয়ে একাধিক হয় তাহলে তারা পুরো তরকার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ পাবে। আর তার যুক্তিপ্রমাণ হচ্ছে এই আয়াতটি–

“যদি মেয়ে দুই-এর বেশি হয় তাহলে তারা পুরো তরকার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।”

২. (ক) মায়ের উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে–

“যদি মৃত ব্যক্তি সন্তান রেখে যান তাহলে তার মাতা-পিতা তার তরকার ষষ্ঠাংশ পাবে।”

(খ) “কিন্তু যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে মা মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে।”

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থেকে থাকে তাহলে তার মা পুরো সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং বাপ দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

(গ) “যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে; কিন্তু ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মা ষষ্ঠাংশ পাবে।”

অর্থাৎ নিঃসন্তান মৃতব্যক্তির যদি ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মায়ের অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে কমে ষষ্ঠাংশ হয়ে যাবে।

৩. স্ত্রীর উত্তরাধিকার-স্বত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

“এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ‘তরকা’ থেকে এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাক। নয়তো সন্তান রেখে যাওয়ার অবস্থায় তাদের অংশ হবে অষ্ঠমাংশ এরপরে যে, তোমরা যা ওসীয়ত করেছো তা পূরণ করে দেওয়া হবে এবং তোমরা যে ঋণ রেখে গেছ তা আদায় করে দেওয়া হবে।”

মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক কেন

বাহ্যত হয়তো মনে হবে যে, ইসলাম মেয়েকে ছেলের অর্ধেক অংশ দিয়ে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেনি; কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। গোটা সমস্যাটা সম্পর্কে যাদের পড়াশোনা ও ধারণা পূর্ণাঙ্গ নয় তারাই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। একটু ভাবনা-চিন্তা করলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এটাতো জানা কথা যে, পুরুষকেই পরিবার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবার পরিজনের লালনপালন করার এবং তাদের ভালোমন্দ সবকিছু দেখাশোনা পুরুষই করে। নারীকে এই কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়া পুরুষকে নারীর মোহর আদায় ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়, বোনদের বিয়েশাদী দিতে হয় এবং উপহার উপঢৌকনও পাঠাতে হয়। বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষণের ভারটাও পুরুষের। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করাটাও পুরুষেরই কর্তব্য। অন্যদিকে বোনের ওপর ঐ ধরনের কোনো দায়িত্ব নেই, সময়ে সময়ে বোন ভাইয়ের কাছ থেকে এটা ওটা পেয়ে থাকে। বোন তার

বিয়ের পর স্বামীর মোহরও পায় এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তার অংশ থাকে। অর্থাৎ বোন বাপের বাড়িতেও অংশ পায় এবং স্বামীর বাড়িতেও অংশ পায়। অন্যদিকে ভাই কেবল একদিকেই অংশ পায়। তাছাড়া বোনের কোনো দায়দায়িত্ব নেই অথচ ভাইকে সবদিক দেখাশোনা করতে হয়, প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দিতে হয়। সন্তানাদির জন্মের পর ভাইয়ের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নারীকে কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় না।

এসব দিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে, সব ক্ষেত্রে সব দিকে সব রকমের দায়দায়িত্ব কেবল ভাইকেই পালন করতে হয়। যত পরিশ্রম যত সংগ্রাম সব ভাইকেই করতে হয়। সুতরাং এই গুরুদায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভাই যদি বোনের চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকে তাহলে সে খুব একটা বেশি পাচ্ছে তা নয়। অথচ বোন অর্থাৎ মেয়ে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাওয়ার সাথে সাথে স্বামীর কাছে আর্থিক ভরণপোষণ ইত্যাদি সব কিছুই পাচ্ছে। তাকে কারো কোনো আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতাও করতে হয় না। উভয়পক্ষ থেকে উপহারাদিও সেই পায়। এসব বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই ইসলামের এই ব্যবস্থাকে সুসম ও ইনসাফভিত্তিক বলতে বাধ্য হবেন। বস্তুত এক্ষেত্রে যদি পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশি অংশ না দেওয়া হতো তাহলে তা পুরুষের ওপর বিরাট জুলুম বলেই গণ্য হতো। সুতরাং দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের জন্যে অর্ধেক বেশি বরাদ্দ করে ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক সুবিচারই করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আধুনিক যুগে যখন নারী ও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজকর্ম করছে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে আর উপার্জন করে ব্যয় নির্বাহে সহযোগিতা করছে তাহলে এখনও কি পুরুষের অর্ধেকই অংশ পাবে? যুগের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে তরকার বন্টনেও পূর্ণ সমতা স্থাপন করা উচিত।

এ ধরনের প্রশ্ন ও মন্তব্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু প্রযোজ্য নয়। আসলে নারী আয়-উপার্জন করলেও দায়দায়িত্ব ঠিক আগের মতো এখনও পুরুষকেই পালন করতে হয়। নারী আগের মতো এখনো পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহ থেকে সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে, মোহর ও উপহারাদি পেয়ে থাকে এবং আজকাল সে যে আয়-উপার্জন করে থাকে তাও সম্পূর্ণরূপে তারই এখতিয়ারে থাকে। তার এই অর্জিত অর্থ সে কাউকে দিতে বা সে কোনো রকমের দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়; কিন্তু আগেকার যুগের মতো আজকের পুরুষকেও সবরকমের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। যুগ পাল্টালেও আসল অবস্থা ও ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং ইসলাম যে নীতি ও বিধি প্রবর্তন করেছে তা এখনো তেমনি কার্যকর থাকা জরুরি।

আসল অবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ অবগতি না থাকার কারণেই কোনো কোনো বিভ্রান্ত লোক ইসলামী আইন-বিধির সংশোধনের কথা বলে থাকেন এবং নারী-পুরুষের পূর্ণ সাম্যতার ওকালতি করেন। তারা প্রকৃতপক্ষে কথার মারপ্যাঁচে আটকে পড়েছেন। অবাস্তব যুক্তির গোলকধাঁধায় জড়িয়ে পড়ে তারা আল্লাহর কুরআনের এই আয়াতের পরিপন্থি কথা বলেন যে–

"পুরুষ নারীর ওপর দায়িত্বশীল, এই ভিত্তিতে যে, আল্লাহ এদের মধ্যে প্রত্যেককে পরস্পরের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই ভিত্তিতে যে, পুরুষ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে।"[২০৯]

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিভ্রান্ত লোকেরা মনে করে যে, "যেহেতু নারী জীবনের সব দিক ও বিভাগে কাজ করতে শুরু করেছে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আজ তারা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়; বরং তারা আজ পুরুকেই সাহায্য-সহযোগিতা করছে। এই জন্যে পুরুষকেই দায়িত্বশীল মনে করার কোনো কারণ নেই এবং যে যুগে এই আয়াত নাযিল হয়েছে সে যুগ এখন নেই। তাই এই নীতি ও আইন এখন অবশ্যই বিলুপ্ত হওয়া দরকার।"

এ ধরনের কিছু প্রশ্নের জবাব আমরা একটু আগেই দিয়েছি। এখন আমরা আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করব। আসলে আধুনিক যুগে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপনকারীদের আপত্তিতে কোনো যুক্তি নেই এবং তাদের প্রশ্ন ও আপত্তি বাস্তবের আলোকে খুবই নিষ্প্রভ প্রমাণিত হয়।

আপত্তিকারীরা এটাতো স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে পান যে, নারীরাও কাজ করছে! কিন্তু তাদের কাজের ধরন-ধারণ, তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং তাদের কাজকর্মে নিয়োজিত থাকার আনুপাতিক হার এবং কাজের মান, গুরুত্ব কোনো পর্যায়ের ইত্যাদি বুনিয়াদি প্রশ্নের জবাব একান্তই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তারা যেসব কাজ করে এবং যেসব কাজ করতে সক্ষম তা খুবই নগণ্য পর্যায়ের। তুলনামূলকভাবে একান্তই গুরুত্বহীন। তাছাড়া তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে যেসব জটিলতা, আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংশটাই অনেক বড়। এর পরিণতিতে আধুনিকা নারী উন্নত চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে আধুনিক নারী তার আত্মমর্যাদা এবং সেই সম্মান থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ছে যা সে মা ও স্ত্রী হিসেবে পেয়ে আসছিল, যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে

---

[২০৯] সূরা নিসা : ৩৪।

ইসলাম তার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিল আজ সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্জনের ফলে আধুনিকা নারী একান্ত গুরুত্বহীন এবং উপেক্ষিত জীবে পরিণত হচ্ছে। আজ আধুনিকা নারী নিজেদেরই হঠকারিতার কারণে পুরুষের ভোগ্য ও পণ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে, কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে আজ তার ব্যক্তিত্ব ধুলোয় লুটোচ্ছে। বস্তুত আধুনিক নারী আজ অভদ্র ও চরিত্রহীন পুরুষদের খেলা ও চিত্তবিনোদনের একটি তুচ্ছ মাধ্যমেই পরিণত হয়ে গেছে। ইসলাম আগের মতো এখনো এবং অনাগত ভবিষ্যতেও নারীর আসল মর্যাদা বহাল রাখতে চায়। সুতরাং ইসলামী নীতি ও আইনের সংশোধনের প্রশ্ন উঠতে পারে না। ইসলামী আইন ও নীতি ছাড়া নারী বা পুরুষ কারো অধিকার ও মর্যাদা বহাল থাকতে পারে না! বলাবাহুল্য ইসলাম গোটা বিশ্বমানবতার সর্বকালের শাশ্বত প্রয়োজন। এর প্রয়োজন কোনো দিন কোনো যুগে শেষ হবে না।

কুরআনের আয়াত আসলে ইসলামের সামাজিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তার স্পষ্টিকরণ হিসেবেই নাযিল হয়েছে যা কোনো পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে বুনিয়াদি নীতি মোতাবেক পুরুষই হবে পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল। এটা একান্তভাবেই স্বভাবসম্মত কথা। পুরুষই ঘরবাড়ি ও পরিবারের সব প্রয়োজন পূরণ করবে এবং এ ব্যাপারে পুরুষকেই সবার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটাই আর তার আভ্যন্তরীণ অর্থ সেই মানসিক বিধির স্পষ্টিকরণের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারী শিক্ষা

উপস্থাপনা

সন্তানের কাছে যদি কোনো ধন-সম্পত্তি না থাকে তাহলে তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের পুরো দায়িত্ব পিতার ওপর ন্যস্ত থাকবে। আর এই দায়িত্ব শুধু খাওয়ানো পরানো পর্যন্তই সীমিত থাকবে না; বরং সন্তানদের লিখিয়ে পড়িয়ে নীতিতে-চরিত্রে সত্যিকারের ভদ্র মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলাও তার দায়িত্ব, যাতেকরে তারা জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যথার্থভাবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। যদি কোনো পিতা তাঁর এই কর্তব্য পালনে কোনো রকমের অবহেলা করে তাহলে প্রিয়নবীর পবিত্র হাদিস মোতাবেক তিনি পাপের ভাগী হবেন।

প্রিয়নবী বলেছেন–

"মানুষের পাপী হওয়ার জন্যে একথাই যথেষ্ট যে, যাদেরকে সে খাওয়ায় তাদেরকে নষ্ট করে দেয়।" অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক যাদেরকে লালনপালন করে।[২১০]

ইসলাম পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের ওপর এতো বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় থেকেও উত্তম বলে ঘোষণা করেছে। যেমন, প্রিয়নবী বলেছেন–

"সবচেয়ে উত্তম দীনার (মুদ্রা)– যা মানুষ ব্যয় করে সেই দীনার যা সে নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের জন্যে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে নিজের ঘোড়ায় চেপে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে নিজের সাথিদের মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।"[২১১]

আবু কালাবা এই হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন– "যেহেতু হাদিসে সর্বপ্রথম পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের কথা বলা হয়েছে এজন্যে যারা নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্যে ব্যয় করে 'আল্লাহ্ তাদের আয় উপার্জনে সমৃদ্ধি দেবেন এবং তাদেরকে অনটন ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।"

পরিবার-পরিজন তথা সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করার উপকারিতা সম্পর্কে প্রিয়নবীর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এ সম্পর্কে অল্প বিস্তর জ্ঞান সবারই থাকার কথা। সুতরাং আমরা আর বিস্তারিত করছি না। আর এমনিতেও প্রতিটি ব্যক্তি তার সন্তানদের জন্যে স্নেহ-ভালোবাসাবশত ব্যয় করেই থাকে। এ পথে যত দুঃখ-বিপদ ও সমস্যা আসে সে তা হাসিমুখে সহ্য করে, কারণ এর সম্পর্ক ব্যক্তির হৃদয় ও আবেগ-অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। হৃদয় ও আবেগের এই ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে সে সবসময় প্রস্তুত থাকে। এটা মানুষের স্বভাব। দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি খুব মুশকিলেই পাওয়া যাবে যে তার স্বভাবের এই ডাকে সাড়া দেবে না। আর লাখের মধ্যে দু' একজন লোক পাওয়া গেলেও তারা হিসেবে পড়ে না। সুতরাং দেখা যায় যে, ব্যক্তি ধনী হোক বা দরিদ্র নিজের আয় উপার্জন মোতাবেক নিজের পরিবার ও সন্তানদের জন্যে ব্যয় নির্বাহ করে।

---

[২১০] আবু দাউদ-নাসাঈ-হাকেম।
[২১১] মুসলিম, তিরমিযী।

ছেলে-মেয়ে উভয়ের সমান গুরুত্ব

ইসলাম এসেছে অন্ধকার যুগের কঠিন বুক বিদীর্ণ করে। গভীর সমাচ্ছন্ন পরিবেশে স্নিগ্ধ আলোর শিখা হয়ে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় চারদিকে। তখনো অন্ধযুগের ধ্বংসস্তূপ থেকে কখনো কখনো ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেয়ে উঠছিল। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিল অন্ধকারের আবছা-অবশেষ। এমনকি কোনো কোনো আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানও অন্ধকারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করে উঠতে পারেনি। তখনো অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা কন্যাসন্তানের জন্মে দারুণ দুঃখিত হয়ে পড়তো। তখন সারা দুনিয়ার মতো আরবের কাছেও মেয়ে বা নারীর কোনো মূল্য বা মর্যাদা ছিল না। মেয়ের জন্মে তারা যেমন নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে পড়তো তেমনি ছেলের জন্মে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। তারা অনেক সময় তাদের কন্যাসন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে স্বস্তির শ্বাস নিতো। ভেবে দেখুন, সেই সময় সেই পরিবেশে মেয়ের জন্মটা তাদের কাছে কতোটা অবাঞ্ছনীয় ছিল। সেই যুগের লোকদের এই ঘৃণ্য মানসিকতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে–

"আর যখন এদের মধ্যে কাউকে মেয়ে জন্মেছে বলে খবর দেওয়া হয় তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যায় এবং সে বিষ পান করার মতো হয়ে যায়। এই খবরে যে লজ্জার রেখাপাত করে তার কারণে লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় আর ভাবে যে, অপমানের সাথে মেয়েকে রেখে দেবো, নাকি মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেবো? কি মন্দ সিদ্ধান্ত এসব লোক নিয়ে থাকে।'[২১২]

ইসলাম এসে যুগ-যুগান্তরের প্রতিষ্ঠিত এসব বাতিল ধারণা ও বিভ্রান্তিকে সমূলে উৎখাত করে, মানুষের মন-মগজকে কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র করে, ঘরে-বাড়িতে নারীর স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করে, তার অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টন করে, মহাজীবনের অব্যাহত অভিযানে তাকেও সহগামিনীর সম্মান দেয়, পিতা, স্বামী এবং অন্যান্যদের ওপর তার অধিকার ঘোষণা করে, তার জন্যে সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দেয়। মেয়েদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী ঘোষণা করেন–

"যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিছু মেয়ে দান করেছেন, তারা যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তারা ওদের জন্যে জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।"[২১৩]

---

[২১২] সূরা নহল : ৫৮-৫৯।
[২১৩] বুখারী।

হাদিসে উল্লেখিত "উত্তম ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে– তাদের উত্তমরূপে লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলিতে উন্নত করে গড়ে তোলা যাতে জীবন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। বলাবাহুল্য, সত্যিকারের শিক্ষা ছাড়া তা সম্ভব নয়। এই শিক্ষাই নর-নারীকে যথার্থ মানুষ তথা সত্যিকারের মুসলমানে পরিণত করে। সুতরাং অন্য এক হাদিসে প্রিয়নবী ﷺ ঘোষণা করেন–

"যার কাছে তিনটি বোন বা তিনটি মেয়ে আছে অথবা দুটি বোন বা দুটি মেয়ে আছে, আর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে," (অন্য বর্ণনা মোতাবেক) "সে তাদের যদি আদব-কায়দা শেখায়, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, তাদের বিয়ে দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে।"[২১৪]

শুধু তাই নয়, ইসলাম নারীর হৃত অধিকার পুনর্বহাল করেছে, এবং তাকে ছেলের সমান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি অধিকার দান করেছে। মেয়ে বা নারীকে কোনো ক্ষেত্রেই অবহেলা করার সুযোগ ইসলাম দেয় না, ইসলাম এমন পিতাকে, যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছে তার জন্যে বিরাট পুরস্কারের সুসংবাদ এনেছে। তাই প্রিয়নবী বলেছেন–

"যার ঘরে মেয়ে রয়েছে এবং সে যদি তাদের কবরস্থ না করে, তাদের অপমান ও ঘৃণা না করে, নিজের ছেলেদেরকে তাদের ওপর অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২১৫]

ইসলামের এসব শিক্ষা ও কর্মনীতিকে সামনে রাখুন এবং অতীত অন্ধকার যুগ ও আধুনিক অন্ধকার যুগের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করে নিরপেক্ষভাবে বলুন যে, নারীর সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে না, অন্য কোনো বাতিল মতবাদ দিয়েছে? ইসলাম ছেলে ও মেয়ের অধিকার ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিচারভিত্তিক ব্যবস্থা দিয়েছে তার কোনো তুলনা অন্য কোথাও দেখা যায় কি? বস্তুত শুধু ইসলামই ছেলে-মেয়েকে একই গুরুত্ব, একই মর্যাদা এবং সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ একই অধিকার দান করেছে। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতির সবক্ষেত্র ইসলাম মেয়েদের জন্যেও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এরপরও কেউ যদি এটা মনে করে যে, নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম তাহলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ তার এই ধারণা ইসলামের বাস্তব শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

---

[২১৪] আবু-দাউদ।

[২১৫] আবু দাউদ।

জ্ঞান-শিক্ষা (ফরয) অপরিহার্য

ইসলামে জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে অবশ্য কর্তব্য (ফরয) ঘোষণা করা হয়েছে। ইবনে মাজায় অকাট্য প্রমাণের সাথে এই সহীহ্ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে–

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের [illegible] ফরয।" (ইবনে মাজা)

(এই হাদিস সম্পর্কে ইরাকী তাঁর তাখরিজ আশ এহইয়া গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো কোনো ইমাম এই হাদিসের বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে নিখুঁত বলে স্থির করেছেন। নিখুঁত বা সহীহ্ হাদিসের কয়েকটি প্রধান শর্ত হচ্ছে–

১. অব্যাহত ধারাবাহিকতা অর্থাৎ মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী অবর্তমান থাকবে না।

২. বর্ণনাকারী সুবিচারক এবং চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলিতে নির্ভরযোগ্য হবেন।

৩. স্মরণশক্তিসম্পন্ন ও বিজ্ঞ হবেন।

৪. শুধু একটির নয়; বরং কমপক্ষে কয়েকটি হাদিসের বর্ণনাকারী হবেন।

৫. কোন রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবেন।)

"প্রতিটি মুসলমান" অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম নর-নারী। এ সম্পর্কে আলেম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের কারো মতভেদ নেই। অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম নরনারীকে কমপক্ষে এতটুকু শিক্ষা অবশ্যই অর্জন করতে হবে যেন তারা জীবনের মৌলিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। "এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে যে, ছোট ছোট সন্তানদের পেছনে এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করে যে, আল্লাহ যেন তাদের জীবনকে ষোলোকলায় সুন্দর ও সততার গুণে সমৃদ্ধ করেন এবং তার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে এবং কোনো ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষি থাকবে না।" বলাবাহুল্য, যারা সন্তানের জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে এবং উত্তম শিক্ষা ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্যে সাধ্যমতো ব্যয় করে তারা সত্যই বড় ভাগ্যবান।

এতে করে বোঝা গেল যে, মাতা-পিতার কাছে সন্তানের অন্যান্য অনেক অধিকারের মতো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে, তাদেরকে সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবে। যদি কোনো কারণে পিতা তার ছেলে-মেয়েদের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পূরণে অক্ষম হয় তাহলে পিতার এই দায়িত্ব সরাসরি সরকারের ওপর বর্তাবে। মুসলিম রাষ্ট্রের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা সরকার ও জনগণের অন্যতম প্রধান ফরয। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া মানবজীবনের কোনো অর্থই হয় না।

ইসলাম সমাজকে শান্তিময় ও কল্যাণমূলক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্যে জনগণের পাঁচটি মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়। আর তা হচ্ছে শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। ইসলামের দৃষ্টিতে অন্ন-বস্ত্রের চেয়েও বিরাট সমস্যা হচ্ছে নৈতিক, চারিত্রিক অধঃপতনের সমস্যা। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুললে অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়। কারণ অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সাধারণত অসৎ ও লোভী লোকদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী শোষক ও সমাজবাদী বাটপাররা যদি জনতার অধিকার ও সমস্যা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে তাহলে দুনিয়াতে কোনোদিন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা দেখা দেবে না। তা ছাড়া অন্ন-বস্ত্রটা মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলার জন্যে জীবনধারণের মাধ্যম মাত্র। তাই ইসলাম বিশেষত সমাজকে সুসভ্য বানাতে চায় এবং মানুষকে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বুনিয়াদের ওপর সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। আর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না মন-মগজকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার জন্যে প্রস্তুত করা হয়। এজন্যে ব্যক্তি, জনগণ ও সরকার যদি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আদর্শ ও কল্যাণমূলক সমাজের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলাম এমন ধরনের তথাকথিত কোনো সরকারকে অস্বীকার করে যার কাজ হয় শুধু আইন প্রণয়ন করা আর কর উসুল করা। এর বিপরীত ইসলামী সরকার হবে সম্পূর্ণরূপে গণকল্যাণমুখী এবং জনগণের ঈমান, আকীদা ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ইসলামী সরকার এমন শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করবে যার মাধ্যমে জনগণের বৈষয়িক সমস্যাবলির সমাধানের সাথে সাথে নৈতিক ও চারিত্রিক মানও উন্নত হবে।

প্রিয়নবী বলেছেন "আমাকে শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে।" অর্থাৎ তিনি গোটা বিশ্বমানবতার শিক্ষক। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান হলো জাতির প্রধান শিক্ষক। জনগণকে শিক্ষার সব রকমের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তিনি এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন যার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনমান উন্নত হবে এবং জনগণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিও অর্জন করবে। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রবর্তন করা ইসলামী রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব। যদি সরকার এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে তাকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। যে রাষ্ট্রের সরকার-প্রধান ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে আগ্রহী নন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি প্রিয়নবীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নন।

নারীর শিক্ষাক্ষেত্র ও সীমা

ইসলাম নারীর ওপর যে বিরাট দয়া ও মহানুভবতা দেখিয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত কথা। ইসলামের ঘোর সমালোচকরাও একথা স্বীকার করেন; কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো ইসলাম নারীকে কোনো ধরনের শিক্ষা দেয়? এর জবাবে প্রথম যে কথাটি বলা যায় এবং যে সম্পর্কে কারো কোনো মতভেদ নেই তা হলো, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ভদ্র, নম্র, চরিত্রবান ও সু-শৃঙ্খল করে তোলা। শিক্ষা মানুষের মধ্যে দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতার সৃষ্টি করে– যা তার জীবনের সব ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে। আর এই উদ্দেশ্য শুধু নারীর জন্যেই নির্দিষ্ট নয়; বরং নারী-পুরুষ উভয়ের ব্যাপারেই একথা প্রযোজ্য।

ইসলাম নারী ও পুরুষকে এক বিরাট দ্বীনি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর এটাই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্য কথায় বলতে গেলে এই দ্বীনি দায়িত্বই হচ্ছে মানবজীবনের মূলভিত্তি। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নর ও নারীর ওপর বিভিন্ন কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে। যেমন আমরা আগেই বলেছি এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্ক মানুষের আকীদা বিশ্বাস এবং কর্ম ও চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এই জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের মান এবং আল্লাহর আদেশ ও ইবাদতের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম থাকবে, নীতি ও বিশ্বাসের অর্থ না জানবে, সত্য ও মিথ্যার দর্শন না জানবে, সামাজিক জীবনযাপনের আইন-কানুন না জানবে, মোটামুটি চারিত্রিক জ্ঞান অর্জন না করবে, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগতি অর্জন না করবে এবং এটাই যদি না জানে যে, সত্যিকারের শিক্ষাই তাকে সচেতন ও সজাগ মানুষে পরিণত করে, তাকে জীবন ও মহাপ্রকৃতির গোপন রহস্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করে, জুলুম ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্তি ও আলোর পথে ঠেলে আনে তাহলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত অজ্ঞ ও অদূরদর্শী। এ ধরনের মানুষকে তার অজ্ঞতার পরিণতিতে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। এ ধরনের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেন–

"হে ঈমানদাররা! নিজেকে নিজে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।"[২১৬]

এই আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে নর ও নারী উভয়ই শামিল রয়েছে। বলাবাহুল্য, যারা আল্লাহ ও বান্দার অধিকার সম্পর্কে অনবহিত তারা নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে কেমন করে?

---

[২১৬] সূরা তাহরীম : ২।

সুতরাং মানুষকে তার নিজের জন্যে, পরিবার-পরিজনের জন্যে এবং গোটা সমাজের জন্যে জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্যা থেকে মুক্তি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মজবুত ও স্থিতিশীল করার জন্যে আল্লাহ বলেছেন–

"নারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তার অধিকারও রয়েছে।"

এভাবে পুরুষেরও কিছু দায়িত্ব এবং কিছু অধিকার রয়েছে। এই দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেই স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন হবে শান্তি পূর্ণ। কিন্তু যদি সেই জ্ঞানই না থাকে তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন কি সুখী-শান্তিপূর্ণ হতে পারে? একইভাবে নারীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীল করা এবং নারীকে শান্তির প্রতীক ও উৎস হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার জবাব স্পষ্ট হয়ে যায়। এবং যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মানসিক ও অনুভূতিজনিত সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন বিরাট ভূমিকা পালন করে এজন্যে এটাকেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি দ্বার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এতেকরে মানুষের চিন্তাধারার মধুময় অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতার সৃষ্টি হয় এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহ নারী ও পুরুষের অধিকার সংরক্ষণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রিয়নবী বলেছেন–

"নারী তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্ক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[২১৭]

এই দায়িত্বের বিভিন্ন পর্যায় থাকতে পারে। যেমন– অর্থনৈতিক পর্যায়, শারীরিক পর্যায়, সামাজিক পর্যায়, প্রশিক্ষণ পর্যায় ও প্রশাসনিক পর্যায়। আমরা এখানে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পরিবর্তে শুধু পারিবারিক ব্যয়ভার সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। কারণ আজকের যুগে এটাই মানুষের আসল দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটা প্রত্যেক পরিবারের অন্যতম বুনিয়াদি সমস্যা।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শ স্ত্রী তাকে বলা হয়– যে অত্যন্ত মামুলি ধরনের মাসিক আয় দিয়ে নিজেদের ব্যয় বাজেট পূরণ করতে সক্ষম। এটা একটা স্বীকৃত নীতি। তবে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখী রাখার উদ্দেশ্যে সচ্ছল ও সমৃদ্ধ জীবনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য; বরং বলতে হয় পারিবারিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ, সহজ ও সুশৃঙ্খল রাখার জন্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত আয়-উপার্জন।

---

[২১৭] (ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

এক্ষেত্রে স্ত্রীকে কখনো অনটনে রাখতে নেই এবং প্রয়োজনবোধে কিছু বেশি টাকা দেওয়াই ভালো যাতে সে সুন্দরভাবে পারিবারিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই জন্যে পুরুষকে যথাসম্ভব বেশি করে হালাল আয়-উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

আরেকটি প্রশ্ন হলো স্ত্রী তার সন্তানদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান কিভাবে করবে? এখানে লালন-পালন বলতে শুধু খাওয়ানো পরানোকেই বোঝায় না; বরং সন্তানের মানসিক ও চারিত্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের কথাকেও বোঝায়। কেননা শিশুসন্তান নিজের ভালো-মন্দ বোঝে না। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে কোনো ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে তারা মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে শান্ত ও ভদ্র আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে।

নিঃসন্দেহে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব তখন আরো অনেক বৃদ্ধি পায় যখন সে সন্তানদের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও ইসলামী শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রত গ্রহণ করে। এজন্যে নারীকে আগে থেকেই ইসলামের সামাজিক ও সার্বজনীন জ্ঞান অর্জন করা উচিত। যেমন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পড়াশোনা করা দরকার। এ ধরনের পড়াশোনা শুধু সখের জন্যেই করবে না; বরং এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করবে এবং নিজের সন্তানদের ব্যক্তিত্বও গড়ে তুলবে। মাকে বরং নিজের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তাঁর সন্তান তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই সুসভ্য হয়ে উঠবে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমরা আদর্শ মায়ের গুণাবলি আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান বিষয়কে দীর্ঘায়িত করতে চাই না, কারণ এই বিষয়ে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু পরিবারের প্রতিষ্ঠাকারী কর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার দরকার। কেননা, ইসলাম তাকে এই যে দায়িত্ব দিয়েছে তার দাবি হচ্ছে সে তার সাধ্যমতো শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের সাথে পরিচয় লাভ করাবে এবং সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে এই দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা দান করা। এক্ষেত্রে তার অধিকার সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই আলোচনা হয়েছে বিধায় এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া একজন দায়িত্বশীল নারীর চিন্তাধারা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা তার প্রভাব গ্রহণ করা ছাড়া থাকতে পারে না, কারণ দায়িত্ব-অনুভূতির মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ থেকে সে তার দায়িত্ব পালনের অনুপ্রেরণা পায়। আর এই অনুভূতিই তার মর্যাদা ও গুরুত্বকে এতটা বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত এই অনুভূতিই মানব মানসিকতাকে সামগ্রিক প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং ব্যক্তিকে সচেতন ও সতর্ক

রাখে, তার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমস্যাবলির সব দিক ও বিভাগ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে সম্মত করে। আর এই অনুভূতিই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে একটি মজবুত অবলম্বন এবং তার পূর্ণতা অর্জনের বুনিয়াদি উপাদান বলে প্রমাণিত হয়।

এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা দান করা। সুতরাং নর-নারীর শারীরিক গঠনে যে ব্যবধান রয়েছে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, পথ দুটির মধ্যে কোনো পথটি সমাজের জন্যে অধিকতর উপকারী এবং স্বভাবসম্মত? তাকে কি সেই শিক্ষা দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোতাবেক জীবনযাপন করবে, না কি সেই শিক্ষা দেওয়া হবে যা শিখে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিরোধী পথ অবলম্বন করবে?

ইসলাম আমাদেরকে একথা বলে না যে, নারীর জ্ঞানবুদ্ধি পুরুষের সমান নয়, অথবা একথাও মানি না যে, যেসব জ্ঞান ও কলাকৌশল পুরুষই শিখতে পারে, নারী শিখতে পারে না। এসব কোনো কথাই নয়। তবে আসল কথা এবং প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃতিই কর্মক্ষেত্রের যে স্বাভাবিক বণ্টন করে রেখেছে সে, অনুযায়ী কোনো জ্ঞান বা কোনো প্রশিক্ষণটা কার জন্যে বেশি উপযুক্ত? এবং প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যেয়ে দৈহিক ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে সে অনুযায়ী তাদের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের সীমা বণ্টনও জরুরি কিনা?

আসলে নারীর সৃষ্টি-উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে আদর্শ মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রাকৃতিক সত্যের ওপরই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। বলাবাহুল্য আল্লাহর সব পরিকল্পনারই একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। বৃহত্তর কল্যাণই সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এজন্যে আমরা যদি নারীকে তার প্রকৃতির দাবি মোতাবেক আসল শিক্ষা না দিই তাহলে অন্য শিক্ষার মাধ্যমে সে যা কিছুই হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ নারী ও আদর্শ মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। অথচ আদর্শ মা হওার মধ্যেই নারীর সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

আজকের আধুনিক নারী কৃষিবিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান এবং কলা ও কৌশলবিজ্ঞানে বিশেষত্ব অর্জন করছে। এছাড়া সাহিত্য চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব শিখে নারী হিসেবে তার কি উপকার বা কি উন্নতিটাই হচ্ছে? পুরুষের কাজ করাই কি নারীর উন্নতির প্রমাণ। আসলে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নারী তার নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা থেকেই বাদ পড়ে গেছে। পরিণতিতে নারী, নারী না

থেকে কৃত্রিম পুরুষেই পরিণত হচ্ছে। এটাকেই যদি কেউ বাহাদুরি বলে মনে করে তাহলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আমরা অবশ্য এটা বলছি না যে, নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তার গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। না তা নয়। আসলে নারী নিছক দেহসর্বস্ব কোনো বস্তু নয়; বরং নারীত্বের আধ্যাত্মিক মান ও বিধিই হচ্ছে তার আসল জিনিস। এটা এক ধরনের স্বাভাবিক গুণ ও ক্ষমতারই নামান্তর মাত্র। এরই মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মানবিকত্ব পরস্পর থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। একজনের মনমেজাজ অন্যজনের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। আর এসব কিছু এজন্যেই যে, তা জীবনের কর্মক্ষেত্রে নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন যথার্থভাবে পালন করতে পারে। এটাই সেই বিশেষ কথা যা নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময় লক্ষ রাখতে হয়। যদি সে ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় তাহলে তার নারীত্বের ক্ষমতা ও গুণাবলি নষ্ট হয়ে যাবে; বরং সে অবাঞ্ছিত বিকৃতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

নারী শুধু নারী হয়ে থেকেই তার উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। এর পরিবর্তে নারী যদি পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে নিজেই নিজের পায়ে ঠুকারাঘাত করবে। নারী হয়তো কারো স্ত্রী হবে অথবা মা। কারণ এটাই তার স্বভাব। নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে যতই উন্নতি অর্জন করুক না কেন কখনো তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারবে না। আর পুরুষের জন্যেও এটাই উত্তম যে, তারা যেন নারী হিসেবে তার নিজ ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার সুযোগ সরবরাহ করে। পুরুষ যদি নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে বের করিয়ে আনে এবং নারীর স্বাভাবিক নীতি ও বিধির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করে তাহলে সামাজিক শান্তি, সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং নারীকে সত্যিকারের চরিত্রবান ও আদর্শ নারী হিসেবে, আদর্শ মা ও স্ত্রী হিসেবে পেতে হলে তার স্বভাবের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এরই মধ্যে নর-নারী– সকলের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অবস্থা ও পরিবেশের তাগিদে নারী যদি ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, প্রশিক্ষণ পেশা অবলম্বন করে তাতে কোনো বাধা নেই; বরং ইসলামী নীতির আলোকে নারীর ডাক্তার নারী হবে এবং নারীর শিক্ষক নারী হবে এটাই অধিকতর কাম্য। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়াদিতেও নারী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে এসব অবলম্বন করতে গিয়ে তার নারীত্বের যেন হানি না হয় তা লক্ষ রাখতে হবে। মোটকথা, নারী হিসেবে নারীর জন্যে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই নারী তার দখল রাখবে।

ইসলাম নারীর জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেনি। ইসলাম নর ও নারী উভয়ের জন্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দুয়ার মুক্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু কোন জ্ঞানটা নারীর স্বভাবসম্মত এবং নারীর জন্যে প্রয়োজনীয় তা তাকে স্থির করে নিতে হবে। যা তাদের জন্যে কল্যাণকর ও তাদের পক্ষে সহজ সেই জ্ঞান তাদের অর্জন করতে হবেই। যে জ্ঞান পুরুষের স্বভাব ও ক্ষমতা মোতাবেক এবং তাদের জন্যে উপযুক্ত পুরুষ তা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে কেউ কারো সীমালঙ্ঘন করবে না। এটা প্রাকৃতিক আইনের একটি অংশ। কোনো বিষয়ের বৈধতা ও অবৈধতার ক্ষেত্রে এই আইন প্রভাববিস্তার করে থাকে।

যেকোনো বিবেকবান ব্যক্তি গভীর দৃষ্টিকোণ নিয়ে নারীর সৃষ্টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে তাহলে সে বুঝতে এবং জানতে পারবে যে, নারীর শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও গুণাবলি কি হওয়া উচিত। তার পরিবর্তে আমরা যদি অন্ধ, বধির ও বোবার মতো শুধু ইউরোপ আমেরিকার ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকেই নিজেদের অনুসরণীয় আদর্শ বানিয়ে থাকি এবং বিবেকহীনের মতো বাছবিচার না করে তাদের অনুকরণ করে থাকি তাহলে তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে তার আভাস ইঙ্গিত ইতোমধ্যেই দেখা যেতে শুরু করেছে। অবশ্য ভুল শোধরাবার সময় এখানো আমাদের হাতে রয়েছে। সুতরাং আমরা যদি এখন থেকেই ভুল শুধরিয়ে আবার আপন ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করতে শুরু না করি তাহলে তা আমাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অপমানজনক ফলাফল বয়ে আনবে; আমাদের বর্তমান উদাসীনতা অত্যন্ত ভীতিকর প্রমাণিত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মহিলাদের চাকরি

প্রথম কথা :

মহিলাদের চাকরির কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নানা রকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ (টঘঙ) পুরুষ ও নারীদের একই কাজের সম-অংশের বেতন বরাদ্দকরণে ব্যর্থ হয়েছে। স্বয়ং ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরাই নারী-পুরুষের পারিশ্রমিক বা বেতনের সমতার ঘোর বিরোধী। তারা নারী-পুরুষের সম-বেতনের ফলে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হবে বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

আজ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং আইনবিদরা সর্বসম্মতভাবে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, নারী শুধু সেই কাজের জন্যেই উপযুক্ত যা তার স্বভাব ও মানসিকতার অনুকূল। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ব্যবধান রয়েছে তার সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে বলেই আজকের সমাজ অবনতশীলতার চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অভাব ঘটেছে।

আজ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলোতে এমনকি পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী মুসলিম দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের বীভৎস আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ফলে এসব দেশগুলোতেও যেসব কুৎসিত সামাজিক ব্যাধি দেখা যেতে শুধু করেছে– যায় যন্ত্রণায় গোটা পাশ্চাত্যে সমাজ ত্রাহি চিৎকার তুলছে। আমাদের সমাজেও যদি পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ অব্যাহত থাকে তাহলে আমরাও যে পাশ্চাত্যের মতো কঠিন সমস্যাবলির জটিলতায় জড়িয়ে পড়বো তাতে সন্দেহ কি? আমরা এখানে বাস্তব ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের চাকরি সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই এবং এটাও দেখিয়ে দিতে চাই যে, আধুনিক সমস্যাসমূহের মূল কারণ কি এবং পাশ্চাত্যে সমাজে এর কি মারাত্মক কুফল দেখা দিয়েছে।

এ সম্পর্কে আলোচনা শুধু করার গোড়াতেই আমরা পাশ্চাত্যের অন্ধানুসারী তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতাদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে– আজ সেই কোন্ সমস্যাটা দেখা দিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের চাকরি করাটা এতবেশি জরুরি মনে করা হচ্ছে? অথচ এর আগে এমন কোনো সমস্যা ছিল না। তাহলে, হঠাং করে এঁরা কেন এত চেঁচামেচি শুধু করে দিচ্ছেন যে, মহিলাদেরকে তাদের আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চাকরির জন্যে বেরিয়ে পড়তে হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে তাঁরা সাধারণত নিম্নলিখিত জবাব ও যুক্তি পেশ করার চেষ্টা কবেন–

(ক) চাকরি বাকরির ফলে মহিলাদের চিন্তা ও মানসিকতার সম্প্রসারণ তো হয়, তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে এবং সে ধৈর্যসাপেক্ষ একাকীত্বের বিরক্তি থেকে রক্ষা পায়। চাকরি না করলে সে ঘরের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়তো।

(খ) কোনো জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কর্মক্ষমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু মহিলা জনগণের অর্ধেকাংশ, সুতরাং তাদেরকে যদি আমরা জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতার শামিল না করি তাহলে যথার্থভাবে আমরা উন্নত হতে পারবো না।

(গ) তৃতীয় উপকার এই যে, তাতেকরে সে নিজ দায়িত্বশীলের সহায়তা করতে পারে এবং যদি তার কোনো দায়িত্বশীল নাও থাকে তাহলে অন্তত সে নিজেই নিজের বা, সে বিধবা এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। এক্ষেত্রেও নিজের এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্যে তাকে চাকরির জন্যে বাইরে বের হতে হয়। এছাড়া একজন মানুষ হিসেবে তারও কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে; এই জন্যে তার একটা নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে সে আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং

কারো ওপর বোঝা হয়ে না থেকে নিজ আত্মমর্যাদা রাখার তাগিদে আয় উপার্জনের জন্যে তাকে বাইরে বেরুতে হয়। এই হলো মহিলাদের চাকরিকরণ সমর্থকদের যুক্তি। এখন আসুন আমরা এসব যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে দেখি যে, এসব যুক্তির ওজন কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু মেকি তাও স্পষ্ট করা দরকার। আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা সব রকমের বৈষম্য বা পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের কথাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করবো। আমরা কুরআনী যুক্তি-প্রমাণ এবং জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আলোচনা পেশ করবো।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

বাইরে বের হলে যে নারীর চিন্তা ও মানসিকতায় ব্যাপকতা আসে তা সঠিক, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। মহিলারা চিন্তা ও মানসিকতার ক্ষেত্রে আরো বেশি উন্নত হোক– আমরা তা কামনা করি।

কিন্তু যাঁরা একথা পেশ করেছেন আসলে তাঁদের যুক্তির বুনিয়াদ হচ্ছে দূর অতীতের অন্ধকার সমাজ– যার প্রভাব এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

অথচ এর কারণ হচ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং নীত, নৈতিকতা, ভদ্রতা-সভ্যতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলির ব্যাপারে তাদের চরম উদাসীনতা। এই কারণেই তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও আচার–ব্যবহারের উন্নতি হয়নি। তারা জীবনের মূল্যবোধ এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত রয়েছে। একই কারণে তারা ঘরে-বাইরের যেকোনো ক্ষেত্রে যেকোনো কাজে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার ফলেই তাদের জীবন সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদতার শিকারে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা এতো অধঃপতিত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের গুরুত্ব ও মর্যাদাও তারা ভুলে বসেছে। আজ তারা মূর্খতার কারণে এটা মনে করে বসেছে যে– গৃহস্থালির কাজকর্ম করা এবং সন্তান প্রসব ছাড়া যেন তাদের আর কোনো দায়িত্বই নেই। ইসলাম তাঁদেরকে যে মহৎ ও মহান উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করেছিল– মূর্খতাবশত আজ তারা সেই দিক ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবে তাদের মন-মানসিকতা অবনতির অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

আমরা ইতঃপূর্বের এক আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, দাম্পত্য সম্পর্কের যৌন দিকটাই মুখ্য নয়; বরং তার আধ্যাত্মিক সম্পর্কটাই হলো মুখ্য বিষয়। এই

আধ্যাত্মিকতার ফসল হচ্ছে প্রেম-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষা; এর চেয়েও বড় ফসল হিসেবে পরিলক্ষিত হয় গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ পান করানো ইত্যাদি। এসব আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর সন্তানকে এক আধ্যাত্মিক জীবন দান করেন। ফলে সন্তান পিতা-মাতার অনুগত ও ভক্ত থাকে, পিতা-মাতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এরপর সন্তান সঠিক অর্থে জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হয়ে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিকতা যার মাধ্যমে সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাদের সেবা করে সন্তুষ্ট হয়। আর এটাই হচ্ছে সেই ভিত্তি যার ওপর আমাদের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক মজবুত ও স্থিতিশীলতা অর্জন করে। আমরা ইতঃপূর্বে এটাও বলেছি যে, দাম্পত্য বিধি এবং সন্তান ও মাতা-পিতার মধ্যেকার সম্পর্কের উপকারিতা কেবল তখন অর্জিত হবে যখন এর শর্তাবলি পূরণ করা হবে। (এসব শর্তাবলি সম্পর্কে আমরা বক্ষমাণ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দরকারবশত তা পুনঃঅধ্যয়নের অনুরোধ করবো।)

আমরা এটাও বলেছি যে, জ্ঞানার্জন নারীদের জন্যে কেবল এক অধিকারই নয় বরং অন্যতম ফরযও, এবং তাদেরকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করাটা পরিবার তথা গোটা সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর তারা সেই শিক্ষা অর্জন করবে যাতে তাদের মনে উদারতা এবং বিবেক-বুদ্ধিতে আলোকসম্পাত ঘটবে, জীবনের সাধারণ বিষয়াবলিতে ভদ্রতা ও সততার স্ফুরণ ঘটবে, দাম্পত্য সম্পর্কের আধ্যাত্মিক ও সামষ্টিক উপকারিতা সম্পর্কে বোধোদয় ঘটবে এবং এর জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজ ও সরকারের মৌলিক কর্তব্য। নারীজাতি যাতে সামগ্রিকভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নিজ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বে যাতে পূর্ণ মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে, যাতে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেজন্যে তাদেরকে পুরোপুরি অবকাশ দিতে হবে।

আর এসব শর্ত পূরণের জন্যে ইসলাম নারীকে যেসব গুণাবলিতে ভূষিত দেখতে চায় সেসব বিষয়াদি সম্পর্কে আমরা আগেই ইঙ্গিত করেছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলিম মহিলাদেরকে যদি ইসলামের নির্দেশ মতো এবং পন্থা মোতাবেক অধিকার, মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে আজকের মুসলিম নারী যথার্থ অর্থে দুনিয়াতে আদর্শ নারীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসন লাভ করতে পারে। ইসলামী শিক্ষা ও শর্ত অনুসরণ করে তারা দুনিয়ার অন্যান্য বিভ্রান্ত ও অধিকারবঞ্চিত নারীদের সামনে সত্যিকারের স্বাধীন ও মর্যাদাপ্রাপ্ত নারীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে।

ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই নারী তার নারীত্বের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এভাবেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতার প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং তারা ঘরে ও বাইরের জগতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের বাস্তব উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

সুতরাং আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আমরা যদি সত্যিসত্যিই নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে চাই, তার মনে উদারতা আনতে চাই, চাই যদি তাকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে টেনে আনতে, যদি তাকে জীবনের প্রকৃত প্রস্তুতির পথে তুলে ধরতে চাই তাহলে ইসলামের চিরন্তর সজীব নীতির অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উপায় নেই। আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নারীজাতিকে সত্যিকারের সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়ার স্বপ্ন কেবল তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অনুকরণ করবো। বস্তুত আমাদের পূর্বসূরি সংস্কারক ও চিন্তাধারা এই স্বপ্নই দেখে গেছেন। তবে হ্যাঁ, নারী তার ঘরদোর ছেড়ে কলকারখানায়, ব্যাংকে, আর এখানে-ওখানে দৌড়াদৌড়ি করুক এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই কামনা করতে পারে না। তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে তাদেরই স্বভাবের আলোক। সেখানে পুরুষের অবস্থা নিয়ে নারীদের ব্যবস্থা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আর ইসলাম যেহেতু নারীর মর্যাদা ও স্বভাবের অনুকূলে থেকে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার নিশ্চিত উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে তাই তার অনুসরণ করে সাফল্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত।

এছাড়া অন্যান্য উপায় ও ব্যবস্থা নারীকে তার স্বভাবের গণ্ডি থেকে জবরদস্তি টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও আধুনিক মতবাদগুলোর মধ্যে শুধু ইসলামেই নারীর জন্যে জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষা-দীক্ষায়, নীতিতে, চরিত্রে, বিবেক-বুদ্ধিতে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদে এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য বা ব্যবস্থা নেই। এই বাস্তবতা সম্পর্কে করো কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

ইসলামী সমাজে সংস্কারমূলক তৎপরতায় অংশ নেওয়ার পুরো অধিকারই নারীর রয়েছে। ইসলামী সমাজের নারী বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সমালোচনা এবং পরামর্শ দিতে পারে এবং যেকোনো সামাজিক, সংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা তাকে জীবনের মহত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে; তার

ব্যক্তিত্বকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করে, সে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝে নিতে পারে। বস্তুত ইসলামী শিক্ষা তার মন ও চিন্তাকে করে উদার ও সম্প্রসারিত। এর মাধ্যমে নারী পরিণত হয় আদর্শ নারীতে। কল-কারখানার আর পথেঘাটে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে নারী তার এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

বলুন তো, কল-কারখানায় লোহালক্কড় টানাটানি করে, দোকানে সেলস্ গার্লস হিসেবে সওদাপাতির মোড়ক বেঁধে, নোংরা ফ্যাশন বিলাসিতায় পড়ে উত্তেজক পোশাক পরে পথে-ঘাটে অঙ্গ-প্রদর্শনী করে বেড়ালে, সিনেমা-থিয়েটারে-ক্লাবে অসৎ পুরুষদের ভোগ ও খেলার পাত্রী হয়ে থাকায় মাধ্যমে কি নারী তার অধিকার মর্যাদা অর্জন করতে পারে? বলুন এসব অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত পথে চলে নারী কি আজ পর্যন্ত তার কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? ভোগ-বিলাসী পুরুষদের অবৈধ আনন্দের মাধ্যমে আর পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন সেজে নারী কি যথার্থ মুক্তি পেয়েছে? আর এসব পঙ্কিল ও ঘৃণ্য পথ ছেড়ে কি নারীরা আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হিসেবে গড়ে উঠবে? এভাবে কখনো কি তাদের সমস্যার কোনো সমাধান হবে?

আসলে নারী যদি তার স্বামীর গৃহ-পরিসরের কর্ত্রী, তার ধন-সম্পত্তির রক্ষাকারিণী; তার বিষয়াবলির তত্ত্বাবধায়িকা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ও মাতৃত্বের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে আন্তরিকভাবে যত্নশীল হয় এবং তার সব জ্ঞান-বুদ্ধি ও সময় যদি এসব দিকেই মনোযোগী হয় তাহলে নারীর কল্যাণ আশা করা যেতে পারে। হতে পারে আমাদের এই অভিমতের সাথে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করবেন। হয়তো মনে করতে পারেন যে, এটা শুধু আমাদের মতামত; কিন্তু না, শুধু আমাদেরই এ কথা নয়; বরং আধুনিকতার স্বর্গরাজ্য আমেরিকার এক আধুনিকা মহিলারই একটি অভিমতও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে যা বলেছেন তাকে 'নারী বিরোধী' বা 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' বলে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। তিনি শুধু একজন আধুনিকই নন; বরং বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিকও। তাঁর নাম ফিল্স্ মাকজেনিলী। তিনি 'নারী গৃহের সম্রাজ্ঞী' নামক শীর্ষক পুস্তকের এক প্রশ্নের জবাবে যা বলেছেন তা প্রশ্ন ও জবাবসহ শুনুন।

প্রশ্ন হচ্ছে–"আমাদের নারীদের মুক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর পর এখন কি ওখান থেকে ফিরে আসা উচিত? আর যদি এখন আমরা আবার ফিরে চলি তাহলে সেটা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে কী অবিচার হবে না?

এই জবাবে ফিল্স্ মাকজেনিলী বলেন, "আমি এই সমস্যা সম্পর্কে একটি মজবুত অভিমত পোষণ করি এবং আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, গৃহের

সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকার অধিকার নারীর রয়েছে। আমি তার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুমান করতে পারি যা নারী মানবতার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যে আদায় করে থাকে এবং আমি তাকে মানবজীবন ও তাঁর উন্নতির জন্যে পর্যাপ্ত মনে করি।" (মার্চ : ১৯৬০)

মার্কিন আধুনিকাদের এই প্রতিনিধি সাহিত্যিকের মতামতে তাঁর নারীত্বের উপলব্ধিই পাওয়া যায়। তিনি বলেন–"আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো?" এ প্রশ্ন শোনার পর তিনি বলেন, "আমি সেই গুরুত্বের অনুমান করতে পারি যা সে মানবতার কল্যাণের জন্যে করে থাকে।"

এসব কথা বলছেন অন্য কেউ না স্বয়ং পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিনিধি একজন আমেরিকান মহিলা যেখানে মেয়েদের ঘরের বাইরে এখানে চাকরি-বাকরি করা একটা সাধারণ ব্যাপার। এই জন্যে তাঁর কথায় অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার স্বরূপ স্পষ্ট। সুতরাং তিনি যখন বলেছেন যে, মানবজীবন ও তার আসল উন্নতির জন্যে নারীর পক্ষে "গৃহের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।" তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার এই স্বীকৃতি ও সমর্থনের পর এই সমস্যা নিয়ে আরো দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ থাবে না। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সমাজের উন্নতি ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে নারীকে সংস্কারমূলক এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা উচিত; কিন্তু এর জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, সে এর জন্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলবে। এটা নারীর চিন্তা ও মানসিক অগ্রগতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাতির উন্নতি

আর এই কথা যে, জাতির উন্নতির চাবিকাঠি কর্মশীল লোকদের সংখ্যাধিক্যের ওপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু নারী জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ তাই তাকে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না দিলে যথার্থ উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়। আমাদের মতে, এটা ঠিক কথা; কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, জাতীয় উন্নতির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে তার আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নীতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আর উন্নতির অন্য দিকটি হচ্ছে বৈষয়িক– যাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে জাতি উভয় ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করবে, প্রকৃতপক্ষে তাকেই কেবল উন্নত জাতি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেই জাতির লোক সৎ ও সাহসী হবে, তাদের উদ্দেশ্য হবে মহৎ এবং তাদের কাছে থাকবে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা। এটা হচ্ছে সেই মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য যা যেকোনো জাতির সত্যিকার জন্য অপরিহার্য। ইসলাম এসব

গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যর ওপরই সত্যিকারের উন্নত জাতি গঠনের নিশ্চয়তা বিধান করে। অর্থাৎ শুধু একমুখি উন্নতিকে উন্নতি বলা যাবে না। যেমন, কেবল বৈষয়িক উন্নতিই যথেষ্ট নয়– তার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতিও অপরিহার্য। এ জন্যেই ইসলামকে মানবতার জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ বলা হয়। ইসলাম যেমন একদিকে বলে যে, "তোমাদের শক্তি মোতাবেক আল্লাহকে ভয় কর।"[২১৮] তেমনি অন্যদিকে বলা হচ্ছে, "এবং যতটুকু সম্ভব সাধ্যমতো বেশি থেকে বেশি শক্তি সঞ্চয় কর।"[২১৯] অর্থাৎ সব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে– কোথাও সীমালঙ্ঘন করবে না এবং তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র এবং একটি স্থায়ী সামরিক বাহিনী সবসময় প্রস্তুত থাকবে যেন শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে সময়মতো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এবং নিজেদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়কেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলাম নারী ও পুরুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কারমূলক ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব সোপর্দ করেছে এবং তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে উভয়কে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পরিবার-পরিজনের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা শামিল রয়েছে আর নারীর স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে ঘর ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কাজ যথেষ্ট মুশকিল বটে; কিন্তু ফলাফলের দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং পবিত্রতর। এ ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেও নারীর ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, যেমন গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং সন্তানের প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি নারীরই দায়িত্ব। স্বামীকে ভালোবাসা দেওয়া, তাকে সেবা করা, সন্তানকে মাতৃস্নেহ দান করা ইত্যাদিও নারীর দায়িত্ব। বৈষয়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে স্নেহভালোবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করাও নারীর স্বভাবের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এসব দায়িত্ব নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই অর্থবহ। এসব দায়িত্ব পালনে নারীকে তার সব জ্ঞানবুদ্ধি, প্রতিভা, দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে ব্যবহারাধীনে আনতে হয়।

নারীর স্বভাব-প্রকৃতি মোতাবেক তার ক্ষমতা ও আগ্রহকে সামনে রেখে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নারীর এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্যেই সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করছে। উপরে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ সুষ্ঠুভাবে পালন করেই নারী তার অধিকার ও

---

[২১৮] আল কুরআন।
[২১৯] আল কুরআন।

মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে; কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনো একটি ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় তাহলে সমাজ তথা জাতীয় উন্নতি বিঘ্নিত হয়ে পড়বে এবং নারী যখন তার আসল দায়িত্ব অবহেলা করে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তখন সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিভিন্ন জটিল সমস্যা দেখা দেয়। আর এরই পরিণতিতে নারী নির্যাতন, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও বেকারত্বের মতো মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। কারণ জনগণের শতকরা পঞ্চাশ শতাংশই যদি তাদের নিজ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অপর পঞ্চাশ ভাগের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। জাতির উন্নতির জন্যে অধিকাংশ লোকের কর্মশীলতা সংক্রান্ত আপত্তির জবাব আমরা উপরে দিয়েছি; কিন্তু কোনো কোনো লোক অজ্ঞতাবশত মনে করেন, ইসলামী সমাজে নারীরা একটি অবশ অঙ্গের মতোই হয়ে থাকে এবং পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে তার ভূমিকা পালনের কোনো অবকাশ থাকে না। তারা আবার এটাও মনে করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নারী কল-কারখানায়, অফিসে, আদালতে অর্থাৎ বাইরের কোনো কাজের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করে না ততক্ষণ পর্যন্ত নারীকে কর্মী বলা যাবে না। অর্থাৎ বাইরে না বেরুলেই সে বেকার বলে গণ্য হবে। হতে পারে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় তাদের কথাই ঠিক। সম্ভবত এ ধরনের লোকেরা পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করতে গিয়েই এসব কথা বলে থাকেন; কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে, জীবনের উদ্দেশ্য নিজের প্রকৃতি এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত থাকাটাই হচ্ছে নারীর আসল অজ্ঞতা! তার সবচেয়ে বড় মূর্খতা এই হবে যে, সে তার পরিবার ও পরিবেশ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে জানবে না, কিভাবে স্বামীর সাথে পরামর্শক্রমে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে– তা জানবে না। এটা হবে নারীর সবচেয়ে বড় অযোগ্যতার পরিচয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে মুক্তির স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়নরা এটাও মনে করেন যে, ঘরদোরের সীমানায় কর্মশীল নারীর কোনো মান-মর্যাদা থাকে না; ঘরে থাকে বলে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না; কিন্তু এরাই যখন বাইরে বের হয় তখন নাকি সমাজের বিরাট উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জিত হয়– তা সে কোনো কাজ করুক বা না করুক। অর্থাৎ তাদের মতে, মহিলাদের পথে-ঘাটে বেড়ানোটাই প্রগতির ইঙ্গিত। আজব কথাই বটে; কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের অভিমতকে আমরা বাস্তবতার আলোকে পেশ করতে চাই। আমাদের অভিমতকে নিচে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

১. বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আদর্শের অনুসরণে নারী যখন শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করবে, নিজের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে নিজেদের কর্মসীমায় ওসব দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করবে তখন

তাদেরকে কোনো অর্থেই বেকার বলা যাবে না। আমরা আগেই বলেছি যে, সমাজের যথার্থ উন্নতির জন্যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতিই দরকার। এর মধ্যে পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে আয়-উপার্জন করা আর পরিবার-পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা এবং এখানেই নারী ও পুরুষের নিজ নিজ কর্মসীমা বিভক্ত হয়ে পড়ে। মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির স্বার্থে এই স্বাভাবিক বিভক্তি একান্তই অপরিহার্য। বলাবাহুল্য, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কর্মরত কোনো নারী বা পুরুষকে কোনো অর্থেই বেকার বলা যেতে পারে না। তদুপরি আমরা যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের কর্মক্ষেত্রে আনীত দায়িত্বসমূহের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, পুরুষের তুলনায় নারীর দায়িত্বটাই অধিকতর কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ। এছাড়া নারীর কাজ পুরুষের কাজের তুলনায় অধিকতর আন্তরিকতা ও মহৎ মননশীলতার দাবিদার।

২. আর যদি কেউ বলে যে, গৃহস্থালি কাজকর্মের সম্পাদন, স্বামীর সেবা, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ খাওয়ানো, তাদেরকে উপযুক্ত মানুষ ও তথা সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজ কোনো কাজই নয় এবং এসব কাজ-কর্মের কোনো মূল্য বা গুরুত্বই নেই, তাহলে এ ধরনের অভিমত পোষণকারী ব্যক্তিকে অন্ধ-বধির ও অসুস্থ বিবেকধারী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

নারী তাদের নিজ কর্মকে দৈনন্দিন জীবনে অতি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে যেসব কাজ-কর্ম করে থাকে, ধরে নিন, সেসব কাজ যদি পুরুষকে পালন করতে বলা হয় তাহলে সেখানে শতকরা একশজন পুরুষই অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে।

এরপর এসব লোকেরা যারা নারীদের কর্মকে বড্ড তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করে তাদের বোধোদয় ঘটবে যে, নিজ কর্মক্ষেত্রে নারীর গুরুত্ব কতো বেশি। মনে করুন নারী যদি তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অর্থাৎ ঘরদোরের তত্ত্বাবধান, সাংসারিক সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা কায়েম, স্বামীকে সেবা-সহযোগিতা ও ভালোবাসা দান, সন্তানের লালন-পালন ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দান, আদর-স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে পুরুষের মতো কল-কারখানা আর পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? বলুন তো, এমতাবস্থায় পারিবারিক-সামাজিক সুখ-শান্তি ও নিঃস্বার্থ প্রীতি-ভালোবাসা কোনো অস্তিত্ব থাকবে কি? আজকের ইউরোপ আমেরিকায় এতো বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও তারা অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা আর নিঃস্বার্থ সেবা থেকে বঞ্চিত। পাশ্চাত্য সমাজ পারস্পরিক সম্প্রীতি আর সহানুভূতির পবিত্র অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। তাদের বড় বড় ঘরবাড়ি, মোটরগাড়ি, বিলাসব্যসনের অঢেল আয়োজন আর কোটি কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও তারা

আজ বড্ড অসহায়-অশান্ত-অতৃপ্ত। আজ তারা বৈষয়িক উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়েছে; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে আস্থা-ভালোবাসা ও বিশ্বাস নেই। মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক নেই। ভাই-বোনের মধ্যে পবিত্র অনুভূতির কোনো বন্ধন নেই– মোটকথা তারা পারস্পরিক ভালোবাসা-সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, দয়া-মায়া ইত্যাদি অকৃত্রিম সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। সব কিছু থেকে তাদের যেন কিছুই নেই।

খোদা না করুন, আমাদের সমাজে যেন সেই অভিশপ্ত পরিণতি না নেমে আসে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে পাশ্চাত্যবাসী আজ যেসব মারাত্মক ও আত্মঘাতী সমস্যায় জর্জরিত মুসলমানরা যেন সেভুল না করে বসে। আল্লাহর ইবাদত, ঈমান, ব্যক্তি-ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদি এমন আধ্যাত্মিক সম্পদ যার এক একটির মোকাবিলায় সারা দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদই একান্ত তুচ্ছ। যারা এই আধ্যাত্মিক সম্পদকে বাদ দিয়ে পার্থিব স্বার্থের পেছনে দৌড়াচ্ছে– তারা সত্যিই বড় হতভাগ্য লোক।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমরা একথা স্বীকার করি যে, বাইরের যেকোন কাজ করার ক্ষমতা এবং যোগ্যতাও নারীর রয়েছে। নারী চাইলে ঘরের এবং বাইরের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে পারে। অর্থাৎ বাইরে পুরুষরা যেসব কর্ম করে নারী যেসব কাজও করতে পারে, আবার পুরুষের পক্ষে যে কর্ম কোনো দিনও সম্ভব নয় সে কাজও নারীই করে যেমন– গর্ভধারণ, প্রসব ও দুধ খাওয়ানো এবং সন্তানের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো, নারী নিজ ক্ষেত্রেও এতসব গুরুদায়িত্ব পালনের পর আবার পুরুষের দায়িত্বও নিজের কাঁধে নেবে কেন? যারা নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বলে তারা কি নারীর ওপর অবিচার করছে না? পুরুষ যখন নারীসুলভ কোনো কাজ করে না এবং করতে পারে না, তখন নারীকে পুরুষের কাজ করার জন্যে বাধ্য করা হবে কোন যুক্তিতে? নারী পুরুষের কাজও করতে পারে তাই বলে কি তাকে উভয় দায়িত্বই চাপিয়ে দেওয়া হবে? নারী যদি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহলে তার নিজ ক্ষেত্রের কাজ কি ব্যাহত হবে না? আর তদুপরি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নারী যে দায়িত্ব পালন করে তাকে কি তার যোগ্য পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দেওয়া হয়? বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারীর ওপর যে যুলুম, অবিচার ও অসমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ না হয় এখানে বাদই দিলাম; কিন্তু এটা তো বাস্তব সত্য কথা যে, একই ক্ষেত্রে একই কাজ করার পরও কোনো নারীকে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক এবং মর্যাদা দেওয়া হয় না। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিত অবাঞ্ছনীয় তা তাদের বেতন ও পারিশ্রমিকের অসম ব্যবস্থা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পুরুষের কর্মক্ষেত্রে

গিয়ে নারী যে শোষিত, বঞ্চিত ও মানহীন হবে তাতো জানা কথাই। অন্যদিকে, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীকে স্থান দিয়ে পুরুষ তাকে অনুকম্পা বা দয়া প্রদর্শন করছে বলেই মনে করে এবং অপ্রয়োজনীয় অনুকম্পার বিনিময়ে নারীর নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও সেসব পুরুষেরা পিছিয়ে থাকে না।

আমাদের অভিযোগ-কর্তারা এটাও বলে থাকেন যে, ''নারীর পক্ষে ঘরের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাথে কাজ করা সম্ভব।'' এভাবে তাঁরা একথারই স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, নারীরা ঘরের সীমানায়ও কাজকর্ম করে- বেকার বসে থাকে না। সুতরাং ঘরের সীমাতে অবস্থানরত মহিলাদের ব্যাপারে তাঁরা যে কর্মহীনতা বা বেকারত্বের অপবাদ দিয়ে থাকে তা তাদের নিজেদের মতামত খণ্ডন করে এবং তাদের গোটা চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করে; কিন্তু তারা যে বলেছেন নারী ঘরের ভেতরে ও বাইরে একই সাথে সকল কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করতে সক্ষম, তা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যেমন মনে করুন, নারীর এক দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর সেবা করা এবং তাকে স্বস্তি দেওয়া। এজন্যে তার মধ্যে সবসময় স্বামীভক্তি ও স্বামী-প্রেমের মধুর অনুভূতি থাকা স্বাভাবিক প্রয়োজন; আর স্বামীর সেবার জন্যে কোনো সময় নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। যেমন, কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে একথা বলতে পারে না যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তুমি আমার স্ত্রী হিসেবে সেবার দায়িত্ব পালন কর, এরপর তোমার ছুটি, যেখানে ইচ্ছা যাও, যা মর্জি তা কর। এভাবে কোনো মা তার সন্তানকে পুরোপুরি চাকর-বাকরদের হাতে ছেড়ে রাখতে পারে না। তারা তার সন্তানকে মায়ের মতো আদর-স্নেহ করার পরিবর্তে লুকিয়ে ছাপিয়ে মারধর করবে এবং মায়ের বদলে অন্য কারো পক্ষে সন্তানের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দেওয়াও সম্ভব নয়। কোনো চাকর বা আয়া শিশুকে একথা বলবে কি যে, আদর সোহাগের জন্যে তোমাদের মায়ের অপেক্ষায় থাক? মা তার শিশুসন্তান বা স্বামীর সেবা বা অন্য কোনো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কি কল-কারখানায় দৌড়াবে? কিংবা সন্তানের দেখাশোনা এবং বাইরের চাকরি একই সাথে করতে থাকবে?

এমতাবস্থায় উভয় দায়িত্ব পালন সম্ভব কি? এক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্য দায়িত্বকে তুলে রাখবে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে দু'দিক দেখতে গিয়ে কোনো দিক সামলানো আর হয়ে উঠে না। ফলে একূল-ওকূল দু'কূলই হারায়।

তা সত্ত্বেও, আমরা তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্যে তাদের কথা যদি মেনেও নিই যে, নারী তার সময়কে উভয় ক্ষেত্রেই কাজের জন্যেই বণ্টন করে নেবে। তাহলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে? এর ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, সে তার সীমিত সময়ে নিজের সীমিত ক্ষমতার প্রয়োগ করে যে কাজ করবে তা

পুরুষের তুলনায় কম এবং অপূর্ণাঙ্গ হবে। যেমন আগে বলেছি, সে কোনো ক্ষেত্রে কাজের সাথেই সুবিচার করতে পারবে না। তা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় একই ব্যক্তির দুই নৌকাতে সফর করা।

তাহলে কথা দাঁড়াল এই যে, ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে যেভাবে তার ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে তেমনি তা থেকে কোনো বৈষয়িক উপকার অর্জনও করা যাবে না।

বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি না হয় সহ্য করা গেল; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কি হবে? ঘরে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করার ফলে আধ্যাত্মিকভাবে তার যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা কি দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দিয়েও পূরণ করা যাবে? আমেরিকার আধুনিকাদের প্রতিনিধি সেই সাহিত্যিক এফ. মাকজেনিলী এ সম্পর্কে বলেন– "যদি আমাদেরকে অন্যায়ভাবে একাজের জন্যে বাধ্য করা হয় যে, আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়ে বাইরে বের হয়ে কাজ করবো তাহলে এটা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ ও যুক্তিহীন বলা হবে। কারণ বাইরের কোনো কাজ এতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তার জন্যে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা তছনছ করে দেওয়া হবে।"

এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উভয় ক্ষেত্রের কাজের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা একান্তই নিরর্থক এবং বিভ্রান্তিকর। এভাবে তাদের এই দ্বিতীয় আপত্তিও খণ্ডিত হয়ে যায়।

এরপর আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একথা যাচাই করে দেখি যে, নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে কাদের কাজ রাষ্ট্রে ও সমাজের জন্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাহলে বাস্তবতার আলোকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, নারীর কর্মই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা ঠিক। কিন্তু নারীর কাজ তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি ঘরে-বাড়িতে পুরুষের অর্জিত আয়ের সংরক্ষণ ও হেফাজত না করে এবং তার সন্তানদের দেখাশোনা ও প্রশিক্ষণ না দেয় তাহলে পুরুষের আয়-উপার্জনের কোনো অর্থই দাঁড়াবে না। আসলে ভবিষ্যত বংশধর তথা জাতির ভিত্তি রচনা করে নারীই। একজন আদর্শ নাগরিক আর কর্মঠ ব্যক্তি মৌলিক প্রশিক্ষণ অর্জন করে মায়ের কাজ থেকেই। ছেলে-মেয়েকে সৎ, শিক্ষিত ও ভদ্রতার কাঠামোতে গড়ে তোলেন মায়েরাই। পুরুষতো কেবল দু-পয়সা কামিয়েই দায়িত্ব শেষ করে; কিন্তু পুরুষের কামানো সেই আয়কে বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করে নারীই। সব চিন্তা-ভাবনা তৈরি করতে হয় তাদেরকেই। এখন আপনারাই বলুন, সমাজ ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাদের গুরুত্ব বেশি? যারা বলেন যে, শুধু পুরুষই কাজ করে আর নারী বেকার বসে বসে খায় তাঁরা আসলে তাদের চরম অজ্ঞতারই পরিচয়

দেন। তাঁরা কোনো দিন নারীর কাজের গুরুত্ব বোঝারই চেষ্টা করেননি, নইলে নারী সম্পর্কে এমন মূর্খতাপূর্ণ মন্তব্য করা সম্ভব হতো না।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের সর্বজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ বার্নাড শ' অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "প্রাকৃতিকভাবে নারীর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, কোনো জাতি তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না এবং এর কোনো বিকল্প পেশ করাও সম্ভব নয়। নারী নয় মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের দুঃসহ যাতনা সহ্য করে, এরপর সন্তানের জন্ম দেয় ও তার প্রশিক্ষণদান করে এবং এই জন্যেই সে ঘরবাড়ির ব্যবস্থাপনার কাজে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এই সেবার জন্যে কারো কাছে পারিশ্রমিক চায়ও না। এই কারণেই মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নারীর কাজকে কাজ বলেই মনে করে না। আর যখনই কাজের কথা উল্লেখ করা হয় তখন শুধু পুরুষদের কাজের কথাই বোঝানো হয়। অথচ পুরুষদের যাবতীয় মেহনত কেবল জীবিকার অন্বেষণেই সীমিত থাকে। তার সব চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য কেবল একটি লোভনীয় গ্রাস গ্রহণই হয়ে থাকে। কোনো কোনো লোক নারীদেরকেও পুরুষের কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু তাতে চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না। কারণ তা নারীর কর্মক্ষেত্রই নয়। নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর এবং সৃষ্টির আদি থেকেই তাকে এই কাজে মোতায়েন করা হয়েছে, কেননা সমাজকে সজীব ও তার উন্নয়নের জন্যে তা অপরিহার্য।

অসংখ্য পুরুষ অত্যন্ত মামুলি কাজে তাদের জীবন শেষ করে দেয় এবং তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তারা বলে যে, এর মাধ্যমে তারা তাদের নারীদের ভরণ-পোষণ করে। তাই এছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। এই নিয়েই এদের অহংকার ও বাহাদুরির অন্ত নেই এবং তারা আসল বাস্তবতা বোঝার চেষ্টাই করেন না।"[২২০]

দার্শনিক বার্নাড শ' অতি বাস্তব কথারই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলেছেন। এর সত্যতা সম্পর্কে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, এতেকরে ওসব অপরিণামদর্শী ও বিভ্রান্ত লোকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটবে যারা বলে থাকে যে, সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্যে নারীকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। এরপর আশা করি তারা সত্য ও বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করবেন।

---

[২২০] আল হেলাল-মার্চ ১৯৬৫।

আত্মনির্ভরশীলতা

নারীদের বাইরে গিয়ে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করার তৃতীয় যুক্তি ছিল যে, এভাবে নারী আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে এবং অন্যের কাঁধের বোঝা হয়ে থাকে না। তাছাড়া তার কোনো পৃষ্ঠপোষক না থাকার অবস্থায় সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। এমনও হতে পারে যে, ছোট ছেলে-মেয়ে রেখে তার স্বামী মারা গেছে, এমতাবস্থায় নারী বাইরে গিয়ে আয়-উপার্জন করে নিজের ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। তাছাড়া মানুষ হিসেবে এমনিতেও তার কিছু চাহিদা থাকতে পারে এবং তার আত্মমর্যাদার দাবি হচ্ছে, "সে এ ব্যাপারে কারো দানের দিকে চেয়ে না থেকে নিজের চাহিদা পূরণ নিজেই করবে।" উপরের কথাগুলোকে আমরা দুইভাবে পর্যালোচনা করতে পারি। প্রথম– এর একদিক তো হচ্ছে এই যে, আমরা দেখবো যে, এই আমাদের অবস্থার সাথে মিল খায় কিনা এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে নারী ঘরের বাইরে চাকরির জন্যে বেরুতে পারে কিনা?

আমরা যখন অবাস্তব পর্যালোচনা করি তখন আমরা এটা দেখতে পাই যে, যেকোন নারী পল্লীর সেকেলে পরিবেশের হোক বা শহরের শিক্ষিতা আধুনিকা, জ্ঞানী হোক বা মূর্খ–মা, বোন, স্ত্রী নির্বিশেষে যেকোনো নারী তাদের পিতা, ভাই ও স্বামীর নির্ভরশীলতায় থাকাকে কোনো অবস্থাতেই অপমানকর মনে করে না, যেকোনো নারী পিতা-ভাই বা স্বামীর নির্ভরশীলতায় জীবনযাপনকে গৌরবজনক বলেই মনে করে। আর দুর্ভাগ্যবশত কেউ যদি পিতা-ভাই বা স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করেও থাকে তাহলে এটাকে সে বিরাট অপমান ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারই মনে করে। নারী একান্ত অপারগতার কারণে বাইরে চাকরি করতে বাধ্য হলেও এটাকে সে সবসময় কঠিন এবং অস্বস্তিকর বলেই মনে করে।

আমরা অবশ্য একথা জানি যে, আজকের পাশ্চাত্য সমাজে চাকরিহীনা মহিলাদের অপমানজনক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় এবং যেসব মহিলা আত্মনির্ভরশীলা নয় তাদের তুচ্ছ মনে করা হয়; কিন্তু পাশ্চাত্যের এই অবস্থা হচ্ছে জড়বাদী অপসভ্যতারই পরিণাম। পাশ্চাত্যের গোটা ব্যবস্থাকেই আমরা কৃত্রিম অভিশপ্ত ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করতে পারি; কিন্তু একদিকে পাশ্চাত্যের নারীদের এমন জটিল ও দুঃসহ অবস্থা সত্ত্বেও অন্যদিকে ইসলামী বিশ্বের মুসলিম নারীরা কিন্তু এসব জটিলতা থেকে এখনো মুক্ত রয়েছে। মুসলিম সমাজে একজন মেয়ে তাঁর পিতার ওপর নির্ভরশীলতাকে এবং বিয়ের পর স্বামীর ওপর নির্ভরশীলতাকে নিজের জন্যে গৌরবের বিষয় মনে করে এবং পিতা-ভাই বা স্বামী তাদের মেয়ে বোন বা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনকে নিজেদের

নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এবং অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে সেই দায়িত্ব পালন করে। মুসলিম সমাজে কোনো পুরুষ তার স্ত্রী বা বোন কিংবা মেয়ে বা তাকে নিজের ওপর কখনো বোঝা মনে করে না এবং পিতা-ভাই-স্বামী ছেলের নির্ভরশীলতাকে কোনো নারী কখনো নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করে না। এজন্যে অন্যান্য সমাজের মতো মুসলিম সমাজের নারীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সন্তুষ্ট। মুসলিম সমাজের কোনো মেয়ে বা মহিলাকে চরম অবস্থায়ও বাহীরে চাকরির জন্যে ঘুরে বেড়াবার কথা চিন্তা করতে হয় না। কারণ একান্ত বিপদের অবস্থায় তার কোনো না কোনো নিকটাত্মীয় স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং মুসলিম সমাজের কোনো মেয়ে বা মহিলা বাইরের চাকরিকে নিজেদের জন্যে চরম অবমাননাকর বলেই মনে করে। এভাবে অন্যান্য সমাজের মহিলারাও যদি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করে তাহলে তাদের সমস্যাবলিরও সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই যে, অন্যদের অবস্থা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করবো। আমরা যখন আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজের পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখে অবাক হই যে, সেখানে পিতা মেয়ের প্রতি স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি ও সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়ানোর প্রয়োজন মনে করে না। তারা স্বার্থপরতার এতো নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সেখানে বাপ ও মেয়ে, ভাই ও বোন এবং মা ও ছেলের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতম ও পবিত্র সম্পর্কের বিন্দুমাত্র গুরুত্বও নেই। তার প্রত্যেকে নিজ নিজ ভোগবিলাস আর ফ্যাশন-প্রদর্শনী নিয়েই ব্যস্ত। মা, বোন, স্ত্রী বা অন্য কারো ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। পাশ্চাত্যের প্রতিটি নর-নারী ব্যক্তিস্বার্থ আর ব্যক্তিগত আয়েশেই অস্থির; অন্য কেউ মরলো কি বাঁচলো সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। যেহেতু সেখানে ইসলামী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের কোনো স্থান নেই, তাই তারা নিরেট যান্ত্রিকতার শিকরে পরিণত হয়ে বৃহত্তম মানবিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ফলে গোটা পাশ্চাত্য সমাজ আজ চরম স্বার্থপরতা ও বিদঘুটে মেকীপনার সয়লাবে ডুবে মরছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজে নারীর মর্যাদার মান হচ্ছে এই যে, সে বাপ-ভাই বা স্বামী কারো ভরণ-পোষণ গ্রহণ করবে না; বরং নিজের জীবিকাসংস্থান নিজেই করবে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের নারীরা তারা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব যেমন– গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, তাদের দুধ খাওয়ানো এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গৃহস্থালি দায়িত্ব বর্জনে বাধ্য। কারণ এসব দায়িত্ব পালন

করতে গিয়ে তার নিজের জন্যে জীবিকার সংস্থান করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের চাকরির পক্ষাবলম্বীরা কাজকে কাজ বলে স্বীকার করতে চায় না। কারণ তাদের মতে গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুধ খাওয়ানোর জন্যে তো আর পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে না। অতএব যে কাজে টাকা পাওয়া যায় না সেটা আবার কিসের কাজ। আর যেখানে দুটো পয়সা পাওয়া যায় তা যেমনই হোক না কেন একটা কাজই বটে। এই হলো গিয়ে এসব একদেশদর্শী আধুনিক যুক্তির বহর; কিন্তু তাদের এসব কথা যে একান্তই অসম্ভব ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর তা ইউরোপ ও আমেরিকার সামাজিক অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে। এ ধরনের অবাস্তব ও ক্ষতিকর মতামতের অসারতা প্রমাণ করে আমরা বলেছিলাম যে, "অত্যন্ত বাস্তব ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনার পর আমরা লক্ষ করেছি, সমাজ ও জাতীয় যথার্থ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে পুরুষদের কাজের তুলনায় নারীদের গৃহস্থালি কর্মই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। অন্যদিকে পুরুষের কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলতে হয় যে, নারীদের গৃহস্থালি কাজ-কর্মের যে গুরুত্ব রয়েছে, পুরুষের কাজকর্মকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না।" এরপর আমরা বলেছিলাম যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বলুন যে, উভয়ের মধ্যে কার জীবনের মূল্য ও উপকারিতা বেশি? কার মান-মর্যাদা বেশি? কার কর্ম বেশি মহৎ এবং কার জীবন সবসময় সক্রিয় থাকে?

আচ্ছা, এরপর এটাও চিন্তা করে দেখুন যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই যদি বেশি টাকা কামানোর কাজেই ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের অর্জিত বিপুল অর্থসম্পদে তাদের লাভটাই কি হবে? বলুন তো শুধু টাকা আয় করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? টাকার গুরুত্বই বা কি? যে টাকা সুখ-শান্তি দিতে পারে না সে টাকা আয় করে কি হবে? কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতের ময়লা এই ঠুনকো টাকা-পয়সার জন্যে নারীকে তার মান-মর্যাদা এবং পরিবার ও সমাজের সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করার জন্যে বাধ্য করা হচ্ছে। আজ টাকার মানদণ্ডে নারীর মান ও মূল্য স্থির করা হচ্ছে। নারী-জাতির জন্যে নয়; বরং গোটা মানবতার জন্যে মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। মানুষ যদি এতটা স্বার্থপর হয়ে যায় যে, নিজের স্ত্রীকেও তার আয়ের অংশ থেকে ভরণ-পোষণ দিতে অস্বীকার করে, যেখানে মায়া-মমতা, স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার সব মানবিক উপলব্ধি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে মানুষ বলে গণ্য করার কি যুক্তি থাকবে? বাস্তবত আজ পাশ্চাত্যের মানুষ সেই চরম প্রশ্নেরই সম্মুখীন। এমনকি আজ তাদের কাছে 'মানবতা' কথাটাই একটা অর্থহীন শব্দ। মানবতা ও পশুত্বের মধ্যেকার কোনো ব্যবধানকে মানতেও তারা অপ্রস্তুত। এমতাবস্থায় তাদের কাছে নীতি-চরিত্র ও আদর্শের যে কি গুরুত্ব থাকতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। এটা সত্যি যে, আজ পাশ্চাত্যের নর-নারীর কাছে

কেবল অর্থ ও স্বার্থ ছাড়া নীতি, চরিত্র ও মূল্যবোধের কোনো দাম নেই। এই কারণেই দার্শনিক বার্নাড শ' তাঁর মন্তব্যে তাদের ভুল ধারণার অপনোদন করেন।

আর যদি একথা বলা হয় যে, নারী কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় বাইরে বেরুবে যেমন তার দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতা দান বা নিজের পিতৃহীন এতিম সন্তানদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের স্বার্থে বাইরে চাকরি করতে বেরুবে তাহলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, এই যে, সমাজ তার একান্ত দায়িত্ব থেকে উদাসীন রয়েছে যার ফলে সমাজের দরিদ্র-অভাবী লোকদের জীবনধারণ মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অসহায়া নারীদের প্রতি সহানুভূতির আবেগ-উপলব্ধি এতোটা কমে গেছে যে, যার ফলে তার মাসুম সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্যে বাইরে গিয়ে চাকরি করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এথেকে এটাও বোঝা গেল যে, এ ধরনের কোনো কঠিন এবং অনিবার্য অবস্থা ছাড়া নারী ঘরের বাইরে চাকরি করতে প্রস্তুত নয়। কারণ সে চাকরি করতে শুধু এই জন্যেই বাধ্য হয়ে পড়ে যেহেতু তার কোনো সাহায্যকারী বর্তমান থাকে না, সে কারো সহানুভূতি ও সহযোগিতা পায় না এবং সমাজ তার দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার পরিচয় দেখায়। যদি এ দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে নারীকে বাইরে গিয়ে চাকরি করার কথা ভাবতে হয় না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব সমস্যার মূলে রয়েছে অবক্ষয়মান সামাজিক অবস্থা। সমাজের বর্তমান দোষক্রটিগুলোর সংশোধন করেই এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যেতে পারে। এজন্যে সমাজ সংস্কারের সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ সবরকমের দোষ-ক্রটি ও অপরাধ সামাজিক নীতির অবক্ষয় থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সমাজের লোক মানবিক সহানুভূতি ও মহানুভবতার গুণাবলি থেকে বঞ্চিত সে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মেয়েরা এবং মায়েরা দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থার জন্যে বাইরে বেরুতে বাধ্য হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুগামীরা যে বিকল্প পেশ করেছে তা সমস্যাকে সমাধান করার পরিবর্তে আরো জটিল করে তুলেছে। তারা এক সমস্যার সমাধানের জন্যে তার চেয়েও বড় সমস্যার পথ গ্রহণ করেছে। গোটা পাশ্চাত্য, এমনকি আমাদের দেশেও সেসব জটিল সমস্যার তিক্ত বাস্তবতা আমাদের সামনে রয়েছে। এসব সমস্যাই আজ আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। যাবতীয় অপরাধ প্রবণতার মূলে রয়েছে এই সমস্যা।

কিন্তু ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম এ ধরনের অবস্থায় দরিদ্র, বিধবা, এতিম ও পঙ্গু

বা এ ধরনের যেকোনো অভাবগ্রস্তদের অর্থনৈতিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্যে সার্বজনীন বায়তুলমাল অর্থাৎ সাহায্য তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করেছ। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– "তাদের ধন-সম্পদে অভাবী এবং বঞ্চিতদের অধিকারও রয়েছে।"[২২১]

বিশেষজ্ঞরা 'বঞ্চিত' বলতে ওসব লোকদের বুঝিয়েছেন, যারা নিজেদের চাহিদা পূরণের মতো আয় করতে অসমর্থ এবং সেসব নারী যাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই তা সে নারী ছোট হোক বা বড়, তাদের সবাইকে বায়তুলমাল থেকে অংশ দেওয়া হবে। কারণ যেকোনো অভাবী নারী তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যে কোনো না কোনো অবলম্বনের প্রত্যাশী। একইভাবে এতিম ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের ভারও ইসলামী সরকারের ওপর বর্তায়। বিধবা ও অসহায় নারীদের মতো এতিমদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও বায়তুলমাল থেকে করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উপার্জনের সক্ষমতা অর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বায়তুলমালের সাহায্য পাবে। প্রিয়নবী ﷺ ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছেন– "প্রতিটি ব্যক্তি, যারা মুমিন, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা আমরা সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন–

"নবী ঈমানদারদের জন্যে তাদের নিজ নফসের চেয়ে বেশি উত্তম।"[২২২]

বুখারী শরীফের এক বর্ণনা মোতাবেক প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"যে মুসলমান মৃত্যুকালে কোনো ধন-সম্পদ ছেড়ে যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের (প্রাপ্য।) আর সে যদি ঋণ এবং অসহায় পরিবার-পরিজন ছেড়ে যায় তাহলে তাদের ব্যাপারে আমিই দায়িত্বশীল।"

(এছাড়া ইসলাম সমাজের অভাবগ্রস্ত ও আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত লোকদের সমস্যার সমাধান এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্বহালের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত বইপত্র আপনারা অধ্যয়ন করতে পারেন।)

বাস্তব এটাই সুস্থ ও সুন্দর সমাজের পরিচয়। আদর্শ কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের জন্যে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বা বাস্তবায়ন একান্তই অপরিহার্য। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই যেন এমন অবস্থা না হয় যে, সমাজে দোষ ও অপরাধের সুযোগ অবশিষ্ট রাখা হবে এবং যার পরিণতিতে বিপদগ্রস্ত নর-নারীদের সেই তিক্ত যাতনা সহ্য করতে বাধ্য করা হবে। দোষ করবে কেউ আর তার ফল ভোগ করবে অন্য কেউ, তা হতে দেওয়া যায় না।

---

[২২১] সূরা জারীয়াত-১৯।
[২২২] সূরা আহযাব-৬।

নারী গৃহপ্রদীপ না বাজারের পণ্য

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র কী? এটা এমন কোনো প্রশ্ন নয় যে, দু-চার কথায় জবাব দেওয়া যাবে। এ সম্পর্কে মানবস্বভাব ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। এজন্যে নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে মানবস্বভাব ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। তাছাড়া কোনো সমস্যার যথার্থ সমাধান করার জন্যে স্বভাব-প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা খুবই জরুরি।

এই নীতিকে সামনে রেখে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন প্রথম পদক্ষেপেই আমরা দেখতে পাই যে, স্বয়ং আল্লাহই নারী-পুরুষ উভয়কে পৃথক স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এই বন্টনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিছক লিঙ্গগত বন্টন নয়। আর আল্লাহ নিছক যৌন-আনন্দ উপভোগের জন্যেই নর ও নারীকে সৃষ্টি করে লাগামহীন ছেড়ে দেয়নি। কারণ উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মাঝেই এই বন্টন সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ থেকে বোঝা যায় যে, এই পৃথিবী আর মহাপ্রকৃতি কোনো ঘটনাচক্রে সৃষ্টি হয়নি; বরং এটা একটা সুনিশ্চিত পরিকল্পনারই বাস্তব ফলশ্রুতি। এর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যা মানুষের মন-মেজাজে আলো বিকিরণ করে। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে অজ্ঞানতার যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

কোনো ব্যক্তি যখন এই বিশ্ব ও মহাপ্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্রষ্টার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে এমনসব বিস্ময়কর সত্যের যবনিকা তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যায় যা তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাকে করে আলোকোজ্জ্বল। এরপর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে তার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

এই দৃশ্যজগৎ ছাড়াও আল্লাহ আরো বড় এবং আরো বিস্ময়কর এক অদৃশ্য জগৎও সৃষ্টি করে রেখেছেন। আবার দৃশ্যজগতের এমন অনেক বস্তু এবং রহস্যও সংগোপন রয়েছে যাতে মানুষের ভাবনা-চিন্তার অনেক কিছুই রয়েছে। মানুষ যাতে এসব কিছু দেখে-শুনে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তার প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাচিত্তে সিজদাবনত হয়– সেটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

এতেকরে আমরা জানতে পারি যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর জন্যে পৃথক পৃথক স্থায়ী ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকে তার স্বভাব ও ক্ষমতা মোতাবেক গুণবৈশিষ্ট্যে দান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তাদের কর্ম ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি বস্তু বা প্রাণী তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল এবং উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা ঘোষণা করে। এই পৃথিবী এবং মহাপ্রকৃতির সব সৃষ্টির মধ্যে শুধু মানুষকেই এসব সত্যতা ও বাস্তবতা বোঝার-জানার ক্ষমতা ও গুণাবলি দান করে তাকে সবার উপরে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। মানুষকেই কেবল সৃষ্টি-বৈচিত্র্যতার রূপপ্রভাব ও তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে মতামত করে ব্যক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের বিভিন্ন বিস্ময়কর দিক নিয়েও চিন্ত াভাবনা করে জ্ঞানবুদ্ধির প্রমাণ দিতে পারে এবং আল্লাহ মানুষকে নম্রতা-ভদ্রতা, মহানুভবতা ইত্যাদি মহৎগুণ দানে তাকে সরাসরি আল্লাহর ওহী ও রিসালাতের মর্যাদা লাভের জন্যে যোগ্য করে তুলেছেন। এসব বাস্তবতার আলোকে আমরা অনুমান করতে পারি যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে আলাদা আলাদা গুণবৈশিষ্ট্য দান করে যে সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে বিরাট আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যও সক্রিয় রয়েছে। এই আধ্যত্মিকতার মাধ্যমেই নারী ও পুরুষ নিজের জীবনকে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার পরশে উজ্জ্বলতর করে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দেয়। আসলে এটাই হচ্ছে মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা ও পূর্ণাঙ্গতাকে নিশ্চিতকরণের জন্যে মানুষকে নর-নারীতে বণ্টন করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ অর্থাৎ নর ও নারীর কর্ম ও তার কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা কোনো বুনিয়াদি লক্ষ্য নয়; বরং এটা হচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহজ ও সুন্দর উপায় মাত্র। ঠিক এই উপায়েই মানুষ তার স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং এরই মাধ্যমে তার জীবনের পরম সাফল্য অর্জিত হয়।

যেহেতু মহাপ্রকৃতি এই বিপুল সৃষ্টি বৈচিত্র্যের স্বয়ং কোনো তাৎপর্য নেই; কিন্তু যেহেতু এসবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় তাই এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকৃত হয়। এজন্যে কেবল মানুষকেই সেই গুণ ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। এই স্বীকৃতিই মানুষকে সত্যের সাথে পরিচিত করে। সুতরাং মানুষের পুরো দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে শুধু এই জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর অস্তি ত্বের সত্যতা বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে অর্থাৎ শুধু আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করবে।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

"আমি জিন ও মানবকে এছাড়া আর কোনো কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি যে তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।"[২২৩]

সুতরাং জীবনের যেকোনো সমস্যায় মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর এই পরম উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে হবে। এভাবে নারীদের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও সেই বুনিয়াদি নীতিকে বিবেচনা করতে হবে। এই জন্যে তার অস্তিত্বের প্রকৃতি, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যে তার স্থান ও মানকে সামনে রেখেই সবকিছু বিচার-বিবেচনা করতে হবে। এটাই হবে আসল বিবেচনা পদ্ধতি। এছাড়া আর সব পদ্ধতি বা চিন্তাধারা চরম ভুল ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে।

অর্থোপার্জনে নারীর দুর্বলতার অর্থ

পূর্বের আলোচনার পর্যালোচনা করলে তার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নারী বা পুরুষের যেকোনো সমস্যার জন্যে তাদের স্বভাব-প্রকৃতিকে সামনে রাখতে হবে। কারণ তার যাবতীয় গুণ ও ক্ষমতা এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। আমরা এই প্রকৃত অবস্থাকে সামনে রেখে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেপরেই তা সত্যিকার অর্থে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব।

এ বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে, নারীর গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তানকে দুধ খাওয়নো, তাদের প্রশিক্ষণ, গৃহস্থালির ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্যে জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব পুরুষকে অর্পণ করা হয়েছে।

স্রষ্টা নর ও নারীর জন্যে যে আলাদা আলাদা স্বভাব ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সীমালঙ্ঘন বা তা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর যদি কেউ তার নির্ধারিত স্বভাব ও কর্মের সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তাতেকরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলির সৃষ্টি হবে। চুম্বকের যেমন আকর্ষণ শক্তি ও স্বভাবকে অস্বীকার করা যায় না এবং তেমনি বরফের স্বভাব চুম্বকের মতো আকর্ষণশীল নয়। কেননা উভয়ের গঠন ও গুণপ্রকৃতি আলাদা আলাদা। এভাবে প্রতিটি বস্তুরই পৃথক পৃথক গুণ ও প্রকৃতি রয়েছে। এসব গুণ ও প্রভাব অস্বীকার করা একান্তই কঠিন। যদি কোনো বস্তুর গুণ ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয় তাহলে সে বস্তু তার মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য হবে। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এই সত্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর বাণী। সুতরাং পুরুষ নারী হতে পারে না আর নারীও পুরুষ হতে পারে না।

---

[২২৩] সূরা জারিয়াত–৫৬।

একইভাবে তারা একে অন্যের কর্ম ও দায়িত্বের সীমায় অনুপ্রবেশও করতে পারে না। যদি করে তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং তাদের মৌলিকত্বও খর্ব হবে। এই জন্যে ইসলাম নারী ও পুরুষের কর্ম ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীর জন্যে তার নারীত্বই যথেষ্ট। তার ওপর জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব চাপানো যাবে না। ইসলাম সেই দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। নারী ও পুরুষের কর্ম ও দায়িত্বের ক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের স্বভাব প্রকৃতি, ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে সামনে রেখেছে এবং এ জন্যে তাদেরকে পরস্পরের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বের সীমানায় অনুপ্রবেশ করতে নিষেধ করেছে।

নারী ও পুরুষের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব নির্ধারণ সম্পর্কে ইসলামে ব্যাপকভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ বিধি-ব্যবস্থা আছে। এসব বিধি-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ এবং বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক মান ও গুণকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে ইসলামের বিবাহ বা দাম্পত্য-বিধি, মা ও সন্ত ানসংক্রান্ত বিধি, ওয়ারিশ সূত্র বা উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা ইত্যাদি নীতি অত্যন্ত বাস্তবসঙ্গত, সুবিচারপূর্ণ এবং সার্বজনীন কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

নারী তার বুকের দুধ খাইয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে আর তার আগে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাকে জন্ম দেওয়ার জন্যে গর্ভে ধারণ করে। অন্যান্য সবকিছু বাদ দিলেও জীবন গঠনে নারীর এই দুটি অবদানের ঋণ মানবতা কোনোদিনই শোধ করতে পারবে না। নারীর এই মহত্তম ও কঠিনতম দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে সংসারের অন্য সব কায়কসরৎ থেকে মুক্তি দান করেছে। এত বড় দায়িত্ব পালনের পর তার ওপর জীবিকা অনুসন্ধানের দায়িত্বও চাপিয়ে দেওয়া বিরাট অবিচার হবে। আল্লাহ নারীর মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা, নম্রতা-কোমলতা, সহানুভূতি ইত্যাদি মহৎ ও সুন্দর উপলব্ধি দান করেছেন এবং তা দাম্পত্য-বিধি ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যে ছিল একান্তই জরুরি।

স্ত্রী তার স্বামীকে এবং মা তার সন্তানকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখার জন্যে কতো যে চেষ্টা-সাধনা করে তার কোনো সীমা নির্ধারণ নেই। এর জন্যে তারা অসংখ্য দুঃখকষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে পিছপা থাকে না। মা তার সন্তানের স্বার্থে জীবনবাজি লাগিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। নিজে শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও সন্তানকে সুখে ও নিরাপদ রাখার চেষ্টা-সংগ্রামে নিবেদিতা মাকে নিজের জন্যে সবরকম আরাম-আয়েশের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়।

নারী তার সুস্থ সবলদেহী স্বামী অথবা তার যোগ্য উপযুক্ত সন্তানকে দেখতে পেয়ে জীবনের পরম আনন্দ ও সার্থকতা অনুভব করে। তার শান্ত ও নভ্র স্বভাব চায় তার স্বামী ও ছেলে ব্যক্তিত্ববান হয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিক।

অন্যদিকে প্রতিটি স্বামীই তার স্ত্রীর কাছে স্বস্তি, সান্ত্বনা ও ভালোবাসা কামনা করে। স্ত্রীর অবর্তমানে সারা দুনিয়া তার কাছে নিরস ও অর্থহীন মনে হয়। সে তার পূর্ণ শক্তি ও সক্ষমতা সত্ত্বেও নারীর শান্ত-শুভ্র সংস্পর্শের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ স্ত্রীর সংস্পর্শই তার মধ্যে সেই অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে যার মাধ্যমে সে পায় দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস। আর এই উপায়েই তার মনে সৃষ্টি হয় নতুন কল্পনা ও আবেগ-উদ্দীপনা।

পবিত্র কুরআনে নারীর এই গুণাবলিকে ব্যাপক অর্থে বোঝানোর জন্যে 'স্বস্তি' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

আসলে নারীর সব গুণ ও অবদান হচ্ছে এই স্বস্তিরই ফলাফল। এই মাধ্যমে দেহ ও আত্মার পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা এবং সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। এই স্বস্তিই হচ্ছে জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি যা মানুষ কেবল নারীর কাছ থেকে পেতে পারে। তাই নারীর এত বড় অবদানের পর তাকে তার কর্মসীমার বাইরে কাজ করতে বাধ্য করা কোনো অর্থেই সুবিচারপূর্ণ হতে পারে না।

এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীর জন্যে তার স্বভাবধর্ম ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারী তার জীবনের গুরুত্ব, মর্যাদা ও কর্তব্য জেনে ও বুঝে নিতে পারে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে। সুতরাং নারীর স্বভাব, সক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কর্মক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা নারীর জন্যে পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমপর্যায়ের অর্থাৎ নারী ও পুরুষের একই শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার বা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাগ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রকৃতিই তাদের স্বভাব ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্র বণ্টন করে রেখেছেন, সে হিসেবে তাদের শিক্ষার ধরন-ধারণ ও বিষয়াবলিও হবে আলাদা আলাদা। নারীকে ততটুকু জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যতটুকু তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যে জরুরি। অনুরূপভাবে পুরুষকেও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে। যেখানে দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উভয়ের গুণাবলি ও ক্ষমতা সম-মানের সেসব ক্ষেত্রে উভয়কে একই রকম জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নর ও নারীর আবেগ অনুভূতির দিকেও বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। এখন কেউ বলেন যে, পুরুষকে যেসব নম্র ও কোমল আবেগ অনুভূতি দান করা হয়েছে তাতেকরে পুরুষ চাইলে নিজ দায়িত্ব পালনের সাথে নারীদের কোনো কোনো দায়িত্বও পালন করতে পারে। একইভাবে নারীকেও যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে তাতেকরে সে চাইলে পুরুষের মতো অর্থ উপার্জনের দায়িত্বও পালন করতে

পারে। মেনে নিলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সম্ভব হতে পারে; কিন্তু তা উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর হবে। কারণ পুরুষ যদি নারীসুলভ হাত দেয় বা নারীর কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তার বিশেষ ক্ষমতার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তার পৌরুষও শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের জন্যে অক্ষম ও অযোগ্য হয়ে পড়বে। গোটা সমাজজীবনে ভীষণ বিশৃঙ্খলা এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে। একই কথা নারীর বেলায়ও প্রযোজ্য। নারী যদি তার স্বাভাবিক কর্মসীমা ডিঙিয়ে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তার নারীত্বের দায়িত্ব অসমাপ্ত পড়ে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে সে তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যও হারিয়ে বসবে। এভাবে গোটা মানবতা এক মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। অথচ মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ শুধু তখনই সুনিশ্চিত হতে পারে যখন নারী ও পুরুষ উভয়ই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরকে পরস্পরের দায়িত্ব পালনে সাহায্য-সহযোগিতা করে; কিন্তু নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতার পরিবর্তে তারা যদি একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয় বা একে অন্যের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে তাহলে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। আর তা হবে প্রত্যেকের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং তাদেরকে স্বভাব, ক্ষমতা, আবেগ, অনুভূতি মোতাবেক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলাম এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তাদের কর্মসীমা নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি জারি করেছে। এছাড়া নারীর এমন কয়েকটি প্রাকৃতিক সমস্যা ও অপারগতা রয়েছে যার কারণে সে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পালনে অসুবিধার সন্মুখীন হয়। যেমন, তার মাসিক ঋতু, সন্তান গর্ভধারণকালে ও প্রসবের পরবর্তী নেফাস, সন্তানকে দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে নারীকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব সমস্যার আলোকে আমরা চাই সংশ্লিষ্ট সকল বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলে ধরি যা জানা ও বুঝা প্রত্যেকের জন্যেই জরুরি এবং এজন্যেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিরাট অংশ নারীর এসব প্রাকৃতিক সমস্যা ও অসুবিধার আলোচনা ও স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়নে ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে নারীর প্রতিটি দৈহিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিশেষ লক্ষণ ও প্রভাবের বর্ণনা রয়েছে এবং এক একটি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা জরুরি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা নিচে বর্তমান শতাব্দীর মহান চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী সংস্কারক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর রচিত গ্রন্থ 'পর্দা ও ইসলাম' থেকে একটি গবেষণামূলক সারাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন–

"জীববিজ্ঞানের গবেষণা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নারী তার আকার-আকৃতি এবং প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নিয়ে নিজ দেহের অণু ও স্নায়ুকোষ

পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই পুরুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। যে সময় মাতৃগর্ভে শিশুর মধ্যে লিঙ্গ গঠন (ঝউঢ ঝঙজগঅএঞওঙঘ) শুরু হওয়ার সময় থেকেই লিঙ্গের দৈহিক কাঠামো পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। প্রাপ্তবয়স্ক অর্জনের পর মাসিক ঋতুর ধারা শুরু হয়, যার প্রভাবে তার শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া প্রভাবিত হয়। জীববিজ্ঞানী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক জানা যায় যে, মাসিক ঋতুকালীন অবস্থায় নারীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়–

১. শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি কমে যায়। এজন্যে বেশি তাপ নির্গত হওয়ার ফলে তাপমাত্রা নেমে যায়।

২. নাড়ি লঘু হয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, রক্তকোষের সংখ্যায় পার্থক্য সূচিত হয়।

৩. (ENDOCRINES),গলায় হাঁড় (TONSILS) এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন সূচিত হয়।

৪. হজম ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং স্নায়ুশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. গাঁটে গাঁটে অলসতা, আবেগ-উদ্দীপনায় ভাটা দেখা দেয় এবং স্মরণ ও চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি কমে যায়।

৬. এসব পরিবর্তন একজন সুস্থ নারীকে রুগ্নাবস্থার এতটা নিকটতর করে দেয় যে, তখন সুস্থ-অসুস্থতার মধ্যে প্রভেদ করাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও গবেষক ডা. এ্যামিল লোভেক বলেন–

"ঋতুবতী নারীদের মধ্যে সাধারণত যেসব লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, অঙ্গ শিথিলতা, স্নায়ু দৌর্বল্য, হীনম্মন্যতা, অস্বস্তি, বদহজম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কখনো কখনো বমি বা বমি বমি ভাব।" ডা. লোভেক তাঁর মতের সমর্থনে বিভিন্ন গবেষক বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের অভিমতের উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ঋতুকালীন অবস্থায় নারী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে।" সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী তাঁর গ্রন্থে আরো বলেন–

"ঋতুকালীন অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন অবস্থা হয় আরো কঠিন। এ সম্পর্কে ডা. রিপ্রেভ বলেন, 'গর্ভকালীন অবস্থায় নারীর ক্ষমতা কোনোভাবেই দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের সেই বোঝা গ্রহণ করতে পারে না যা সে গর্ভকালীন অবস্থা ছাড়া অন্যান্য সময় করতে পারে। এ সময় নারী যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, যদি কোনো পুরুষ বা গর্ভহীন নারী সেই অবস্থায় পড়ে তাহলে তাদের নিশ্চিত রোগী বলে সাব্যস্ত করা হবে। এমতাবস্থায় বেশ কয়েক মাস যাবৎ তার স্নায়ু ব্যবস্থা

দুর্বল থাকে এবং তার মানসিক ভারসাম্যও বিগড়ে যায়। তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তখন অস্বাভাবিকতার শিকারে পরিণত হয়।' এ কথায় সমর্থনে তিনি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, "এই অবস্থায় নারী প্রকৃতিগতভাবে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম হয়ে পড়ে।" এরপর সন্তান প্রসব ও তার পরবর্তীকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী বলেন– "সন্তান প্রসবের পর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রজননজনিত ক্ষত যেকোনো বিষাক্ত উপসর্গ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। গর্ভের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে তখন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক ধরনের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যা সমগ্র দেহ-ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়। যদিও কোনো আশঙ্কা থাকে না তবুও তার আসল স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগে। এভাবে প্রসবের পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত নারী আসলে অসুস্থ বা অর্ধসুস্থ অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় তার কর্মক্ষমতা অর্ধেক এবং অর্ধেকের চেয়েও নেমে যায়।"[২২৪]

চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার এসব ফলাফল থেকে খুব করে বোঝা যায় যে, মাসিক ঋতু, গর্ভকাল, প্রসব ও তার পরবর্তী অবস্থায় নারীর শরীর ও মন-মেজাজে কি অবস্থা হয়। এসব বাস্তবতার আলোকে ও ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না যে, ইসলাম কেন নারীকে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। আসলে এটা নারীর প্রকৃতিরই দাবি ছিল।

উপরের বর্ণনা থেকে নারীর অপারগতার তিনটি বিশেষ কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো–

১. নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। যেমন– দাম্পত্য বিধি, মাতৃত্ব এবং আবেগ-অনুভূতির নম্রতার কারণে নারী অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

২. সে জ্ঞান-বুদ্ধির ততটুকু অংশ পেয়েছে যা তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের জন্যে জরুরি অর্থাৎ যাতেকরে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিকে ভালো করে বুঝে নিতে পারে; আর তাকে কার্যকরী করতে পারে। অন্যদিকে পুরুষকে ততটুকু জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতেকরে সে তার বাইরের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এজন্যে বাইরের কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপক তাকেই বানানো হয়েছে।

৩. নারীকে ঋতু, প্রসব ও তার পরবর্তীকালে এমনসব অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যা তার মানসিক, শারীরিক সক্ষমতা ও চিন্তাশক্তিকে বিকল করে রাখে। এর বাস্তবতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি।

---

[২২৪] পর্দা : ১৩৯-১৪১।

আধুনিক বিজ্ঞানসংক্রান্ত এসব বাস্তবতাকে প্রমাণ করে ইসলামী নীতির বাস্ত বমুখিতা এবং মানবতার জন্যে তার উপকারিতাকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে নারীকে যে তার স্বভাববিরুদ্ধ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে– তাতে সে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আক্কাদ বলেন–

শুরু থেকেই রান্না-বান্না করার দায়িত্ব নারীই পালন করে আসছে। পরিবারের লোকদের খাবার নারীই তৈরি করে থাকে। তা নারী আধুনিক উন্নত সমাজের হোক বা পশ্চাদপদ কোনো উপজাতির, সে স্বাভাবিকভাবে রান্নাবান্নার কাজ সম্পাদন করে। আর আজ হাজার হাজার বছর পরও যখন আমরা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছি তারা এখনো পুরুষের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। পুরুষ যেসব কর্মকে অনায়াসে আয়ত্ত করে নিতে পারে তা শেখার জন্যে নারীকে সীমাহীন কাঠিন্যের মুখোমুখি হতে হয়, এরপরও তার মধ্যে আস্থা বা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় না। যেমন, প্রাচীন যুগ থেকেই নারীকে সেলাই ও রকমারি সুচিকার্য শেখানো হচ্ছে এবং এখনো তার প্রচলন রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের নারী নিত্যনতুন ফ্যাশন আর সুচিকর্মের ব্যাপারে পুরুষের ওপরই অধিকতর নির্ভরশীল। সে নিজের কাজের ওপর সন্তুষ্ট নয়। এজন্যে দেখা যায় যে, নারী তার এই চিরাচরিত কাজটি শেখার জন্যে সেসব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়– যার দায়িত্বশীল হয় পুরুষ; কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরাই দায়িত্ব পালন করে তার নারী হয়েও সেসব প্রতিষ্ঠানের দিকে এগোয় না।[২২৫]

এরপর অধ্যাপক আক্কাদ কয়েকটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন অতীতকাল থেকে এসব নারীদেরই পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসা সত্ত্বেও তারা এসব ক্ষেত্রেও পুরুষের পেছনে পড়ে রয়েছে; অথচ পুরুষজাতি সম্প্রতি এসব মেয়েলি কর্মে হাত দিয়েছে।

দুজন ডাক্তার এর মধ্যে একজন একটি বিশেষ চিকিৎসা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন– আমাকে জানিয়েছেন যে, "মহিলা ডাক্তারের তুলনায় পুরুষ ডাক্তারকে নারীসংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার জন্যে বেশি উপযুক্ত মনে করা হয়ে থাকে; কিন্তু কোনো কোনো লোকের ধারণা ছিল যে, আজকাল বিশেষকরে মুসলিম দেশগুলোতে মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন নারীসংক্রান্ত রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা তারা নিজেরাই উত্তমভাবে করতে পারে এবং পুরুষ ডাক্তারেরা এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাবে; কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে

---

[২২৫] আল মরিয়া-আল কানুন-পৃষ্ঠা–৬,৯,১০।

প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধারণা যথার্থ ছিল না এবং নারীসংক্রান্ত রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্যে পুরুষ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে।"

এভাবে বিখ্যাত চিন্তাবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ যাকী আবদুল কাদেরী আস্সাহফী বলেন–

"সেদিন দূরে নয় যখন নারী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও অচল হয়ে পড়বে- যেভাবে তারা কর্মের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বিভাগেও অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। কারণ উল্লেখিত বিভাগসমূহের পেশাগত দায়িত্বে যে সাধনা ও পরিশ্রমের দরকার হয় তার চেয়ে অনেক বেশি সাধনা ও পরিশ্রমের দরকার হয় রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। তা তারা যদি এসব ময়দানে চলতে না পারে, তাহলে তাদের কাছ থেকে কোনো উন্নতির প্রত্যাশা কিভাবে আশা করা যেতে পারে? বস্তুত তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে তাদেরই বিশেষ কর্ম পালনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ীই তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে।"[২২৬]

নারীদের কর্মতৎপরতা ও ইসলাম

নারীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের দৃষ্টি রাখা জরুরি। এর একটি হলো তার স্বভাব-প্রকৃতি এবং অন্যটি হচ্ছে শরীয়তের বিধান।

১. মহিলাদের কোনো কর্মকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করা যাবে না যতক্ষণ না তাতে কোনোরকমের পাপবোধ প্রকাশ পায়। ইতিহাসের সকল পর্যায়ে নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ-কর্মও করে আসছে। অবশ্য এসব প্রাসঙ্গিক কাজ-কর্মকে কখনো প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন নারী সব যুগেই রান্নাবান্না, সেলাই, সুচিশিল্প, সুতো কাটা, ফুলতোলা ইত্যাদি কর্মে সবসময়েই অংশ নিয়ে আসছে, এর সাথে সাথে সে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর সেবা-যত্ন ইত্যাদি তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্বও পালন করে আসছে।

এসব কাজ সে স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক স্বভাবের তাগিদেই করে থাকে। তাকে এসব বাড়তি কাজ করার জন্যে জোর-জুলুম করা হয় না। এসব কাজকর্ম যদিও তার বুনিয়াদি দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি পুরো আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে নারী এসব করে থাকে।

---

[২২৬] আখবারুল ইখওয়ম পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

ইসলাম কাজকর্মের বণ্টনের সময় এই বাস্তবতাকেও বিবেচনাধীন রেখেছে যা তাদের মানবিক স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা) যখন প্রিয়নবীকে তাদের নিজ নিজ কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখর প্রিয়নবী হযরত আলীর ওপর বাইরের কাজকর্মের দায়িত্ব এবং হযরত ফাতেমার ওপর ঘরোয়া কাজকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ইসলাম একসাথে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে যে, ঘরে থেকে ছেলে-মেয়ের লালনপালন ও প্রশিক্ষণ এবং স্বামী-সেবার দিকে মহিলাদের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই বেশি। আর তা তার বুনিয়াদি দায়িত্বের পরিপন্থিও নয় বরং এতেকরে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো মজবুত হয়ে ওঠে।

স্ত্রী যদি কোনো বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে থাকে এবং ঘরের পরিবেশে তা করতে চায় এবং তাতেকরে তার আয়-উপার্জনও হয় তাহলে তাকে তার কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়; বরং স্ত্রীকে কর্ম করতে দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সে তার আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু সেই কাজেই লেগে থাকবে।

যেহেতু প্রতিটি কুমারী মেয়েকেই কোনো না কোনো দিন কারো স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে যেতে হয় এই জন্যে বিভিন্ন পারিবারিক ও দাম্পত্য জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম তার অধিকার স্বীকার করে; যাতেকরে সে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের সমস্যাদি সমাধানের পন্থা জানতে পারে। সে এমন শিক্ষা অর্জন করবে যায় মাধ্যমে সে তার কর্মক্ষেত্রের যাবতীয় বর্তমান বিষয়াদি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয়াদির ব্যাপারে অবহিত হতে পারে।

১. প্রকৃতিগতভাবে যেহেতু নারীকে এরূপ বানানো হয়েছে, এজন্যে তার এসব কাজকর্ম কোনো ভ্রান্তি বা সন্দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; বরং যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা অর্জনের মতো ক্ষমতা এবং গুণাবলিও তাকে দেওয়া হয়েছে।

ঘরবাড়ি হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে। ঘরবাড়িতে অবস্থান করে নারী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে এবং এই ঘরবাড়িতে অবস্থান করেই সে যাবতীয় বিপদ ও অপমানের তাপ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ঘরবাড়িতে সে পায় পরম সুখ-স্বস্তি ও অনাবলি আনন্দ। তাই ঘরবাড়িকেই নারীর ভূস্বর্গ বলা হয়ে থাকে এবং ইসলাম এ বাস্তবতার দিকে লক্ষ রেখেই বলেছে–

"তোমরা যেমন তাদেরকে তাদের ঘরদোর থেকে বের করবে না তেমনি তারা নিজেরাও বের হবে না।"[২২৭]

---

[২২৭] তালাক-১।

এই আয়তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন–

"স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কোনো অধিকার কোনো স্বামীরই নেই এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া স্ত্রীর জন্যেও বৈধ নয়।"[২২৮]

এই আয়াতটি আসলে ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতের ধারাবাহিকতাতেই নাযিল হয়েছে; কিন্তু এর আদেশ সাধারণ স্ত্রীদের বেলায়ও সমানভাবে কার্যকরী হবে। ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আরাবী বলেন–

"ইদ্দতকালীন অবস্থায় নারী নিজের ঘর থেকে মোটেই বেরুবে না, অবশ্য অপরিহার্য প্রয়োজনে বেরুতে পারবে আর তখন সে সাধারণ স্ত্রীদের মতোই বেরুতে পারবে, কারণ ইদ্দত বিয়েরই অন্যতম শাখা।"[২২৯]

ফিকাহ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞদের মতে আল্লাহ তাঁর বাণীতে নারীদের ব্যাপারেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ ঘর প্রকৃত অর্থে স্বামীদের মালিকানায় হওয়া সত্ত্বেও তা নারীদের ঘর বলেই বলা হয়েছে। কারণ নারীকে সারা জীবন তার স্বামীর ঘরেই থাকতে হয় এবং বিনা দরকারে সেই ঘর থেকে বেরুবারই অনুমতি নেই। এ জন্যে ঘরকে নারীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২৩০]

আল্লামা কাসানী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–

"বিয়ের পর নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ আর তা এ জন্যেই যে, পবিত্র আয়াতের আদেশমূলক পরিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।"[২৩১]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর পক্ষে ঘরে অবস্থান করাটা তার প্রকৃতি এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরি। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সে বাইরে বেরুতে পারে। সেই স্বাধীনতা তার রয়েছে তবে তা লাগামহীন হবে না। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন–

"মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না; কিন্তু তাদের গৃহ তাদের জন্যে অধিকতর উত্তম।"[২৩২]

যেহেতু ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ মানুষের জীবনে হতে পারে না, তাই নারীদেরকেও ইবাদতের জন্যে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে এটাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নারীদের জন্যে ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে উত্তম। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, ঘরকে

---

[২২৮] জামেউল আহকামূল কোরআন ঃ অষ্টাদশ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।
[২২৯] আহকামূল কুরআন : ইবনে আরাবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।
[২৩০] আহকামূল কুরআন লিল জাস্‌সাস।
[২৩১] বাদায়েউ সমান্না'লিল কাসানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩।
[২৩২] আবু দাউদ।

মসজিদের চেয়ে উত্তম বলা হচ্ছে। না, তা নয়। এটা শুধু নারীদের সুবিধার্থেই বলা হয়েছে। নয়তো অন্যান্য অনেক হাদিসের বর্ণনা মোতাবেক পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে মসজিদ; কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থানের চেয়ে নারীদের জন্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার গৃহকে। এর উদ্দেশ্য হলো তার মান-মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করা। কারণ ঘরের বাইরে নারী যেকোনো সমস্যা বা বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে। মহিলাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এ ছিল দুটি বিষয়। এই দুটি বিষয়কে বিবেচনাধীনে রাখলে কোনো ভুলভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

প্রথমত, এই যে আনুষঙ্গিক কাজকর্মে তৎপর হওয়া ভালো, তবে লক্ষ রাখতে হবে, যেন তার আসল দায়িত্বে অবহেলা না করা হয়। কারণ তাতেকরে তার নারীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ব্যাহত হবে।

দ্বিতীয়ত, এই যে, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে নারীর স্বাভাবিক স্থান হচ্ছে তার গৃহ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই তার জন্যে এ স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং বিনা দরকারে ঘর থেকে বেরুনো তার জন্যে উচিত নয়। ইমাম মালেকের ভাষায় তার উদ্দেশ্য হচ্ছে– "সে সব ক্ষতি ও বিপদের হাত থেকে বেঁচে থাকা যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।"

ইসলাম নারীদের তাদের স্বভাবসম্মত ক্ষেত্র সীমায় থেকে যেকোনো রকমের দৈহিক ও মানসিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে। কোনো নারী শহরে হোক বা গ্রামে, বেতনধারিণী হোক বা অবৈতনিক যেকোনো কর্ম করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে– সে লেবাসে, পোশাকে, চরিত্রে, শিষ্টাচারে, ব্যবহারে ইসলামের নির্ধারিত নীতি ও ব্যবস্থাবলি মেনে চলবে এবং পর-পুরুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করবে না।

ইসলাম নারীদেরকে খেত-খামারে গিয়ে কাজ করার এবং নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বেচা-কেনা করার স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন তার নিজের জন্যে বা পরিবারের লোকদের জন্যে খাদ্যদ্রব্য বা পোশাক-পরিচ্ছদ কেনাকাটা করতে পারে। এছাড়া সে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যেও বেরুতে পারে। যেমন কোনো ওয়াজ-নসীহত বা ইসলামী আলোচনা, সভা-সম্মেলন ইত্যাদিতেও অংশ নিতে পারে যাতে তার নিজের বা অন্যান্যদের কল্যাণ রয়েছে।

মুসলিম শিক্ষিতা নারী মানুষের দ্বীনি সমস্যাবলিতে অভিমত বা রায় দিতেও পারে এবং সিদ্ধান্তও ঘোষণা করতে পারে। কারণ ইসলামী আইনবিধি মোতাবেক অভিমত বা রায় দেওয়ার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বিচার করার যোগ্যতাও রাখে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় তারা মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্যে রণাঙ্গনেও যেতে পারে। যেমন আহত সিপাহীদের চিকিৎসা, পথ্য ও ওষুধ সেসব এবং ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজ করতে পারে। নির্ভরযোগ্য নিখুঁত বর্ণনা মোতাবেক প্রিয়নবীর আমলে মুসলিম মহিলারাও প্রিয়নবীর অনুমতি নিয়ে জিহাদের ময়দানে যেতেন। সিপাহীদের দেখাশোনা, ব্যান্ডেজ বাঁধা এবং অন্যান্য চিকিৎসাদী করার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমদ বিনতে মউজের উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন– "আমরা প্রিয়নবীর সাথে জিহাদে যেতাম, আমাদের কাজ ছিল সিপাহীদের খেদমত করা, তাদের পানি সরবরাহ করা এবং হতাহতদের মদিনায় পৌঁছানো।"

শুধু তাই নয় মুসলিম নারী রণাঙ্গনে অস্ত্র পরিচালনাও করতে পারে। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মোতাবেক আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী রমীসা (রা) হুনাইন যুদ্ধের সময় একটি খঞ্জর নিজের কাছে রাখেন– যখন তাঁর স্বামী এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি জবাবে বলেন, এটা দিয়ে আমি তার পেট চিরে দেব। এ খবর প্রিয়নবীর কাছে পৌঁছালে তিনি এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি প্রকাশ করেননি। ইবনে হাজাম বলেন, নারীকে বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফাও এই মতের সমর্থন করেন। হযরত ওমর সিকা নামক এক মহিলাকে হাটবাজার সংক্রান্ত বিষয়াবলির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।

নারীদের এসব দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে যদি এই হাদিসটির উল্লেখ করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"কোনো জাতি কল্যাণ পেতে পারে ন যদি তার বিষয়াদির চাবিকাঠি নারীর হাতে থাকে।"

আসলে এ কথাটি প্রিয়নবী ﷺ খিলাফতের সাধারণ বিষয়াবলি সম্পর্কে বলেছেন। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর অন্য একটি হাদিস হচ্ছে–

"নারী তার স্বামীর ধনসম্পদের সংরক্ষণকারিণী। তাকে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

এ হাদিস মোতাবেক ইমাম মালিক একথা বলেছেন যে "নারীকে তত্ত্বাবধায়ক, কৌসুলি এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়াদির দায়িত্বশীল হিসেবেও নিয়োগ করা যেতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই।"[২৩৩]

---

[২৩৩] মুহাল্লা-নবম খণ্ড-৪২৯-৪৩৫।

মহিলাদের চাকরি-বাকরি

উপরের আলোচনা থেকে এটা জানা গেল যে, কোন মহিলা একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া বাইরে যাবে না এবং দরকারবশত গেলেও ঘরসংসারের আসল দায়িত্ব ভুলে গিয়ে অন্য কোনো কাজে দিনমান নষ্ট করে আসবে না। সুতরাং কোনো মহিলার জন্যে ঘরসংসারের দায়িত্বে অবহেলা করে কল-কারখানা বা দোকানপাটে অন্য কোথাও নিয়মিত চাকরি করতে যাওয়া বৈধ নয়, যেমনটি আজকালকার মহিলারা করে বেড়াচ্ছেন। কারণ এভাবে নারীর কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘিত হয়। এভাবে সে তার ক্ষমতা ও গুণাবলিকে এমন স্থানে ও এমন কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস পায় যা তার আদৌ কর্মস্থান নয় বা তার দায়িত্বও নয়। নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। তাছাড়া বাইরে চাকরি করতে গিয়ে আরো কতো যে অবাঞ্ছিত বিড়ম্বরার সম্মুখীন হতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। যেসব মহিলা চাকরি করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা নিচে আলোচনা করছি।

প্রথমত, সাধারণত তাদেরকে ভোরে কর্মস্থলে রওনা হয়ে যেতে হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাদেরকে এই রুটিন মেনে চলতে হয়। এমনকি জীবনের শেষ দিকে এই চাকরি থেকে তারা অবসর গ্রহণ করে অথবা অযোগ্যতার জন্যে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই নিত্যদিনের বহির্গমন সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে তাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয় অনেক বেশি এবং তা শান্তি, স্বস্তি ও শৃঙ্খলারও পরিপন্থি। এছাড়া স্ত্রী যখন স্বামীর মতো স্থায়ী আয়-উপার্জন করবে তখন তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা হারাবে তেমনি উভয়েই শান্তি ও স্বস্তির জন্যে উম্মুখ হয়ে থাকবে। উভয়েই সারাদিনের ক্লান্তির পর যখন ঘরে ফিরবে তখন উভয়েই পরদিন ভোরে চাকরিস্থলে যাওয়ার আগে তরতাজা হওয়ার জন্যে কারো সহযোগিতার প্রত্যাশা করবে। এভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যখন ঘরের বাইরে চাকরিতে থাকবে তো ঘরসংসারের ব্যবস্থাপনা কে সামলাবে আর স্বামীরা শান্তি আর স্বস্তি খুঁজতেই বা কোথায় যাবে? সারা দিনের ক্লান্ত স্ত্রী তাকে তার প্রত্যাশিত শান্তি ও স্বস্তি যোগাতে পারবে কি? পারবে কি তাকে সজীবতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে?

এতেকরে বোঝা গেল যে, নারীর পক্ষে চাকরি করতে যাওয়া তার নিজের জন্যে, স্বামীর জন্যে এবং পারিবারিক তথা সমাজের জন্যে ক্ষতিকর। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অন্যায়। আর আল্লাহ তাদের সুখশান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে যে বিধান দান করেছেন, নারীদের চাকরি সেই বিধানেরও বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, যে চাকরিতে নারীর সময় ও জীবন নষ্ট হচ্ছে, যার চিন্তায় সে সতত উদ্বিগ্ন তা তার চিন্তাধারা, আদর্শ, পোশাক-পরিচ্ছদ, শালীনতা, চরিত্র, রুচি ইত্যাদির ওপরও বিরাট প্রভাববিস্তার করে। তার জীবন হয়ে ওঠে বিরক্তিকর ও বিবর্ণ। মাসের পরে কয়েকটি টাকার লোভে সে তার জীবনের অনেক অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। সে নিজের বিবেকের কাছেও ছোট হয়ে থাকে। পরিণামে তার জীবন জড়পদার্থের রূপ ধারণ করে। সে তখন টাকা ছাড়া আর কোনো বিষয়কে মর্যাদাপূর্ণ বলে ভাবতেই পারে না। সে টাকার প্রতিযোগিতায় পড়ে অন্যের দেখাদেখি দিন-রাত ছুটতে থাকে। পরশ্রীকাতরতা আর অনুকরণের ব্যাধিতে সে এমনই আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, অবশিষ্ট জীবনে তার নিষ্ঠুরতার কবল থেকে মুক্তির কোনো পথই খুঁজে পায় না। ফলে যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্য হলেও শান্তি ও স্বস্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

চিন্তা ও অনুভূতির এই প্রকৃতিই তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দেয়। বেশি থেকে বেশি অর্থ ও স্বার্থের দুশ্চিন্তায় তার মানসিক আত্মা দারুণভাবে পীড়িত হয়। জীবনের সব মূল্যবোধ ও মহৎ চিন্তা বাদ দিয়ে সে কেবল ধন অর্জনের চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর এটাই তার স্বাভাবিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে দুর্লঙ্ঘ অন্তরায় হিসেবে সামনে দাঁড়ায়। এসব কারণে নারীকে বাইরে গিয়ে চাকরি করা উচিত নয়। নারীর অর্থনৈতিক ব্যস্ততা ও জড়বাদী ধ্যানধারণা তার গর্ভধারণের অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা লুপ্ত করে না সত্য; কিন্তু তাতেকরে যে নারীত্বের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ নারীত্ব কেবল দেহ ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সক্ষমতার নামই নয়; বরং তার সাথে সাথে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধি ও মান মোতাবেক চিন্তা ও কর্মের একতা এবং বিশেষ প্রাকৃতিক বিধি অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে নারীত্বের পূর্ণতা ও সার্থকতা। কিন্তু যারা এই মৌলিক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে জড়বাদী কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অবমাননা নিজেরাই করে থাকে। কারণ এতেকরে তারা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্যপথ থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

এখন আসুন, এ ধরনের পরিবেশে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ধরন সম্পর্কে চিন্তা করে দেখি। নারী যে কয়টি টাকার জন্যে তার দেহমনের সব ক্ষমতা বিকিয়ে দেয় তাতে আসলে স্বামী বা পরিবারের কারো কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না; বরং সারাক্ষণ চাকরি ও টাকার চিন্তায় বিভোর থাকার ফলে তার দেহমনের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। ফলে সে যথার্থভাবে স্ত্রী হিসেবে বৃহত্তম দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে যায়। সে কাউকে শান্তি ও স্বস্তি পৌঁছাবে কি করে যখন সে নিজেই তার স্বামীর মতো শান্তি ও স্বস্তি লাভের প্রার্থী হয়ে থাকে?

এছাড়া স্বামীর মতো স্ত্রীও আয় করে বলে তাদের দায়দায়িত্বের মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। এতেকরে তাদের মধ্যে এক ধরনের যে অর্থনৈতিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাতেকরে তারা পরস্পরের পৃথক পৃথক গুরুত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। সুতরাং পরস্পরের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণে ভাটা পড়ে। ফলে নারী তখন এ জন্যে স্বামীকে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না যেহেতু সেও তার মতো টাকাকড়ি আয় করছে এবং সংসারের ব্যয়ভারও নির্বাহ করছে। এরপর বলুন, কেন সে বা তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করবে?

স্বভাব-প্রকৃতি ও আল্লার আইন মোতাবেক বুনিয়াদি কথা হচ্ছে, নারী পুরুষের জন্যে শান্তি ও স্বস্তির উৎস হবে। তা স্বামী কি এমন স্ত্রীর কাছে শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে যে বাইরে অন্য কোথাও কারো অধীনে চাকরি করছে? আর যখন ঘরে ফেরে তখন তার অবস্থা থাকে যে, সে নিজেই শ্রান্তি-ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যে অন্যের সাহায্য কামনা করে। এমন স্ত্রী, যে সারাদিন দৈহিক ও মানসিক খাটুনি আর দৈনিক আয়ের চিন্তায় মুষড়ে থাকে সে স্বামীকে শান্তি ও স্বস্তি পৌঁছানোর বাড়তি ক্ষমতা অবশিষ্ট রাখে কি? উভয়েই যখন একই অবস্থার শিকারে বিব্রত তখন কে কাকে সান্ত্বনা দেবে, কে কার অনুপ্রেরণা যোগাবে? উভয়েই যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত তখন কে কার সেবা যত্ন করবে? উভয়ই যখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে ব্যস্ত থাকে তাহলে ঘরের ব্যবস্থাপনা আর ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ কে দেবে? উভয়ই যখন কাজে রুক্ষ ও খিটখিটে হয়ে থাকে তখন কে কাকে আনন্দ যোগাবে, মিষ্টি কথায় কে কার মন ভুলাবে? স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। এমতাবস্থায় একে অন্যের ওপর যেমন নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না।

বস্তুত গৃহস্থ নারীই কেবল পুরুষকে সান্ত্বনা-স্বস্তি ও আনন্দ যোগাতে পারে। এ ধরনের নারী থেকেই পুরুষ পায় নব উদ্যম ও সজীবতা, পায় উৎসাহ উদ্দীপনা। এ ধরনের স্ত্রীই স্বামীকে দিতে পারে পূর্ণ তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি। এভাবে পুরুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং শক্তি ও নতুন সাহসের সম্ভারে সে হয় উজ্জীবিত।

বলাবাহুল্য, যখন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে শান্তি-স্বস্তি ও অনুপ্রেরণা পাবে না, তখন পুরুষও নারীকে তার কাম্য দৃঢ়তা-সমৃদ্ধি দিতে পারবে না। পারবে না তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। এতেকরে দাম্পত্য ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিয়েটাই হয়ে পড়বে অর্থহীন। পুরুষকে বাইরের কাজের এবং নারীকে ঘরের কাজের যে ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার সব কিছু বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়ে পড়বে। এভাবে আল্লাহ যে বিধান ঘোষণা করেছেন, তার সাথেও সুবিচার করা যাবে না। ফলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার জন্যে শাস্তির ভাগীও হতে হবে।

কেননা, আল্লাহ বলেছেন–

"পুরুষ নারীদের ওপর দায়িত্বশীল, এই বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদে যা আল্লাহ ওদের মধ্যে একে অন্যের ওপর দান করেছেন, এবং এই বুনিয়াদে যে, তারা ওদের জন্যে (মোহর ও ভরণপোষণের আকারে) নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে থাকে।"[২৩৪]

এই হচ্ছে ইসলামের বাস্তবভিত্তিক স্বভাবসম্মত বিধি যা নারীর মধ্যে স্নেহ-মমতা ও ধৈর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে আর পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করে গঠনমূলক কর্মের উদ্দীপনা। এ কারণেই পুরুষ সকল সময় নারীর সাহায্য-সহযোগিতা করে তার ভরণ-পোষণ, কামনা-বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করে। আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে, এসব স্বভাবসম্মত আইন-কানুন ছাড়া পারিবারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন ও স্থিতিশীল হতে পারে না। আর আল্লাহ পুরুষকে পরিবারের দায়িত্বশীল বলে ঘোষণা করে পরিবারের গঠন ও তার স্থিতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষই হবে পরিবারের প্রশাসনিক প্রধান। সকলের সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব তারই এবং পরিবারের সব সদস্য তার সমর্থন ও আনুগত্য করবে। এই হচ্ছে বর্ণিত কুরআনী বিধির বাহ্যিক অর্থ। আর এর আধ্যাত্মিক দিক হচ্ছে এই যে, মানসিকভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই কুরআনের এই বিধির সাথে একমত হবে এবং তা মেনে চলবে; কিন্তু যদি তাদের মধ্যে উভয়ই বা কোনো একজন এই বিধির পরিপন্থি কার্যকলাপে অংশ নেয় বা পরস্পরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ করে তখন কুরআনী বিধির প্রত্যক্ষ উপকারিতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়বে। এভাবে তারা দাম্পত্য সম্পর্কের সুফল এবং পারস্পরিক সম্মান ও সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

নারীর বাইরে বেরুনো এবং চাকরি করার ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের যদি এমনই অবনতি ঘটে, যদি তারা অন্তরের সুখ-শান্তি ও পারস্পরিক ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে– যদি এর ফলে পারিবারিক ভাঙন-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহলে কোন্ যুক্তিতে বলা যাবে যে, নারীর চাকরিতে কোনো লাভ হবে বা দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে? এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করে তাদের কাছে কোনো বাস্তব যুক্তিপ্রমাণ আছে কি? আর ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের অবাস্তব ও অকল্যাণকর কোনো কর্মের অনুমতি দেয় কি?

তৃতীয়ত, বর্তমান সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সত্যতা ও যথার্থ কল্যাণকারিতাকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিশেষকরে

---

[২৩৪] সূরা আন নিসা–৬।

পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের চাকরির ফলে যে সকল তিক্ত পরিণাম পরিলক্ষিত হচ্ছে তা গোটা দুনিয়ার মানুষের সামনে ইসলামী শিক্ষার সত্যতা স্পষ্ট করে তুলছে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদেরকে এতটা লাগামহীন করে দিয়েছে যে, তারা আজ কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারতে অপ্রস্তুত। আজ পাশ্চাত্যের প্রায় সকল যুবক-যুবতী বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং কুমারী মেয়েদের গর্ভপাত ও কুমারী মা হওয়াটা পাশ্চাত্যের এক স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আর চাকরিরত বিবাহিত বা অবিবাহিত সকল মেয়ে বা মহিলাই পরপুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েম করাকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলেই বিবেচনা করে। মোটকথা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও সার্বজনীন ব্যভিচারের ফলে গোটা পাশ্চাত্যই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

এই নির্লজ্জ পাশবিক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম যখন ব্যাপকহারে অবৈধ অর্থাৎ জারজ সন্তানের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তারা এটাকে নিজেদের লাগামহীন যৌন অনাচারের সামনে একটা বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। কারণ জারজ সন্তানের জন্মের পর তারা অন্তত কিছুদিনের জন্যে বেলেল্লাপনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বারে-ক্লাবে আর যত্রতত্র উচ্ছৃঙ্খলা প্রদর্শনের সুযোগ থাকে না। সুতরাং এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তারা গর্ভনিরোধের উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। এখন তারা এ ব্যাপারে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে এ দাবি তোলে যে, সারা জীবন একই পুরুষের সাথে কাটিয়ে দেওয়ার দরকার কি? আর নৈতিক ও চারিত্রিক বিধি-নিষেধই বা মেনে চলতে হবে কেন? এসব বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করে তো আরো অনেক কিছু অর্জন করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্যের আধুনিক নারী এসব চিন্তার শিকারে পরিণত হয়ে যেসব পথ ও উপায় অবলম্বন করে তারই ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যের গোটা সমাজ মারাত্মক পাপাচার আর যৌন ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়েছে। দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত ধসে পড়েছে। বিয়ে-শাদীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সমাজে অবৈধ জারজ সন্তান এবং কুমারী মায়েদের সংখ্যা বিপুলহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা বাহ্যত বিবাহিত জীবনযাপন করছে তাদের মধ্যেও বহুগামী ও বহুগামিনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। আধুনিক সমাজে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির বাস্তব ভিত্তির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মনীষী সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'পদা ও ইসলাম'-এ বলেছেন–

"নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি তাদেরকে স্বামীর মুখাপেক্ষিতা থেকে নির্লিপ্ত করে দিয়েছে। সেই চিরাচরিত নীতি যে, পুরুষ আয়-উপার্জন করবে আর নারী ঘরের ব্যবস্থাবলি সম্পাদন করবে, তা এখন এই আধুনিক নীতিতে পরিবর্তিত

হয়ে গেছে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ই আয়-উপার্জন করবে এবং ঘরের ব্যবস্থাবলি বাজারের ওপর সোপর্দ করা হবে। এই বিপ্লবী পরিবর্তনের পর উভয়ের জীবনে শুধু এক যৌন সম্পর্ক ছাড়া এমন কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট রইলো না, যা তাদেরকে পরস্পরের সাথে জড়িত থাকতে বাধ্য করবে। স্পষ্টতঃই, শুধু যৌন সম্পর্ক এমন কোনো বন্ধন নয়, যার জন্যে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে এক স্থায়ী সম্পর্কের বাঁধনে বেঁধে রাখবে এবং একই ঘরে যৌথ জীবনযাপনের জন্য বাধ্য করবে। যে নারী তার নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করে এবং তার সকল চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ, জীবনে কোনো ব্যাপারে কারো সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষি নয়, সে শুধু যৌন তৃপ্তির জন্যে কেন একটি পুরুষের অনুগত থাকবে? কেন সে নিজের ওপর এতসব চারিত্রিক ও আইনগত বিধিনিষেধ চেপে থাকতে দেবে? কেন সে একটি পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করবে? বিশেষত যখন চারিত্রিক সাম্যের ধারণা তার পথ থেকে সেই সকল প্রতিবন্ধকতাও দূর করে দিয়েছে যা স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আসতে পারে। সে তার যৌনতৃপ্তি লাভের জন্যে সহজ, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দঘন পথ ছেড়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষা ও দায়িত্বের বোঝায় ভারাক্রান্ত সেকেলে পন্থা কেন অবলম্বন করবে? ধর্মের ধারণা বিলুপ্তির সাথে সাথে পাপের চিন্তাও দূর হয়ে গেছে। আর সমাজের ভয় এজন্য নেই যে, সমাজ এখন তাকে ব্যভিচারিণী বলে ভর্ৎসনা করে না বরং তাকে উৎসাহিত করে। শেষ ভয়টি ছিল জারজ সন্তান জন্ম হবার। তার সে ভয় থেকেও মুক্তির জন্যে রয়েছে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাবলি। এসব গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাবলির পরও যদি গর্ভধারণ হয়ে যায় তাহলে গর্ভপাতের উপায় রয়েছে। এতেও যদি সফল না হয় তাহলে শিশুকে চুপচাপ হত্যা করা যেতে পারে; কিন্তু হতভাগিনী মাতৃ অনুভূতি (যা দুর্ভাগ্যবশত এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি) শিশুকে হত্যা করা থেকে বিরত রাখে তাহলে জারজ সন্তানের মা হলেও তাতে কোনো বাধা নেই। কেননা, কুমারী মা এবং অবৈধ সন্তানের পক্ষে এতো বেশি প্রচার হয়েছে যে, এটাকে যারা ঘৃণার চোখে দেখার দুঃসাহস করবে, তাদেরকে উল্টো প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করা হবে। এবং এই অপবাদ মাথা পেতে বরণ করতে হবে। এই হলো সেই অবস্থা যা পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তি ধসিয়ে দিয়েছে।"

চিন্তার বিষয় হবে এই যে, এ পথ অবলম্বন করে যাদের পরিণাম এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আমরা সেই ভুল পথ বাদ দিয়ে কেন আসল পথটি অবলম্বন করবো না? কেবল এভাবেই তো আমাদের সমাজ মারাত্মক পরিণতির কবল থেকে বাঁচতে পারে। যারা অন্যের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সত্যিই ভাগ্যবান লোক। দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর সত্য ও সুন্দর পথে পরিচালনা করেন।

নারীদের অধিকার সম্বন্ধে দুটি বড় অভিযোগ

কর্ম মহিলাদের স্বাভাবিক অধিকার

এই সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মতবিরোধী আপত্তিকারীরা বলে থাকেন যে, "কাজ করা নারীর স্বাভাবিক অধিকার।" কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে কথাটির অর্থ বের করা আপনার জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, কাজ করা সম্পর্কে লোকদের ধারণা কি? এই প্রশ্ন এ জন্যেই উঠবে যে, স্বাভাবিকভাবে এই অধিকার মহিলাদের ওইসব অর্থনৈতিক অধিকারের মতো নয় যার আইনগত সমর্থন রয়েছে। আর তা এমনও নয় যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে রেখেছে; বরং এ কথাটি ওইসব বিধিবিধানের পরিপন্থি বলেই প্রমাণিত হবে এবং ইতঃপূর্বের আলোচনায় আমরা তা প্রমাণও করেছি। মানবস্বভাবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা একথা জানতে পাই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনেক রকমের অধিকার রাখে। যেমন মানুষের এটা অধিকার রয়েছে যে, যেহেতু সে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে তাই তার স্বাধীনতার ওপর কোনো রকমের বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না; কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই এ ধরনের লাগামহীন স্বাধীনতাকে কখনো সমর্থন করে না। একই কথা নারীদের তথাকথিত অধিকার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এটা জেনে রাখতে হবে যে, নারীকেও এ ধরনের অযৌক্তিক লাগামহীন স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে না যার ফলে তার নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বিপন্ন হতে পারে। শুধু তাই নয়, লাগামহীন স্বাধীনতার ফলে নারী তার আসল অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আর তার আসল অধিকার এই সে এক আদর্শ স্ত্রী, মা এবং গৃহকর্ত্রী হবে– এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই; বরং প্রতিটি নারীকে তার এই মৌলিক অধিকার দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র নারীর এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়।

এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক যোগ্যতাই মানুষকে কোনো অধিকারের উপযুক্ত করে– সেখানে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে অধিকার সে অর্জন করেছে তা থেকে উপকৃত হবার চেষ্টাও সে করবে। অর্থাৎ অধিকার হচ্ছে এমনই এক ফরয যা থেকে পালিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। মানুষ স্বাধীন ঠিকই; কিন্তু তাই বলে অন্য কোনো মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে তামাশা করার অধিকার তার নেই। একইভাবে কেউ নিজেকে নিজে অপমানিত করার স্বাধীনতাও পেতে পারে না। অর্থাৎ স্বাধীনতা হবে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক, স্বাধীনতা হবে সার্বজনীন। এমনকি কেউ এমন কোনো কর্ম করতে পারবে না যার কারণে তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদারও হানি হতে পারে।

যেমন প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন–

"কোনো মুমিনের (জন্যে) এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে নিজে অপমানিত করে বসবে।"[২৩৫] এ থেকে স্বাধীনতা ও অধিকারসংক্রান্ত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং নারী তার নারীত্বের অধিকার নিয়ে যখন কারো স্ত্রী, কারো মা এবং গৃহকর্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করবে তখন তার ওপর এই দায়িত্বও বর্তায় যে, সে তার জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলিও পূরণ করবে। যাকে আমরা খোদায়ী নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করে এসেছি। ইসলাম নারীর এসব অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং স্পষ্টভাবে বিধি-বিধান জারি করেছে। এখন সে তার অধিকার এবং দায়িত্ব কোনোটাকেই অবহেলা করতে পারবে না এবং এ ধরনের অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শনের কোনো অধিকারও তার নেই।

নারীদের অধিকার ও দায়িত্বসংক্রান্ত ইসলামের এসব নীতি ও বিধির বাস্তবতা অস্বীকার করা কোনো বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো নারীর এই স্বাধীনতা বা অধিকার নেই যে, সে তার আসল কর্মক্ষেত্র গৃহ এবং তার আসল দায়িত্ব বাদ দিয়ে চাকরির পেশা অবলম্বন করবে। কারণ এটা তার আসল অধিকারকেই খর্ব করবে। এথেকে এখন এ কথা আরো পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, "বাইরে চাকরি করার এই অধিকার যেমন তার অর্থনৈতিক অধিকার বলে গণ্য নয় তেমনি ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটা তার স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তও নয়। এরপরও এটা বলব "নারীর জন্য বাইরে চাকরি করার অধিকার রয়েছে?" নিছক বাড়াবাড়ি ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের কথার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই।

মহিলাদের উৎপাদনশীল ক্ষমতা

যেকোনো কর্মের প্রতিফল হিসেবে সুফল ও কল্যাণের প্রত্যাশা করা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তামাম দুনিয়ার উন্নতির ভিত্তিপ্রস্তর বলে বিবেচিত হয়। এজন্যেই মহান স্রষ্টা "আল্লাহ যেকোনো কর্মের পূর্ণাঙ্গতা, সৌন্দর্য এবং শৃঙ্খলাকে বাধ্যতামূলক" করে দিয়েছেন।[২৩৬] এবং "আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দা যখন কোনো কাজ নিজের হাতে নেয় তখন তা যেন সুচারুরূপে এবং দক্ষতার সাথে করা হয়।"[২৩৭]

---

[২৩৫] ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুখারী শরীফ থেকে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন।

[২৩৬] আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

[২৩৭] হাদিস বায়হাকী শোআবুল ঈমান।

এখন প্রশ্ন ওঠে, কোনো দুর্বল বা অনভিজ্ঞ লোক যদি কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে তাহলে যথার্থভাবে সে কাজ করা কি তার পক্ষে সম্ভব? অথচ দৈহিক এবং মানসিকভাবে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম করার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই।

এ থেকে অবশ্য আমরা শুধু এটাই বুঝাতে চাচ্ছি না যে, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীদের অনুপ্রবেশের ফলে বিরাট বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মহিলাদের চাকরিতে নেমে আসার ফলে যোগ্য ও সক্ষম পুরুষরা চাকরির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; কিন্তু নারীদের চাকরির ফলে কল-কারখানার উৎপাদন যে হারে কমে গেছে এবং নারীদের অযোগ্যতা ও অব্যবস্থার ফলে অফিস-আদালতে যেভাবে স্বাভাবিক কাজকর্মের গতি ব্যাহত হচ্ছে, তার দিকে অবশ্যই আমরা ইঙ্গিত করবো। এ থেকে আজ এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দৈহিক ও মানসিকভাবে দুর্বল নারীদের পক্ষে কোনোভাবে ওসব কাজকর্ম করা সম্ভব নয় যা পুরুষের পক্ষে সহজেই সম্ভব। অবস্থা যখন এই, তখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, এসব জেনেবুঝে-দেখেশুনেও কেন নারীদের দুর্বল কাঁধের উপর এতো বড় দায়িত্বের ভারি বোঝা চাপানো হচ্ছে? কেন এভাবে জাতীয় উন্নয়নের গতিধারায় মন্থরতার সৃষ্টি করা হচ্ছে? যে কর্ম নারীদের নয়, যা তাদের সাধ্যের বাইরের কাজ তা করার জন্যে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে কেন? স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি না? অথচ, আল্লাহ কোনো কাজে অবহেলা ও অদক্ষতার পরিচয় দিতে বারণ করেছেন, কারণ তা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থি এবং এ ধরনের উদাসীনতা ও খামখেয়ালির প্রত্যক্ষ পরিণাম হচ্ছে বড়ই মারাত্মক। আল্লাহ মানুষকে উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে বলেছেন, মানুষ প্রতি মুহূর্ত সক্রিয় থেকে তার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ব্যক্তিগত ও সাময়িক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করে অগ্রগতির নিত্যনতুন মঞ্জিল অতিক্রম করবে– এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং সেই হিসেবেই আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে বিভিন্ন গুণাবলি ও ক্ষমতা দান করেছেন। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মানবতার মুক্তিদূত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"আল্লাহ যেকোনো কাজের পূর্ণাঙ্গতা, সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।"

এ হাদিস মোতাবেক এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার প্রয়োজন মোতাবেক যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং উপায় অবলম্বন দান করে রেখেছেন। আল্লাহর দেওয়া এ মহান দানের ব্যবহার সচেতন বা অচেতনভাবে অবহেলা করাটা হবে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট অন্তরায়। তাছাড়া এ ধরনের অবহেলা মানবজীবনের একটা কলঙ্ক হিসেবেও বিবেচিত হবে। অন্য

কথায় আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার বা তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের অর্থ হবে আল্লাহর আইনের অবাধ্যতা।

যাইহোক, এ নিয়ে বেশি লম্বা-চওড়া কথা বলার প্রয়োজন নেই। চিন্তার বিষয় শুধু এই যে, যখন বস্তুগত উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়ে আসবে তখন মানুষের উন্নত ইচ্ছা-বাসনা শীতল হয়ে আসবে, মানুষের বিবেকগত সিদ্ধান্তও নাকচ হয়ে যাবে, আল্লাহর আইনেরও অমান্য করা হবে তখন ধ্বংস ও অবনতির কবল থেকে মানবতাকে কে রক্ষা করবে? কে তাদের শিক্ষা ও সভ্যতার স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেবে?

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে ইসলামী আইন, ইসলামী জীবনবিধান ও আদর্শের বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা, সহজ সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণতা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম মানুষের আয়-উপার্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও পথনির্দেশ দান করেছে, ইসলামের এই ব্যবস্থাটা কত সুন্দর তা লক্ষ করার বিষয়। যেমন, ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের পিতার ওপরই ন্যস্ত থাকে এবং বালেগ হওয়া পর্যন্ত পিতাই সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য দায়িত্বশীল থাকেন; কিন্তু মেয়ে সাবালিকা হবার পরও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতার দায়িত্বে থাকবে এবং বিয়ের পর তার সব দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত হবে। স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে আবার তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার ওপর ন্যস্ত হবে। মোটকথা, নারীকে কখনো তার ভরণ-পোষণের বা অন্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে চিন্তাগ্রস্ত হতে হয় না। এ ব্যাপারে নারীর অধিকার সম্পর্কিত ইসলামের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ওসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে আরো একটা বিষয় এখানে উল্লেখ যে, যদি নারীর পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ দায়িত্বশীল নাও থাকে তাহলেও তাকে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না। কারণ এমন অবস্থায় ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত করে। সুতরাং সরকার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে তার নিজস্ব তহবিল থেকে এ ধরনের অসহায় বা অবলম্বনহীন নারীর ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব পূরণ করবে। এ অবস্থা ও পরিস্থিতিকে বোঝার জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধি দরকার এবং এই ভুল ধারণার অপনোদন একান্তই অপরিহার্য যে, "নারী চাকরি না করলে উন্নয়নের পথে অগ্রগতি করা যাবে না।" এটা খুবই ভুল ধারণা। আসলে নারীর প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে এই যে, তার মানবিকতার মান উন্নত হবে, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটবে, চারিত্রিক গুণাবলি বাড়বে, সবরকমের মন্দ প্রভাব থেকে মনপ্রাণকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে। এর পরিবর্তে কেউ যদি নারীর উন্নতি বলতে এটা বোঝে যে, তারা বাইরে বেরিয়ে চাকরি করবে, দোকানে, দফতরে,

কল-কারখানায় ও ক্লাবে, নাট্যশালায় ঘুরে বেড়াবে তাহলে তারা মারাত্মক ভুলের পরিচয় দেবে। কারণ, নারীর বাইরে বেরুনোতে তার কোনো উন্নতি তো নেই-ই; বরং তার অপমান ও অমর্যাদারই আশঙ্কা বেশি থাকে। বাইরে বেরুনোতে নারীর লাভের চেয়ে ক্ষতি এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, নারীদের কল্যাণ ও প্রকৃত উন্নতির দিকে আমাদের অনেকেই দূরদর্শিতার পরিচয় দেন না। নারীর নম্রতা, শান্তিপ্রিয়তা, স্নেহভালোবাসা ও মহত্ত্বের মতো উন্নত মূল্যবোধসমূহকে আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি। নারীর নারীসুলভ কাজকর্মকেও আমরা যথার্থ গুরুত্ব ও মূল্য দিচ্ছি না। অথচ এসব মূল্যবোধ ও কাজকর্মই নারীকে তার প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা দান করে। অথচ তার এই আসল বিষয়টিকে বিবেচনা না করে, নিছক তার অর্থনৈতিক মুক্তির সস্তা শ্লোগান তোলা হচ্ছে। নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, তার অধিকার ও মর্যাদা এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। নারীর যে আধ্যাত্মিক মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে তার তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে আমরা ইমরানের স্ত্রীর সেই মহৎ ও মহান মননশীলতার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিলাম, যা মাতৃত্বের এক অমর স্বাক্ষর হিসেবে পবিত্র কুরআনের আয়াতে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইমরানের স্ত্রী (হযরত মরিয়মের মা) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন–

"ওগো আমার প্রতিপালক! আমি এই সন্তানকে, যা আমার গর্ভে রয়েছে, তোমাকে উৎসর্গ করছি।"[২৩৮]

এই প্রার্থনা থেকে একজন নিঃস্বার্থ মানবতার দরদি মা এবং একজন স্বার্থপর সংকীর্ণমনা নারীর মধ্যেকার বিরাট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আদর্শ মা তার সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার বৃহত্তম কল্যাণ কামনা করে আর একজন বিভ্রান্ত বস্তুপূজারি নারী তার সন্তানের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে টাকা কয়েকের মজুরির জন্যে নিজের নারীত্বকে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়। একজন আদর্শ স্ত্রী, মা ও গৃহিনি নারী তার অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে নিজের এবং অপরাপর মানুষের জীবনকে করে তোলে বিড়ম্বনাময় ও বিপদগ্রস্ত।

আজকের আধুনিক নারীর এই অধঃপতনের সমস্যা কোনো জাতিবিশেষের সমস্যাই নয়; বরং এর বিষাক্ত প্রভাব গোটা দুনিয়ার সর্বমানবতাকে আক্রান্ত করে ছেড়েছে। সুতরাং এর সমাধান ও প্রতিকারের ভার ব্যক্তিবর্গের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সামষ্টিকভাবে সব মানুষকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এটাই

---

[২৩৮] সূরা আলে ইমরান–৩৫।

ইসলামের শিক্ষা। কারণ ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নর হোক বা নারী কিছুটা স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। সে তার ব্যক্তিগত লোভ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে বেশি থেকে বেশি টাকা পয়সা উপার্জনের জন্যে লালায়িত থাকে। তাছাড়া এমন কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করে নারীদের ওপর বাড়তি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেদের অপরাধী মুখ ঢাকা দেওয়ার জন্যে বলে থাকে যে, "নারীর চাকরি করাটা আজকের সামাজিক প্রয়োজন।" তাদের মতে "নারীর চাকরি করা ছাড়া নাকি জীবন অপূর্ণ থেকে যায়।" আসলে এ ধরনের কথা কেবল লোভী-স্বার্থপর শ্রেণির ধাপ্পাবাজরাই বলে থাকে। তাদের কথা অনুযায়ী যদি নারীকে চাকরির বাহানায় লাগামহীন ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে উন্নত গুণাবলিসম্পন্ন ও চরিত্রবতী স্ত্রী অথবা মা সৃষ্টি হবে কোথা থেকে? পরিবারের সংরক্ষিতা তত্ত্বাবধায়ক ও সমাজ সংস্কারক মা আসবে কোথা থেকে? এ ধরনের আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা ছাড়া উন্নত ও পবিত্র সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটবে কেমন করে? সুতরাং আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, নারীর স্বার্থে তথা মানবতার বৃহত্তম স্বার্থে, ইসলামী শিক্ষার আলোকে, দুনিয়ার রাষ্ট্রে ও সরকারসমূহকে এ সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত এবং প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার যেসব বাস্ত বানুগ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তা থেকে বিরাট সহায়তা নেয়া যেতে পারে। বস্তুত ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করেই নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য যাবতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বামী, পিতা, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করে রেখেছে, যেন কোনো রকমে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় নারীর আসল দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখা না দেয়। নারী তার সন্তান ও পরিবারকে উত্তম গুণাবলিতে গড়ে তোলে শুধু তার নিজ পরিবারেরই উপকার করে না বরং সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা বিশ্বমানবতাই উপকৃত হয়। এ প্রসঙ্গে চমৎকার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে মিশরের বিখ্যাত প্রগতিবাদী সাংবাদিক আনিস মঞ্জুর আল আখবার পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেন– "দাম্পত্য জীবনের সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, আমরা এসব কর্মকে কোনো কর্ম বলে বিবেচনা করি না। অথচ আসলে এটাও অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশিক্ষণিক ও মানসিক কর্ম এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতে তো এখন এজন্যে নিয়মিত পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে কারণ তারা গৃহের কাজকর্ম করে। সেদিন আর দূরে নয়, যখন আপনারা দেখবেন যে, নারীকে চাকরি অথবা সন্তানের লালন-পালন উভয়

কর্মের মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হবে যে, সে এর কোনো একটা গ্রহণ করতে পারে। তখন আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে, নারী সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বটাকেই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততও করবে না।"

বস্তুত মানবতার ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও শান্তিময় রাখার একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে, নারীকে তার আসল মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, তাকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে কতটা উন্নত ও অধিকতর উপকারী। আর সামষ্টিকভাবে সকল মানুষকে, মানবিক গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জনের জন্যেও এটা জরুরি যে, তারা উভয়েই নর ও নারী হিসেবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান করে নিজের নিজের অধিকার, মর্যাদা গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, উভয়েরই গুরুত্ব সমান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারী-স্বাধীনতা ও ইসলাম

আধুনিক বিশ্বে এমন কোন মুসলিম দেশই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দেশ পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতাবাদীদের মারাত্মক প্রচারণার স্বীকার হয়নি এবং পর্দা প্রথাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় বিধানরূপে চিহ্নিত করেনি; কিংবা তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অপরিহার্য অংশ হিসেবে মেনে নেয়নি। যেমন– ১৯৭৬ সনের ১৯ শে অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মুহাম্মদ মুকাদ্দাম বলেন, "কোন দেশকেই আধুনিকীকরণ করা সম্ভব নয় যদি না সে দেশের নারী সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা যায়। প্রাচ্যের অনেক দেশেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে দেরী হয়েছে নারী সমাজকে স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে সে সকল দেশের জনগণের মাঝে প্রোথিত গোঁড়ামী ও আদিম বিশ্বাসের কারণেই। পৃথিবীর অপরাপর দেশের সাথে যদি তাল মিলিয়ে না চলতে পারি তাহলে আমরাও স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবো না। এশিয়া ও আফ্রিকার সকল উন্নয়নশীল দেশে নারী সমাজের ভূমিকা সুস্পষ্ট। দেশের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে অবশ্যই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো দেশের কিছু সংখ্যক লোক বিষয়টি বুঝতেই চায় না।"

১৯৬৭ সনের আগস্ট মাসে পাকিস্তান জাতীয় সংহতি পরিষদের উদ্যোগে লাহোরে অনুষ্ঠিত "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু'দশকে নারী স্বাধীকার" শীর্ষক সেমিনারে উপরোক্ত বক্তব্যের ঠিক একই রূপ মন্তব্য করা হয়। যদি আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি এবং আমাদের এ দেশ গঠনের আদর্শিক ভিত্তি ইসলাম বলে মনে করি তবে কি এটা জানা আমাদের জন্য কর্তব্য হয় না যে, ইসলাম নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে?

নারী অধিকার সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "পুরুষরা হচ্ছে নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। কারণ, আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের চেয়ে বেশি যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষরা নারীদের জন্য তাদের অর্থ ব্যয় করে।"

এ কথার তাৎপর্য হলো, কোন মুসলিম নারীই ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের জীবিকা অর্জনে বাধ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনধারণের মত সামর্থ্য থাকবে, তার স্বামী মারা না যাবে কিংবা সে তালাকপ্রাপ্তা না হবে অথবা তার ভরণপোষণ দেয়ার মত কোন পুরুষ আত্মীয় থাকবে।

কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীর জন্য বন্ধু ও কর্তা। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শন করা এবং এর প্রতিদানে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকা এবং স্বামী যাতে চরিত্রহীন হতে না পারে সে জন্য তার প্রতি অকৃত্রিম আস্থা নিবেদন করা।

কুরআনে স্বামীকে স্ত্রীর চেয়ে একমাত্র উপরে স্থান দেয়া হয়েছে এ জন্য নয় যে, সে নির্মম অত্যাচারী হবে, বরং তার দ্বারা পারিবারিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে সে জন্যেই। যে পরিবারের স্ত্রী আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর সে পরিবারে স্বামী স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের কর্তৃত্বের ভূমিকা হারায়। পক্ষান্তরে পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব বেড়ে গেলে পিতার প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধাশীলতা হ্রাস পায়।

সূরা আন-নূরের ৩০-৩১ নং আয়াতে মুসলমান পুরুষদেরকে গায়রে মুহাররাম নারীদের প্রতি এবং মুসলিম নারীদেরকে গায়রে মুহাররাম পুরুদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়কেই বলা হয়েছে পরস্পরের চক্ষুকে অবনমিত রাখতে। মেয়ে-লোকদেরকে মাথায় চাঁদর পরতে বলা হয়েছে এবং তার আঁচল দিয়ে মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের স্বামী ও বিবাহ নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের ছাড়া আর কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রায়োগিকভাবে এ আয়াত দ্বারা মুখমণ্ডলে কসমেটিক্স লাগানো এবং যৌন আবেদন সৃষ্টি করে এমন সব পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হয়েছে।

হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল ﷺ-এর হযরত আয়শা (রা)-এর ছোট বোন হযরত আসমা (রা) একদিন পাতলা কাপড়ের পোশাক পরে রাসূল ﷺ-এর সামনে আসলে মহানবী তাকে এ বলে তিরস্কার করেছিলেন যে, যখন কোন মেয়েলোক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন থেকে তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া কোন কিছুই প্রকাশ করা উচিত নয়। সূরা আল আহযাবের ৫৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের ঘরে গায়রে মুহাররাম পুরুষ ও বেগানা মহিলাদেরকে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং ৫৯ নং আয়াতে মুসলিম নারীদেরকে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলংকারাদি পরে বাইরে বের হতে বারণ করা হয়েছে এবং জনসম্মুখে পোশাক ও আচরণে এমন কিছু প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে তাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মুহাররামা পুরুষ, চাকর ও দাসদের সাথেই কেবল খোলামেলা কথাবার্তা বলতে পারবে।

সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতে বিশ্বাসীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের এবং তাঁদের কাছে কিছু চাইতে হলে তা পর্দার বাহির থেকে চাইতে। ৫৯ নং আয়াতে যখন কোন কারণে কোন মুসলিম মহিলাকে ঘরের বাইরে যেতে হয় তখন তাকে তার পুরো দেহ একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে নিতে বলা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে ধার্মিক মহিলা হিসেবে চেনা যায় এবং যাতে তারা উত্যক্ত না হয়। কুরআনে মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে এবং প্রায়োগিকভাবে সকল মুসলিম মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যখন কোন জরুরী প্রয়োজনে কোন গায়রে মুহাররাম পুরুষের সাথে সাক্ষাত করতে হয় তখন যেন সে তার সাথে এমন আবেগময় ভংগি ব্যবহার না করে যাতে লোকটির মনে প্রেমভাব উৎপন্ন হতে পারে; বরং কথাবার্তা যেন সাদামাটা ও প্রথাগত হয়। হাদীসে মুসলিম নারীদেরকে স্বামী ও বিবাহ নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের ছাড়া অন্য কারো সাথে (মুহাররাম কোন পুরুষের পরিচালনা ব্যতিরেকে) একাকী দূর যাত্রায় বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেখানে অধিকাংশ সহীহ হাদীসে মুসলিম নারীদেরকে মসজিদে নামাজের জামায়াতে একত্রিত হতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং গৃহের নিভৃত কোণে নামাজ আদায় করাকেই আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; সেখানে একজন মুসলিম মহিলার প্রাইভেট সেক্রেটারী, ব্যাংক ক্লার্ক, বিমানবালা, হোটেল পরিচারিকা, বিজ্ঞাপন মডেল, গায়িকা, ড্যান্সার এবং সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অভিনেত্রীর ভূমিকায় আসাকে কিভাবে বরদাস্ত করা যেতে পারে?

সূরা আন-নূরের ১-২৪ নং আয়াতে যারা বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রাখে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে। ইসলামে এ ব্যাপারে কোন দ্বৈত-মাপকাঠির ব্যবস্থা নেই। যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখে সে সকল নারী ও পুরুষের শাস্তির মধ্যে কুরআন ও হাদীসে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উভয়ের জন্যই একই রূপ কঠিন শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের এ প্রমাণ ছাড়া পর্দার সপক্ষে ইসলামের অধিক আর কি প্রমাণ দরকার হতে পারে? মুসলিম মহিলাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নারীদের প্রতিরক্ষা এবং পুরুষদেরকে তাদের প্রতি অশুভ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে সংযত রাখার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে। পৃথিবীতে ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম যা শুধু অনৈতিকতাকে মন্দ বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং অনৈতিকতাকে উদ্দীপ্ত করে এমন যে কোন সামাজিক কর্ম থেকে বিশ্ববাসীকে ফিরে থাকতে আদেশ দেয়।

আধুনিক নারীর অধিকার

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত তাদের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বইয়ে তারা লিখেন, "গৃহ ও পরিবার একটি অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, এটি নারীদেরকে চিরস্থায়ীভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে।" তারা বলেন, "নারীদেরকে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং কল-কারখানায় সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে পুরোপুরি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে।" তাদের পরবর্তী নারীবাদী প্রবক্তারা সহশিক্ষা, ঘরের বাইরের একই কর্মস্থলে সহকর্মাবস্থান, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের একত্র মিলন, অর্ধনগ্ন পোশাকে বিবাহপূর্ব প্রেম-অভিসার এবং যৌথ সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান, নেশাপান ও নৃত্যগানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচারের সুযোগ দানের জন্যে জিদ ধরেন। এ ক্ষেত্রে তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় জন্মরোধক সামগ্রী, বন্ধ্যাকরণ ব্যবস্থা, অবাঞ্ছিত গর্ভের বিমোচন, অবৈধ সন্তানদের লালন-পালনের জন্যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নার্সারী ও বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা রাখার দাবী করেন। এটাই হচ্ছে আধুনিক "নারী অধিকার" তত্ত্বের মূলগত ধারণা।

লাহোরের গুলবার্গ গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তেহরান ইউনিভারর্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর শ্রোতাদেরকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, "আধুনিক সভ্যতার সাথে যেটুকু খারাবী যোগ হয়েছে তা অতি উদ্বিগ্ন রক্ষণধর্মী প্রতিক্রিয়াশীলদের ধারণার চেয়ে অনেক কম।" কিন্তু এ ভীতির কারণগুলো কি কারো অজানা রয়েছে? দেখুন না, নারী স্বাধীনতার কি ফল পশ্চিমারা ভোগ করছে।

আমেরিকান এক ঐতিহাসিক ও কলামিস্ট ম্যাক্সলার্নার বলেন, "আমরা একটি বেবিলনীয় সমাজে বাস করছি। ইন্দ্রীয় সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ ও যৌন স্বাধীনতার ফলে সমাজের সকল পুরাতন নীতি-নৈতিকতার বন্ধন ভেঙে গেছে।" কিছুদিন আগেও কী জনসম্মুখে প্রকাশ করা যাবে কিংবা যাবে না তা নির্ধারণ করতো চার্চ, রাষ্ট্র, পরিবার ও সম্প্রদায়; কিন্তু অধুনা এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণের দাবীর কাছে পরাজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর এখন দায়িত্ব দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র শোনা ও দেখা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র দর্শকরা প্রতিদিন আর্ট গালারী ও নাট্য গৃহসমূহে একত্রিত হচ্ছে উলঙ্গপ্রায় সুইডিস নায়িকার 'আমি এক নারী' সিরিজের পর্ণ নাচ-গান দেখে যৌন উত্তেজনা প্রবল করার জন্যে। ইটালীয় সিনেমা পরিচালক ম্যাকিল্যানজেলো এন্টোনিওনি তার 'ভেঙে দাও' ছায়াচিত্রে নগ্নতা বিরোধী সকল ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার মাথা খেয়েছেন। ফরাসী কৌতুকপ্রিয় নায়িকা জেনফন্ডা সীমাহীন প্রলোভনধর্মী ছায়াছবি বারবারেলায় মুক্ত প্রেমাভিসারের গুণকীর্তন করতে করতে একটি নগ্নতার দৃশ্য থেকে পরবর্তী অধিকতর আর একটি নগ্নতার দৃশ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। কমপক্ষে দু'ঘণ্টা স্থায়ী 'জেসনের প্রতিকৃতি' নামক ছায়াচিত্রে একজন নিগ্রো বেশ্যা পুরুষের বিকৃত আত্মার ভ্রমণ কাহিনী এখন আমেরিকার প্রায় সকল স্বাধীন প্রেক্ষাগৃহগুলোতেই খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়ে থাকে, যা মানব জীবনের পবিত্রতার দিকগুলোকে সংকুচিত করছে। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ ফাদার ওল্টার জে. ওং বলেন, "আমরা শীঘ্রই জানা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক মাত্রায় স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছি ...।" (রিডার্স ডাইজেস্টের ১৯৬৮ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত "সমাজ যেদিকে যাচ্ছে আমাদের সব কিছু সেদিকে যাচ্ছে" নামক নিবন্ধ থেকে)।

আসুন পাশ্চাত্যের এ সামাজিক অবক্ষয়ের কী প্রভাব মুসলিম দেশগুলোর ওপর পড়েছে তা দেখা যাক। নারী স্বাধীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের একটি প্রধান ও কার্যকর মাধ্যম হলো সিনেমা। "লাহোরের হিরামন্ডি জেলার প্রতিটি মেয়েরই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অভিনেত্রী হওয়া। তারা সকলেই চাচ্ছে চিত্রনায়িকা হতে। এ ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য তারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছে। এদের একটি বিরাট সংখ্যক মেয়ে তাদের নায়িকা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের শর্তে তথাকথিত সিনেমা পরিচালক ও প্রযোজকদের খুশী করার জন্য যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে রাজী রয়েছে। সিনেমা শিল্পের দ্বারা খুব সহজে ও সাধারণভাবে বিভ্রান্ত মেয়েলোক এরাই। এদের অধিকাংশই টুকিটাকি কিছু অভিনয়ের সুযোগ পেলেই খুশী। অতিরিক্ত বেশ কিছু মেয়ে এভাবেই সিনেমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অবশ্য

প্রতিষ্ঠাও পায়। শহরের অনেক হোটেলই "শুভ সময়" এর কাজে ব্যবহৃত হয়। কতিপয় হোটেল পরিচালক থাকে ভূমিকায়। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ ব্যবহৃত হয় খদ্দেরের সাথে নষ্টা মেয়েদের সাক্ষাতের স্থান হিসেবে। এ সকল মেয়ে-লোকদেরকে নগরীর বাস স্ট্যান্ডগুলোতেও দেখা যায়। শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোও খদ্দের ধরার জন্য খুবই পরিচিত স্থান। প্রেক্ষাগৃহগুলো যে শুধু সিনেমা দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাও নয়। এ সকল ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা খুবই শিথিল।"[২৩৯]

ক্রিস্টাইন কীলার অথবা মেরিলিন মনরোর মতে মহিলা সেনাবাহিনী গঠন করা কি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অংশ হতে পারে?

নারী স্বাধীনতার পক্ষে পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং সিনেমার প্ররোচনা স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসেবে নারীর ভূমিকাকে তাচ্ছিল্য ও খাটো করছে। সন্তানের লালন-পালনের জন্যে নারীদের গৃহে অবস্থানকে এ প্রচারণা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্ধেক জনশক্তির অনুপস্থিতির ফলে অমার্জনীয় ক্ষতির কারণ বলে বর্ণনা করছে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে মুসলিম দেশসমূহে সহশিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা এমনভাবে বেড়েছে যে, তা অজস্র যুবক-যুবতীকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিয়েছে এবং বিস্তার ঘটিয়েছে অসংখ্য পাপ কর্মের। সহশিক্ষা এ ভ্রমাত্মক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য নেই, সুতরাং উভয়কেই একই কর্মক্ষেত্রে অভিন্ন কাজের জন্যে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ফলতঃ যে সকল মেয়ে সহশিক্ষা গ্রহণ করে তারা খুবই খারাপভাবে নিজেদেরকে বিবাহ ও মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে। এরপরও নারী স্বাধীনতাবাদীরা বলে থাকেন মেয়েদের প্রাথমিক দায়িত্ব স্বামীর গৃহেই। এ কথার অন্য অর্থ দাঁড়ায়, আধুনিক নারীদেরকে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের জীবিকার জন্য সারাক্ষণ ঘরের বাইরে কাজ করার পরও ঘরে ফিরে তাকে সন্তানের লালন-পালন, ঘরদোর সাজানো ও স্বামীর প্রয়োজন পূরণের মত অসম্ভব প্রায় সব বাধ্যবাধকতা পালন করতে হবে। এটাও কি ন্যায়বিচার?

মুসলিম দেশসমূহে অধুনা পাশ্চাত্যের আইনের অনুরূপ যে পারিবারিক আইন পাস করা হয়েছে, সে আইন কি বাস্তবিকভাবে আমাদের নারী সমাজের কোন উন্নয়ন ঘটিয়েছে? এ আইন সতর্কভাবে বিবাহের জন্য একটি বয়সসীমা

---

[২৩৯] ১৯৬৮ সালের ২৯ ও ৩০ শে মার্চ তারিখে 'দি পাকিস্তান টাইমস'-এ প্রকাশিত 'লাহোরে বেশ্যাবৃত্তি' নামক প্রতিবেদন থেকে।

নির্দিষ্ট করে দেয় বটে; কিন্তু এ বয়স সীমার নীচে (বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সে) ছেলে-মেয়েদের অবৈধ যৌন কর্মের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যায়।

অধিকাংশ মুসলিম দেশে আধুনিকতাবাদীরা কুরআন ও সুন্নাহর আইন লংঘন করে বহুবিবাহ প্রথাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এমনকি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। তারা কখনোই এ মানসিক অবস্থাটা বুঝতে চাচ্ছেন না যে, একজন স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর অন্য একজন স্ত্রী যিনি তার নিরাপত্তাধীনে রয়েছেন এবং তার সন্তানেরা পিতার ভালোবাসা ও যত্ন পাচ্ছেন তার সাথে স্বামীর ভালোবাসাকে ভাগাভাগি করে নেয়া ভাল, না দেশীয় আইনে বর্তমান স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে এবং তার সন্তানদেরসহ তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণে বাধা আছে বলে গোপনে কোন মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলছে তা দেখা ভাল?

এটা কি সে মহিলার জন্য কল্যাণকর নয়, যে তার স্বামীর সাথে ভালোভাবে থাকতে পারছে না, তাকে তার স্বামী ব্যক্তিগতভাবে তালাক দিয়ে দিবেন এবং এ দম্পতি শান্তিপূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে পছন্দমত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না? না, সেইটা ভাল যে, তাদের বিষয়টি কোর্টে যাবে এবং স্বামী এ বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কোর্ট নির্ধারিত ডিভোর্সের "প্রয়োজনীয় শর্ত" পূরণার্থে বাধ্য হয়ে স্ত্রীর ওপর অনৈতিক আচরণ ও পাগলামীর মিথ্যা দোষারোপ করবে, যা মহিলাটির জন্য সামাজিক কলংক হয়ে দাঁড়াবে এবং বেচারিণীর সকল সুনাম-সুখ্যাতি জীবনের তরে ধূলিস্মাৎ করে দেবে?

প্রকৃতপক্ষে নারী স্বাধীনতাবাদের প্রবক্তারা নারীর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতি আগ্রহশীল নয়। লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিষদের এক সক্রিয় সমর্থক জনাবা সাতনাম মাহমুদ তার বক্তব্যে সরলতার সাথে এ কথা স্বীকার করেন যে, যদিও পাশ্চাত্যের মহিলারা বস্তুগত প্রাচুর্য এবং সামাজিক পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম-অধিকার ভোগ করছে, তথাপি তারা কাঙ্ক্ষিত সুখে সুখী নয়। তিনি বলেন, যদি আত্মীক সুখই লক্ষ্য হয় তবে তার সমাধান তথাকথিত নারী স্বাধীনতার মধ্যে পাওয়া যাবে না। সুবিধাবাদী সমাজকর্মী এবং উক্ত মহিলা পরিষদের অন্যতম সদস্যা বেগম কাইসেরা আনোয়ার আলী তার বক্তব্যে যে সকল উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের বিষয়ে এমনভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন যে, তাদের সংগঠন মেয়েদের এ উন্মানসিকতার যে সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক তা যেন তিনি জানেনেই না।

"সকল মুসলিম দেশেই নারী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"– এ প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য কি? এটা আসলে একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র যা আমাদের সংসার, পরিবার এবং এমনকি গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চায়। 'নারী অধিকার', 'নারী স্বাধীনতা' ও 'নারী উন্নয়ন' প্রভৃতি সস্তা শ্লোগান শুধুমাত্র মূল উদ্দেশ্যকে কুহেলিকার আবরণে ঢেকে রাখার জন্যেই।

মুসলিম বিশ্বে নারী মুক্তি আন্দোলন সেই চরম পরিণতিই ডেকে আনবে যা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে এখন ঘটছে। যৌন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আজকের মানব সম্প্রদায় যে হারে ন্যাক্কারজনক আচরণে লিপ্ত হয়েছে তা বন্য পশুদের বিবেককেও হার মানায়। এ আচরণের অনিবার্য পরিণতিতে সংসার ও পরিবার পদ্ধতিসহ সামাজিক সকল নৈতিকতার বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে এবং ব্যাপকভাবে কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, নির্যাতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আইনের কার্যকরহীনতা দেখা দিবে। অতীতের সকল ইতিহাসই এর যথার্থ সাক্ষী যে, যখনই কোন সমাজে পাপ ও অনৈতিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সে সমাজ আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জান্নাতী নারী

সৎ নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ

আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"পৃথিবীটা হচ্ছে ভোগের বস্তু। আর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেক নারী।"[২৪০]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

"চারটি গুণের কারণে কোন নারীকে বিবাহ করা হয়, তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্মভীরুতা। ধর্মভীরু নারী বিবাহ করে তুমি বিজয়ী হও। তোমার দু'হাত ধূলোলুণ্ঠিত হোক।"[২৪১]

---

[২৪০] মুসলিম, অধ্যায় ঃ দুগ্ধপান, হা/২৬৬৮।

[২৪১] বুখারী অধ্যায়ঃ বিবাহ হা/৪৭০০। ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুগ্ধপান, হা/২৬৬১।

নবী (সা) আরো বলেন, "চারটি বস্তু সৌভাগ্যের। ১. নেক নারী ২. প্রশস্ত আবাসস্থল ৩. সৎ প্রতিবেশী এবং ৪. আরামদায়ক আরোহী। আর চারটি বস্তুতে রয়েছে দুর্ভাগ্য। ১. অসৎ নারী। ... ।"[২৪২]

এ সমস্ত উক্তি ও অনুরূপ আরো অনেক হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলিম পুরুষের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার জন্যে একজন নেক ও সৎ নারী অনুসন্ধান করা কত গুরুত্বপূর্ণ। আর মুসলিম নারীর ওপর আবশ্যক হচ্ছে নেক স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একজন নেক ও সৎ নারী অনুসন্ধান করা কত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোত্তম গুণাবলীসমূহ অর্জন করার চেষ্টা করা। যাতে আল্লাহ্ তার ওপর সন্তুষ্ট হন। ইহ-পরকালে তার জীবন হয় পুণ্য ও সফলতায় পরিপূর্ণ।

হে মুসলিম বোন! নিম্নে নেক নারী হওয়ার জন্যে কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরী নেক মনীষীদের কতিপয় উক্তি সন্নিবেশ করা হল। এগুলো শিখুন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করুন।

কেননা নবী (সা) বলেন, "শিক্ষা অর্জন করার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায়, ধৈর্যের অনুশীলনের মাধ্যমে সহিষ্ণু হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে, তাকে তা প্রদান করা হয়।"[২৪৩]

সৎ স্ত্রীর গুণাবলি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"পুণ্যবতী নারীগণ আনুগত্য করে এবং আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয়ের সংরক্ষণ করে।"[২৪৪]

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, صَالِحَاتٌ বলতে সৎ ও পুণ্যশীল নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস প্রমুখ বলেন, قَانِتَاتٌ অর্থ হচ্ছে, স্বামীর আনুগত্যকারীণী। حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ অর্থ সম্পর্কে সুদ্দী প্রমুখ বলেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী নিজের ইজ্জতের সংরক্ষণ করবে এবং স্বামীর সম্পদ হেফাযত করবে।[২৪৫]

---

[২৪২] হাকেম প্রমুখ, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন, দ্রঃ (সহীহুল জামে হা/৮৮৭)।

[২৪৩] দারাকুতনী, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন– সহীহুল জামে' হা/২৩২৮।

[২৪৪] সূরা আন নিসা, ৩৪।

[২৪৫] ইবনে কাসীর ১/৭৪৩।

আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"মুসলিম নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযানের সিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি ভিতরে প্রবেশ কর।"[২৪৬]

আনাস বিন মলেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) আরো বলেন, "কোন ধরনের নারী জান্নাতী আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমাদের জান্নাতী নারীগণ হচ্ছে, স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারীণী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারীণী। তার আনুগত্যের প্রকাশ হচ্ছে, যে রাগান্বিত হলে বা তার সাথে খারাপ আচরণ করা হলে বা স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত হলে, স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, এ আমার হাত আপনার হাতে সপে দিলাম, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখের পলক ফেলব না। অর্থাৎ আমি কোন আরাম নিব না, কোন আনন্দ বিনোদন করব না যতক্ষণ আপনি আমার প্রতি খুশি না হন।"[২৪৭]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হল হে আল্লাহর রাসূল! কোন শ্রেণীর নারী সর্বোত্তম? তিনি বলেন, "তার পরিচয় হচ্ছে তুমি তার দিকে চাইলে সে তোমাকে আনন্দিত করবে, কোন নির্দেশ দিলে তা বাস্তবায়ন করবে। তার নিজের ব্যাপারে

---

[২৪৬] মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৭৩ শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন, দ্রঃ (সহীহুল জামে হা/৬৬০।

[২৪৭] ত্বররানী, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন, দ্রঃ (সিলসিলা সহীহা-হা/২৮৭।

এবং স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামী পসন্দ করেন না এমন কাজ করে তার বিরোধিতা করবে না।"[২৪৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন,

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

"আমি কি তোমাকে মানুষের আকর্ষণীয় শ্রেষ্ঠ গুপ্তধন সম্পর্কে বলে দিব না? তা হচ্ছে, নেক নারী। স্বামীতার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দিত করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং বাড়িতে না থাকলে তার ইজ্জত-আবরু রক্ষা করে।"[২৪৯]

ওহে মুসলিম বোন নিজের প্রতি লক্ষ্য করুন, উক্ত গুণাবলী কি আপনার চরিত্রে সমাবেশ ঘটাতে পেরেছেন। আপনি কোথায়? আপনার কি উচিত নয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধান করা? দু'নিয়া-আখেরাতে সুখের জীবন গঠন করার জন্য স্বামী-সন্তানের খেদমত করা ও আনন্দময় সংসার গড়তে সচেষ্ট হওয়া?

স্বামীর খেদমত জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যম

হুসাইন বিন মেহসান (রা) বলেন, আমার ফুফু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। একদা তিনি নবী (সা)-এর কাছে কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। প্রয়োজন শেষ হলে নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

"তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার জন্য তুমি কেমন স্ত্রী? আমি বললাম, একান্ত অপারগ না হলে তার খেদমত করতে কোন ত্রুটি করি না। তিনি বললেন, ভালভাবে খেয়াল রাখবে, তুমি কিরূপ তার খেদমত করে থাক। কেননা সেই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"[২৫০]

অর্থাৎ তার অনুগত্য ও খেদমত করলে জান্নাতে যাবে আর অবাধ্য হলে জাহান্নামে যাবে। শায়খ আলবানী বলেন, 'এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে এ দলীল পাওয়া যায়, স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব এবং সাধ্যের মধ্যে

---

[২৪৮] সহীহ সুনান নাসাঈ অধ্যায়ঃ বিবাহ, হা/৩১৭৯।

[২৪৯] আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ যাকাত, হা/১৪১৭।

[২৫০] আহমাদ হা/২৭৩৫২, নাসাঈ, হাদীস সহীহ, দ্রঃ আদাবুয যাফাফ- আলবানী পৃঃ ২৮৫।

তার খেদমত করা তার ওপর আবশ্যক। সন্দেহ নেই যে, খেদমতের প্রথম বিষয় হচ্ছে, স্বামীর গৃহের তদারকি করা, তার সন্তান-সন্ততিকে সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করা।'

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

"যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৫১]

জান্নাতী নারীর কতিপয় আলামত

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জান্নাতী নারীর পরিচয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যায়–

১. জান্নাতী নারী নেক ও পুণ্যের কাজে অংশ নেয় এবং আপন পালনকর্তার ইবাদত করে তাঁর হক আদায় করে।

২. জান্নাতী নারী এমন ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করবে যাতে আল্লাহর নাফরমানী নেই।

৩. নিজের ইজ্জতের হেফাযত করবে– বিশেষ করে স্বামীর অনুপস্থিতিতে।

৪. স্বামীর সম্পদের হেফাযত করবে ও তার সন্তানদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করবে।

৫. সর্বদা এমনভাবে স্বামীর সম্মুখবর্তী হবে যাতে তিনি খুশি হন এবং এজন্য নিজের অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও হাসিমুখ তার সামনে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবে।

৬. স্বামী রাগান্বিত হলে যে কোন প্রকারে তাকে খুশি করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে। কেননা সেই তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। যেমনটি ইতোপূর্বে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

৭. স্বামী তার সঙ্গ চাইলে কোনভাবেই তাতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। তার ডাকে সাড়া দিবে এবং পরিপূর্ণরূপে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করবে।

জান্নাতের অঙ্গীকার

উল্লেখিত কাজগুলো করলেই প্রিয় নবীজীর ভাষায় তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার অঙ্গীকার রয়েছে। যেমনটি তিনি এরশাদ করেন–

---

[২৫১] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুগ্ধপান, হা/১০৮১, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ বিবাহ, হা/১৮৪৪।

স্ত্রী যদি :

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে।

২. রমযানের সিয়াম পালন করে।

৩. নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে বিরত থাকে।) এবং

৪. স্বামীর আনুগত্য করে।

তবে তাকে বলা হবে, জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ কর।[২৫২]

নারীর মানবিক গুণাবলী

কর্মস্থল পৃথিবীতে নর ও নারীর কৃতকর্মের জন্য পরকালীন জীবনে বেহেশত-দোযখ নির্ধারণ করা আছে। নর ও নারীরা আখিরাত জীবনে শাস্তি ও পুরস্কার ভোগ করার অধিকারের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের জন্মের পর পৃথিবী হল অস্থায়ী নিবাস আর মৃত্যুর পর আখিরাত হল স্থায়ী আবাস। কর্মফলের এ প্রক্রিয়া একমাত্র নরের জন্য নয়; নারীরও এতে নিরংকুশ অধিকার রয়েছে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি, সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভ নারীদেরও কাম্য। নারীদের এ প্রত্যাশা ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ। এজন্য আখিরাত জীবন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় পৃথিবী থেকেই। পরকালের সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা লাভকারী নর ও নারীকে পৃথিবীতে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই সুন্দর আখিরাত জীবন গঠিত হয়। মানুষের সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও কর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে মানুষের প্রতিটি কর্মই ইবাদত। পূর্ণ ইখলাসসহকারে ইবাদত করা নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইবাদতের অন্তরালে যদি অহংকার, রিয়া, দুনিয়াবী সম্মান ও প্রশংসা পাবার উদ্দেশ্যে নিহিত থাকে; তাহলে এতে একনিষ্ঠ ও আন্তরিকতার পরিপূর্ণতার অভাব বিদ্যমান থাকে। তাই একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত তথা প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করার তাগিদে রয়েছে। এভাবেই ইবাদতের মাধ্যমে তার আসল পরিচয়কে অর্থবহ করে তোলার সুবর্ণ সুযোগ মানুষের অর্জিত হয়। সুযোগের অসদ্ব্যবহারকারী নারীর পরবর্তী জীবন তখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অসীম সময় পেরিয়ে সসীম সময়ে গিয়ে তার কোন অস্থায়ী জীবনের কর্মস্পৃহাই সারা জীবনে কাজে আসবে না। তার কান্না, আকুতি, মিনতি এবং পুনরায় ভাল কাজ করার

---

[২৫২] মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৭৩। ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে হা/৬৬০।

বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান ও মেধা প্রদান করা হয়েছে। এ জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনে তার প্রতিটি বিধান কার্যকর করাই ছিল তাকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য। যে নারী তার কর্মচিন্তা, কর্মস্পৃহা ও তার জ্ঞানকে ইবাদতে পরিণত করতে পেরেছে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। এরই আলোকে তার পরকালীন জীবন হবে সুন্দরময়, রঙ্গীনময় ও শান্তিময়। আখেরাত জীবনে পবিত্র, শান্তি ও কল্যাণময় জীবন লাভের প্রত্যাশা লাভকারী নারীকে পৃথিবীতে আল-কুরআন ও হাদীস মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা একান্ত কর্তব্য। এতে কোন নর যদি বাধা সৃষ্টি করে তাহলে তার এ আখিরাত জীবন গঠনের অধিকারকে বিপন্ন করা হয়; তার সত্যিকারের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয় এবং নারী হয় অবহেলিত, অপমানিত ও অসম্মানবোধ। নারীকুল তখন হয়ে যাবে দিশেহারা ও হতাশাগ্রস্ত। ঈমানদার পুরুষের ন্যায় নারীও পুণ্যবর্তী হওয়ার অধিকার রাখে। তাই আল-কুরআন ও হাদীসকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অনুসরণ করা মৌলিক দায়িত্ব।

আল-কুরআন ও হাদীসে নর ও নারীর জন্য নৈতিক আদর্শের একটি সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। নরের পাশাপাশি নারীকেও জ্ঞানের এ দুটি উৎস থেকে নৈতিকতার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ ধারণা সম্পর্কে বলা হয়েছে– "শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।"[২৫৩]

এ ধারণার বিরুদ্ধবাদীরা অর্থাৎ নৈতিকতাবর্জিত নারীরা আল্লাহর মনোনীত পথ ও সৎ কর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রয়োগ করে মন্দ কাজে, অসৎ পথে। আর তখনই সে তার কৃতকর্মের কারণে মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে, ধীরে ধীরে সে হীনতম সৃষ্টিরাজির নিম্নতম স্তরে নেমে আসে। তাই নারীর জীবনে নৈতিক গুণাবলি তথা মানবিক গুণাবলি অর্জন করা অত্যন্ত অপরিহার্য। এ মানবিক গুণাবলি তাকে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করতে সাহায্য করবে; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণে সহায়ক হবে এবং দুনিয়াতে সুখময় জীবন লাভের পথ সুগম হবে। আর এরই মধ্য দিয়ে তার জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকবে সুন্দর ও অনাবিল আখিরাত জীবন।

১. অহংকারমুক্ত হৃদয় : অহংকার নারী চরিত্রের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাই ইসলামে অহংকারমুক্ত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়। এ পাপে ইবলিশ শয়তানে পরিণত হয়েছে। এ অহংকারের কারণে বহু

---

[২৫৩] সূরা আশ শামস : ৭-১০।

নর-নারী জীবনে সঠিক পথে চলার মত সত্যিকার সাহস ও ইচ্ছা সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্য ইসলাম দম্ভভরে পৃথিবীতে বিচরণ না করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে– "অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[২৫৪]

এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন– "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২৫৫] তাই সকল নর-নারীকে অহংকারমুক্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২. সত্যবাদিতা : নারীদেরও পুরুষের ন্যায় সত্য নিষ্ঠাবান-এর অধিকারিণী হতে হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। সত্য ও ন্যায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, মানবতার কল্যাণ নিয়োজিত করে, মানুষের নৈতিক উন্নতির পথে সহায়ক হয়। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে– "তোমরা মিথ্যার সঙ্গে সত্যের মিশ্রণ করো না এবং জ্ঞানতঃ তোমরা সত্য গোপন করো না। সত্য এবং সত্যের প্রকাশই মানবতার ধর্ম। সুতরাং প্রতিটি নারীকে সত্যের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দূরীভূত করতে হবে।

৩. ন্যায়পরায়ণতা : এ গুণের অধিকারিণী নারী সকলের নিকট সম্মান পায়। কারণ ন্যায়পরায়ণতা, দয়া এবং বদান্যতা সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর।[২৫৬] সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে– "যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায়বিচার করো, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণকারীকে ভালোবাসেন।[২৫৭]

৪. ক্ষমা : ক্ষমাশীলতা মানুষের চরিত্রের একটি অন্যতম ভূষণ। নারীদের ক্ষেত্রেও তাই। রাসূলে করীম ﷺ-কে বিধর্মীরা কষ্ট ও নির্যাতন করার পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে শান্ত হননি, তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত পর্যন্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।"[২৫৮] ক্ষমা দ্বারা নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নির্যাতন মোকাবেলা করা সহজতর।

---

[২৫৪] সূরা লোকমান আয়াত : ১৮।
[২৫৫] মুসলিম।
[২৫৬] সূরা আল মায়িদা : ৮।
[২৫৭] সূরা আল মায়িদা : ৪২।
[২৫৮] সূরা আল আ'রাফ : ১৯৯।

এটি মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। নারীরাও এভাবে নিজেদের মর্যাদাকে আরো উন্নত করতে পারে।

৫. দয়া : দয়া একটি বৃহৎ গুণ। এ চরিত্র অর্জন করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়নি ইসলামে। আল-কুরআন ও হাদীসে দয়া প্রদর্শনের জন্য খুব বেশি করে তাগিদ দেয়া হয়েছে। দয়ার মধ্যে কোনকিছু প্রাপ্তি থাকতে পারবে না বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "হে বিশ্বাসীগণ, প্রতিদানের প্রত্যাশায় ও পীড়া দিয়ে তোমরা তোমাদের সাদাকা বা দান খয়রাত বাতিল করো না। আর বেশি কিছু পাওয়ার আশায় দয়া প্রদর্শন করো না। আল্লাহ্ যেভাবে মানুষকে দয়া করেন, সেভাবে মানুষও অন্য মানুষের দয়া প্রদর্শনের গুরুত্ব কুরআনে রয়েছে। তাই কুরআনে বলা হয়েছে– "আল্লাহ্ দয়াশীলদের ভালোবাসেন।"

৬. নম্রতা : মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে সফল করে তোলার জন্যে প্রতিটি নর এবং নারীকে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার আবশ্যকতাকে কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না। পবিত্র কুরআনে এ গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "তারাই পরম দয়ালু আল্লাহর বান্দা যারা জমিনের উপর নম্রভাবে চলে।" হযরত ওমর (রা) একদিন মিম্বর থেকে খোৎবা পাঠের সময় বলেছেন– "হে মানুষ, তোমরা নম্র হও কেননা আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী ও নম্র হয় আল্লাহ্ তাকে উন্নত করেন।" "যে অহংকারী আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করেন।" যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকারও বিদ্যমান থাকে তাকে জান্নাতে নেয়া হবে না বলে রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন। বিনয় ও নম্রতা ঈমানদার নর ও নারীর একটি মহৎ গুণ।

৭. দানশীলতা : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল। আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরো ভাল। আর তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা অবহিত[২৫৯] এভাবে দানশীল হওয়ার তাগিদ আল-কুরআনে প্রদান করা হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– একজন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্, বেহেশত ও জনগণের নিকটবর্তী এবং জাহান্নামের আগুন হতে দূরবর্তী। দানশীল ব্যক্তির পক্ষে সমাজের উন্নতি করা সম্ভব হয়। নারীদেরকে এভাবে দানশীল গুণের অধিকার অর্জন করার জন্যে কোন বাধা-নিষেধ ইসলামে দেয়া হয়নি। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– "একজন ঈমানদারের মধ্যে দুটি জিনিস একত্রে থাকতে পারে না; একটি হল কৃপণতা,

---

[২৫৯] সূরা আলে-ইমরান : ৯২।

অন্যটি হল মন্দ চরিত্র।" রাসূলে করীম ﷺ দয়াবান ছিলেন এবং নিজের উদাহরণ দ্বারা তার অনুসারীদেরকে দয়াশীল ও দানশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

৮. **বিশ্বস্ততা :** নারীদেরকে বিশ্বস্ত হতে হয় এবং কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণভাবে পালন করার নির্দেশ রয়েছে। সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে– "হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে– "আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং আমানতের খেয়ানত করে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। বিশ্বস্ততা ও প্রতিশ্রুটি পূর্ণ করা নর ও নারীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় মানবিক গুণাবলি।

৯. **কর্তব্যবোধ :** সততাও নারীর জন্য অপরিহার্য। আর কর্তব্যবোধ তো তাকে অধিকতরভাবে অর্জন করা সমীচীন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ জীবনে সততা ও কর্তব্যবোধ আনয়ন করেছেন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানুষের মধ্যে মানুষের সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যে। আচার-আচরণে সব সময় সততা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দেয়া নারীরও কর্তব্য। যে নারীর কর্তব্যবোধ যত বেশি হবে তিনি তত কর্তব্যনিষ্ঠ হবেন।

১০. **শালীনতা :** ইসলামে নারীদেরকেও তাদের অশ্লীল জীবনকে পরিহার করে শালীনভাবে পৃথিবীতে অবাধে বিচরণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সূরা না'হলে বলা হয়েছে– "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর[২৬০] আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীকে আচার-আচরণে সুন্দর শালীন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কোন অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত না হতে পারে, মন যাতে অপবিত্র না হতে পারে। অশ্লীলতা থেকে কুকর্মের উৎপত্তি হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে অশ্লীল আচরণের কাছেও যাবে না।[২৬১] নারীদেরকে পর্দার মাধ্যমে শালীনতা বজায় রাখারও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১১. **নিরপেক্ষতা :** মনে কষ্ট হলে, আঘাতপ্রাপ্ত হলে নারীদেরকেও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। সব অবস্থায় অধ্যবসায়, ক্ষমা ও সবরের তাকিদ রয়েছে। ক্ষমা করাই মহত্তের লক্ষণ। তবে প্রতিশোধ নিতে হলে তা নিরপেক্ষতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। সূরা নাহলে বলা হয়েছে– "যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায়

---

[২৬০] সূরা আন নহাল : ৯০।
[২৬১] সূরা আল আন'আম : ১৫১।

তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই উত্তম।"[২৬২] রাসূলে করীম ﷺ-কে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা হলে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করতেন। তাই নর-নারীরাও যদি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধের পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে তার মর্যাদা আরো সুন্দর হবে।

১২. করুণা : দয়া, প্রেম ও করুণা মানবীয় জীবনের অনুপম সৌন্দর্য। রাসূলে করীম ﷺ থেকে মানুষ, জীবজন্তু এমনকি তরুনরাও তার প্রেম ও করুণা হতে বঞ্চিত হয়নি। তিনি কোন সময় বিনা কারণে গাছের পাতা ছিড়তেন না। ক্ষুদ্র প্রাণীকেও কষ্ট দিতেন না। বৃদ্ধা, বিধবা নারী, অসহায়, দুঃখী, গরীব, দাস-দাসী, গাছগাছালি, তরুলতা, প্রাণী, জীবজন্তু, শিশু কেউই মহানবী ﷺ-এর প্রেম ও করুণা হতে বঞ্চিত হয়নি। সকলকে আপন মন দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। কাউকে ঘৃণা করেননি। তাই নর-নারীকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকা অনিবার্য। রাসূল ﷺ বলেছেন– "বেহেস্ত বাসীর মধ্যে তিন প্রকার লোক থাকবে এবং তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকবে যে তার অতিথি, আত্মীয় ও মুসলমানের প্রতি দয়াদ্র চিত্ত ও ক্ষমাশীল।"

১৩. আচরণ : নারীদেরকেও পড়শীর প্রতি উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ কুটুমের পর পড়শীর হক সাধারণ মুসলমানের হক অপেক্ষা অধিক বলে ঘোষণা করেছেন। যার পড়শী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকে না সে লোকের ঈমান নেই বলে রাসূলে করীম ﷺ আল্লাহর কসম দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাই নারীদের উচিত পড়শীর প্রতি সুন্দর আচরণ করা। রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেছেন– "সে মুমিন নয়, যে তৃপ্তিসহকারে আহার করে অথচ তার পাশেই তার পড়শী ক্ষুধার্ত থাকে।" চাকর-চাকরাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একজন চাকরের দৈনিক ৭০ বারের অপরাধ ক্ষমা করার হুকুম রয়েছে। হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে মহানবীর শেষ বাণী ছিল এ "সাবধান! নামায! সাবধান! তোমাদের দাস-দাসী, গরীব মানুষ"। মৃত্যুর অন্তিমকালেও মুহাম্মদ ﷺ দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার কথা বলে গেছেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– "অধীনস্থ চাকর বা দাসীদের খাওয়া ও পরিধেয় পাওয়ার হক আছে এবং তারা যা সচরাচর করতে পারে এমন কাজ ছাড়া অন্য কাজ তাদের ওপর চাপাবে না। ধনী-দরিদ্র সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করারও তাগিদ দেয়া হয়েছে। শিশুদের প্রতিও অতিশয় স্নেহপরায়ণ ছিলেন মহানবী ﷺ। তাই নারীদেরকে নিজ সন্তানসহ সকল শিশুদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

[২৬২] সূরা আন নহাল : ১২৬।

১৪. সহিষ্ণুতা : ধৈর্যশীল নারীগণ অত্যন্ত সুন্দর ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইবাদত করতে সক্ষম। ধৈর্যশীল নর ও নারীর মর্যাদাই আলাদা। এদের সাথে আল্লাহ থাকেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী"। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– "এমন কোন সহিষ্ণু লোক নেই, যার ক্ষমতা নেই এবং এমন কোন জ্ঞানী লোক নেই, যার অভিজ্ঞতা নেই। তিনি আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ দু'টি গুণকে ভালবাসেন– ধৈর্য ও সহ্য।"

১৫. পোশাক : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের পরিজনের জন্যে পরিচ্ছদ পরিধেয় পাঠিয়েছি তোমরা লজ্জাস্থান আবৃত কর।" মহানবী ﷺ বলেছেন– "শীত ও তাপ হতে শরীরকে রক্ষা করা ও লজ্জা আবৃত করাই তোমাদের কাজ। নারীদেরকে পরিধানের মাধ্যমে ভূষণ করতে হবে। নারীদের জন্যে রেশমী পোশাক ও স্বর্ণালংকার বৈধ করা হয়েছে। তবে তাদেরকে শরীর আবৃত করার আদেশ দিয়েছেন। তারা যেন এমন পোষাক ব্যবহার না করে, যাতে শরীর দেখা যায়। স্ত্রীদেরকে স্ত্রী পোশাক পরার প্রতি গুরত্ব দেয়া হয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের পোশাক বর্জনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। পুরাতন পোশাক না ছেড়া পর্যন্ত পোশাক তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী ঘোষণা করেছেন– "মানুষ তার পোশাক, তার বেশভূষায় ও সাজসজ্জায় শোভন হোক।"

সারকথা

তথাকথিত আধুনিকতার শিকারে পরিণত হয়ে কি নারী নিজের সাথে সুবিচার করছে?

এখানে আধুনিকতা বলতে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন এই জন্যেই অনুভব করছি যে, আমরা মানি বা না মানি– একথা সত্য যে, আজকাল ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত একশ্রেণির মুসলিম নারীও এই তথাকথিত আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে নিজেদের ফ্যাশনে পরিণত করে নিয়েছে। তারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদেরকে পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যের বর্ণে বর্ণিত করার ব্যাধিতে ভুগছে। এই ব্যাধিকে আরো আকর্ষণীয়ভাবে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে কতিপয় অপরিণামদর্শী সাহিত্যিক। এরা বিশেষকরে যুবক-যুবতীদের পাশ্চাত্য প্রীতির তালিম দিয়ে থাকে এবং পাশ্চাত্যের যেকোনো রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরার জন্যে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে। পাশ্চাত্যের উৎকট ভোগবিলাস ও ফ্যাশন প্রিয়তাকেই এরা আধুনিকতার ছদ্মনামে পেশ করে। এরা কারণ এবং এসব পণ্ডিত-সাহিত্যিকদের মানসিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন এখানে

নেই; কিন্তু তারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ শিখিয়ে মুসলিম জাতির কত বিরাট ক্ষতি যে করেছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তারা নিজেদের হীনম্মন্যতা ও বিকৃত মানসিকতার আড়ালে, প্রগতিশীলতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বাহানায় নবীন যুবক-যুবতীদের অস্তিত্বের মূলে যে কুঠারাঘাত করছেন, তা তারা অবশ্যই জানেন এবং জেনে-বুঝেই তারা এই অপকর্মে লিপ্ত রয়েছেন।

এই আলোচনায় আমরা পাশ্চাত্যের নারীর ক্রমবিকাশ, তার কারণ ও উপায়, তার ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে তাকে যে সব স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে তা নিয়েও আমরা আলোচনা করতে যাবো না, আমরা বরং পাশ্চাত্যের নারী-সমাজের বর্তমান অবস্থা নিয়েই আমাদের আলোচনাকে সীমিত রাখবো। আমরা এখানে দেখতে চাইবো যে, তারা কি সত্যিই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে যা তাদের স্বভাব ও মানসিকতার দাবি ছিল? তারা কি তাদের নারীত্বের অধিকার পেয়েছে এবং তারা কি তাদের নারীত্বের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছে? নাকি বুনো ঘোটকীর মতো নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও দায়িত্বকে পদদলিত করছে। এখানে আমরা তাদের মধ্যে নম্রতা, শালীনতা, শিষ্টতা ও লজ্জার অভাবের প্রসঙ্গও তুলবো না এবং পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে নেমে কি পেয়েছে কি হারিয়েছে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু বলবো না। কারণ এতেকরে আলোচনা দীর্ঘয়িত হয়ে পড়বে। তাছাড়া এসব অনেক জবাব আপনারাও জেনে থাকবেন যা আমরা ইতঃপূর্বে জানিয়ে এসেছি। তবে আমরা এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার অবতারণা অবশ্যই করবো।

প্রথম বাস্তবতা

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে তাদের লাগামহীন স্বাধীনতা। এই উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার ধারণা হচ্ছে অষ্টাদশ শতকের উৎপাদন। পরে শিল্প, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবাদি এই লাগামহীনতাকে আরো উৎসাহিত করে, ক্রমে বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের নারীদের এ লাগামহীনতা চরমরূপ ধারণ করে।

ক্রমে যুগের পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহুদি ধর্মের গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অমানুষিক জুলুম-নির্যাতনের ফলে গোটা পাশ্চাত্য জগৎ মানবাধিকারের শ্লোগানে কেঁপে ওঠে। প্রচলিত মান-মর্যাদা, ভদ্রতা ও উদারতার অর্থ বদলে যায়, বদলে যায় মানুষের ব্যবহার ও অভিরুচি। গোটা পাশ্চাত্যবাসী ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। খ্রিস্ট ধর্ম ও ইহুদি ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তারা বিকল্প জীবন ব্যবস্থার অন্বেষণে সচেষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই যুগসন্ধিক্ষণে তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সাথে পরিচয় লাভ করতে

পারেনি। যেহেতু তাদের এসব জীবনদর্শন ছিল খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদি ধর্মের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বাস্তব ফসল, তাই তারা চরম বস্তুবাদীর পথই অবলম্বন করে, ফলে তারা আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়।

এই নয়া বস্তুবাদী বিপ্লবের সয়লাবে নারী-পুরুষ সবাই একাকার হয়ে যায়। ধর্মকে তারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এবং লজ্জা-শরম, সম্মান, শালীনতা, পবিত্রতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলি তাদের কাছে একান্ত অর্থহীন কথা বলে মনে হয়। জড়বাদী বিপ্লবের এই হুজুগী স্রোতে নারী তার নারীত্বকে বর্জন করে গা ভাসিয়ে দেয়। অবাধ মেলামেশা, সামষ্টিক বিলাস-আনন্দ আর নাচ-গানের যৌথ সরগরমে তারা হয়ে ওঠে ব্যস্ত-উদ্বেলিত। নাচ-গান আর মদের আড্ডায় তারা হয়ে ওঠে মাতাল পুরুষের সম অংশীদার। এখন তারা যেকোনো পুরুষের সাথে অবাধ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হতে আর ইতস্তত বোধ করে না; বরং এই লাগামহীন ব্যভিচার আর বিলাসমত্ততাই হয়ে ওঠে সকলের প্রিয় ফ্যাশন। পাশ্চাত্য সমাজে অবাধ ব্যভিচারের এই কলঙ্কজনক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে জর্জ রয়লী স্কট তাঁর গ্রন্থ 'A HISTORY OF PROSTITUTION' (বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস) এ লিখেছেন–

"তার কাছে জীবনের আনন্দ এই যে, যৌবনে যৌন সুধার, পেয়ালা আকণ্ঠ পান করা হবে। এরই সন্ধানে সে নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, আবাসিক হোটেল, রেস্তরাঁ ইত্যাদির চারদিকে ঘুরতে থাকে, এরই সন্ধানে সে অপরিচিত পুরুষের সাথে মোটর-ভ্রমণে যেতেও সম্মত হয়। অন্য কথায় সে জেনেবুঝে নিজের কামনার তাগিদে নিজেকে এমন পরিবেশে ও এমন অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয় এবং অন্যকেও পৌঁছায় যেখানে যৌন উত্তেজনাকে উস্কে দেওয়ার মতো লোকেরা অবস্থান করে এবং এরপর তার যে স্বাভাবিক প্রতিফলন দেখা দেয় তাতে সে শঙ্কিত হয় না বরং তাকে স্বাগত জানায়।"

এটা এমন এক খোলা বাস্তবতা যা কেউই অস্বীকার করে না এবং এটাই হচ্ছে সেই অবাধ স্বাধীনতা যা পাশ্চাত্যের নারী পুরুষ সমানভাবে ভোগ করছে। তাদের মতো ব্যক্তিগত জীবনে কিছু করা না করার ব্যাপারে প্রতিটি নর-নারীই স্বাধীন। তারা যেকোনো নৈতিক ও চারিত্রিক বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে যা মর্জি তা করার অধিকার রাখে। ভালোমন্দ যা খুশি তা তারা করতে পারে। এ ব্যাপারে বাধা দেওয়ার বা কিছু বলার কোনো অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্রের নেই। তবে সরকার কেবল সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে যেখানে সামষ্টিকতার স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে বলে মনে হবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা

দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হচ্ছে, নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সাম্যের ভুল ধারণা। এই ভ্রান্তি নারীকে তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন এবং অস্বীকারকারী করে ছেড়েছে। এর পরিবর্তে সে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এখন সে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বর্জন করে পুরুষের ওপর অধিকার দাবি করছে এবং এখন নারী-অধিকার বলতে পুরুষের অংশের অধিকারই বোঝায় এবং তারই জন্যে সর্বত্র চেঁচামেচি ও সংগ্রাম করে বেড়াচ্ছে।

নর-নারীর সাম্য বলতে পাশ্চাত্যের জড়বাদীরা এটা মনে করে নিয়েছে যে, শুধু মর্যাদার ক্ষেত্রে নয়; বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বকর্মেই তারা পুরুষের সমান অংশীদার। পুরুষ যে কাজ করবে– নারীরাও সেই কাজ করবে। সুতরাং পুরুষ যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে নারীও সেই একই শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে এখন নারীই সেসব কাজ করছে যা কখনো কেবল পুরুষেরই কর্তব্য ছিল। বলাবাহুল্য, আজ পুরুষের মতো নারীও ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষক, আইনবিদ ইত্যাদি অন্যান্য কর্মেও অংশীদার হচ্ছে। এখন নারী ও পুরুষ বলতে তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। এখন তারা সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পূর্ণ সমানাধিকার দাবি করছে– যেখানে তারা এখনো নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য বর্তমান রয়ে গেছে বলে মনে করে।

পুরুষের কাজকর্মে আগ্রহী হওয়ার ফলে নারী তার স্বাভাবিক দায়দায়িত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছে। সুতরাং তাদেরকে কোথাও দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নয়ন বা পারিবারিক দায়িত্ব পালন অথবা মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণের জন্যে কোনো প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলতে শোনা যায় না। কিন্তু নৃত্যশালা, নাট্যশালা, সিনেমা, ক্লাব ইত্যাদি স্থাপনের তৎপরতায় তাদেরকে বড্ড ব্যস্ত দেখা যায় এবং তাদের এসব তৎপরতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অবশ্য আমরা নারীদের প্রশিক্ষণমূলক যেমন– কুটিরশিল্প, খাদ্যপ্রস্তুত, পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করার প্রশিক্ষণ ও এ ধরনের গঠনমূলক তৎপরতার বিরোধিতা করছি না। কারণ স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, এর জন্যে তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ এই গঠনমূলক প্রশিক্ষণই আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মাকে পরিবার ও সমাজ গঠনের ভূমিকা পালনের কৌশল ও দক্ষতা দান করে। কেবল রান্না ও সেলাই করে স্ত্রী বা মায়েরা তাদের সেই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সুতরাং তাদেরকে আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা হিসেবে যোগ্য ও সক্রিয় করে তোলার যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া একান্তই জরুরি।

কিন্তু এই কাজের এতো বেশি প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আধুনিক নারী কখনো এর জন্যে দাবি তোলেনি। তারা নিজেদের আসল দায়িত্ব ও

কর্তব্যের কথায় ভীষণ অসন্তুষ্ট; কিন্তু যদি তাদেরকে একথা বলা হয় যে, ভবিষ্যতে তাদেরকে আর সন্তান ধারণ, তাদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে না– তখন তারা সেই অনাগত ভবিষ্যতকে স্বাগত জানাতে মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব করে না।

নিজেদের স্বাভাবিক দায়িত্বে তাদের এই নির্লিপ্ততা এবং পুরুষদের সাথে এত বেশি ঘনিষ্ঠ মেলামেশা এ কথারই পরিচায়ক যে, নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এটা তাদের এক ভয়ঙ্কর মানসিক দুর্বলতারও ইঙ্গিত বহন করে যে, সে তার নারীত্বকে নিয়ে লজ্জা ও হীনম্মন্যতাবোধ পোষণ করে এবং পুরুষ হয়ে জন্মায়নি বলে আক্ষেপ করে। যেহেতু তাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেনি তাই বলে অন্তত বাহ্যিকভাবে কৃত্রিম পুরুষের বেশ ধারণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, সে এই মানসিকতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সবরকমের উপায় অবলম্বন করে যেন তার "অবাধ্য কামনা" সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে; কিন্তু তাও কি সম্ভব? নারী, নারীই থাকবে– তা সে যতই অনুকরণ করুক আর যতই কৃত্রিমতা অবলম্বন করুক না কেন; কিন্তু সে যদি নারী হিসেবে নিজের মহত্তম লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় তাহলে এতো সব অনুকরণ আর কৃত্রিমতার কোনো প্রয়োজনই নেই।

উদাহরণস্বরূপ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত দাবির কথা ভেবে দেখুন এবং বলুন যে, আসলে কি এটা তেমন কোনো জরুরি বিষয় যার জন্যে তারা এতো হৈ-হল্লা করছে? এতেকরে বরং পুরুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা নারীদের এই দাবিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারের উৎখাত করে নয়া বিপ্লবী সরকার কায়েম করে। এভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সম-অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই শুধু করেছে। নয় কি?

বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন দেশের নারী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এই সুযোগ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে অনেক আগে থেকেই রাখা হয়েছে; কিন্তু যেসব দেশে সবরকমের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রার্থীনীদের অনুপাত হচ্ছে শতকরা মাত্র আড়াই ভাগ। অথচ দুনিয়ার প্রতিটি দেশে প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষদের অনুপাত প্রায় সমান হয়ে থাকে। সেদিক থেকে পার্লামেন্টে সদস্যপদ প্রার্থীদের অনুপাত পুরুষের সমান হওয়াই উচিত ছিল– যখন তার পূর্ণ সুযোগও রয়েছে।

অন্যদিক আধুনিক নারী সাধারণ যানবাহনে তাদের জন্যে নির্ধারিত কক্ষ বা আসনের পরিবর্তে পুরুষের সাথে একই আসনে বসার সুযোগ দেওয়ার দাবি করার পেছনে যুক্তি বা অর্থ কি? আর তারা তাদের জন্যে পৃথক কলেজ বা

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি না করে পুরুষের সাথে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম-অধিকার দাবি করার অর্থই বা কি? – আধুনিক নারীসুলভ পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তে পুরুষের মতো প্যান্ট-শার্ট পরার নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কোনো মানসিকতায়? এভাবে অন্যান্য সব ব্যাপারেও তারা পুরুষের অনুকরণ করতে চায় কেন? ইদানীং তারা লিখনে ও বলনে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার বর্জন করারও দাবি তুলছে? তারা বলনে ও লিখনে নিজেদের জন্যে পুংলিঙ্গ ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু কেন? তথাকথিত আধুনিক নারীদের এসব কথাবার্তায় এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নারী হওয়াটা যেন কোনো লজ্জা বা দুর্ভাগ্যের কথা। তারা নারী হয়েছে বলে নিজেদেরকে হীনতর ভাবে। আর তাই পুরুষের সমান হওয়ার জন্যে তাদের এই অস্বাভাবিক চেষ্টা সাধনা।

তথাকথিত আধুনিক নারীর উন্নতির অর্থ বোঝার জন্যে উপরে বর্ণিত দুটি বাস্তবতাকে সামনে রাখা দরকার। অর্থাৎ লাগামহীন স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমক্ষেত্রীয় সমানাধিকার এর দৃষ্টিকোণ থাকে– মানুষ হিসেবে অথবা নারী হিসেবে তারা কি উন্নতিটা করছে? আর নারীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং স্বাভাবিক কাজ-কর্মের বাস্তবায়নেই বা তারা কতটুকু উন্নতি অর্জন করেছে?

লাগামহীন স্বাধীনতার অর্থ এবং অবস্থার প্রামাণ্য চিত্র আমরা উপরে তুলে ধরেছি। আমরা দেখেছি যে, এই লাগামহীন স্বাধীনতা নারী ও পুরুষের অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলা এবং নির্লজ্জ ফ্যাশন-বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। আর তাদের স্বাধীনতার অর্থ কি? কার কাছ থেকে কিসের স্বাধীনতা? তাদের স্বাধীনতার অর্থ শুধু এই যে– তারা বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে স্বাধীনতা চায়, তারা মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে স্বাধীনতা চায়!

স্মরণযোগ্য যে, দীর্ঘকাল ধরে নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্রিয় ছিল। গত শতকের শেষ এবং চলতি শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এই অবস্থা চলছিল। এরপর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ আকাশে এই শ্লোগান ছাড়ে যে, নারীকে তার আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। তারা তাদের এই শ্লোগানকে দার্শনিক রূপ দেয় এবং আধুনিক জড়বাদী চিন্তাবিদদের মন্তব্যের আলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। তারা অশ্লীলতা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য নোংরামিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আধুনিক নামে নামকরণ করে; কিন্তু তবুও সাধারণভাবে নারীরা তাদের প্ররোচনায় কান দিতে ইতস্তত করে। কারণ এত দিনের নারীসুলভ সংস্কারবোধ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জতার সাথে হাত মেলাতে বাধা দেয়। কিন্তু দু' দুটি মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট পরিবেশে নারীদের সেই শেষ ইতস্ত

তবোধকেও শেষ করে দেয় এবং তাদেরকে খোলাখুলি যৌন-নোংরামি ও আধুনিক পাশবিকতার চরম পর্যায়ে টেনে আনে।

সুতরাং আজ এই লাগামহীনতা আর অস্বাভাবিক ভুল ধারণাই পাশ্চাত্যে বিয়ের সম্পর্ককে একেবারে অর্থহীন ও ঠুনকো করে দিয়েছে। কারণ যৌনমিলন ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোনো সম্পর্কই বর্তমান রাখা হয়নি। দাম্পত্য সম্পর্ককে সুন্দর ও স্থিতিশীল রাখার সব বুনিয়াদকেই তারা উল্টে দিয়েছে। তাদের যত্রতত্র অবাধ প্রেম-ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার প্রেম-ভালোবাসার সব সম্পর্ককে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন তারা বিয়ে ছাড়াই যেকোনো পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। গর্ভনিরোধের ব্যাপক সুবিধা রয়েছে বলে জারজ সন্তানেরও কোনো দুশ্চিন্তা নেই। শতাব্দীর মহান মনীষী সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'পর্দা ও ইসলাম' এ পাশ্চাত্যের এই ভয়াবহ অবস্থার অনেক প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি উবঃৎড়রঃ এর বিখ্যাত পত্রিকা ঋৎবব চৎবংং-এর একটি রিপোর্টও তুলে ধরেন। তাতে বলা হয়েছে–

"বিয়েশাদীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া, তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিয়ে ছাড়াই স্থায়ী ও অস্থায়ী অবৈধ যৌন সম্পর্কের সংখ্যাধিক্য একথাই প্রমাণ করে যে, আমরা পাশবিকতার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং সন্তান উৎপাদনের স্বাভাবিক বাসনা বিলোপ পাচ্ছে।"

অন্য এক স্থানে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মেয়েদের অভিমতকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাষায়–

"আমি বিয়ে করবো কেন? আমি মনে করি এ যুগের মেয়ে ভালোবাসার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্রিয়ার স্বাভাবিক অধিকার রাখে। আমরা গর্ভনিরোধের অসংখ্য উপায় জানি। এভাবে জারজ সন্তান জন্মানোর আশঙ্কাও দূর করা যেতে পারে। ফলে কোনো জটিল অবস্থার ভয় নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত পন্থাগুলোকে এই আধুনিক পন্থায় বদলে দেওয়াটা বুদ্ধির অনুকূল।"

আর এ ধারণা পোষণকারী নির্লজ্জ নারীদের জন্যে পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খোলা রয়েছে। তাদের এই নির্লজ্জ স্বাধীনতাকে রুখে দেওয়ার অধিকার আইন-কানুন বা সমাজ-সরকার কারোই নেই। কেউ নিন্দা-সমালোচনাও করতে পারে না। কেননা স্বয়ং তাদের সমাজ আর সরকারই তাদেরকে যথেষ্ট ব্যভিচারের সেই অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে।

পাশ্চাত্যের বর্তমান চরমপন্থি স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও বিধানকে অনেকটা কঠিন মনে হতে পারে। কারণ ইসলাম লাগামহীন স্বাধীনতার অনুমতি দেয় না; বরং এক্ষেত্রেও

ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্পষ্ট অবগতির জন্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাপক অধ্যয়ন করা জরুরি। ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই স্বাধীনতা দান করেছে এবং প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারা নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীন; কিন্তু অন্যের ক্ষেত্র ও দায়িত্বে হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশের কোনো স্বাধীনতাই কারো নেই। কারণ এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা চরম বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করে। যেমন পাশ্চাত্য সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইসলামের বিধি ও ব্যবস্থা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে আমাদের পূর্বপুরুষরা এর কার্যকারিতা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর ধনসম্পদ, অভিমত এবং ধর্মীয় মতামতের ক্ষেত্রে হস্ত ক্ষেপের অধিকার দেয়নি। এবং স্বামীকে এমন কোনো কথা বলার বা কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়নি যাতেকরে স্ত্রীর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অবসান হতে পারে। এমনকি ইসলাম স্বামীকে এই অধিকারও দেয় না যে, স্ত্রীকে নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করতে হবে। অথচ পাশ্চাত্যে এর সাধারণ প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এ প্রচলনটা যদি ইসলামী সমাজেই কেবল থাকতো তাহলে এসব লোক কতই না কু-প্রথা বলে বেড়াতো এবং ইসলামের ব্যাপারে নাক সিঁটকাতো, একে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে সমালোচনা করতো; কিন্তু এখন তারা নিজেরাই এই কু-প্রথার অনুসারী বলেই এটাকে মন্দ না বলে বরং ফ্যাশন বলেই চালিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য কথা! ইসলামের ভালো কথাটাও তাদের কাছে বিবেচনার অযোগ্য, আর তাদের সকল মন্দ কার্যকলাপই ফ্যাশন ও আভিজাত্য বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু ইসলাম নারীকে তার আসল অধিকার দান করেছে, ইসলাম তাদের যে অধিকার দিয়েছে সেই অনুসারে কোনো স্বামী তার স্ত্রীর ধনসম্পদ, মতামত ও ধর্মীয় বিশ্বাসে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যে ভিত্তি রচনা করেছে তাকে যেকোনো অর্থে উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। যদি কোনো স্বামী কোনোভাবে স্ত্রীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং স্ত্রী যদি ইসলামী আইন মোতাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে সুবিচার দাবি করে তাহলে তাকে অবশ্যই সুবিচার দিতে হবে। এভাবে নারীর ওপর কোনো রকমের জোর-জুলুম বা শোষণের কোনো অবকাশই রাখা হয়নি। ইসলাম সমাজ ও সরকারকে নারীর ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও তার সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছে এবং তাকে তার সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছে।

কিন্তু দুনিয়ার নারীসমাজ ইসলামী আদর্শের অনুসরণ না করে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে। আজ তারা জীবনের বৃহত্তম লক্ষ্যের পথ থেকে

বিচ্যুত হয়ে পুরুষের সাথে বিড়ম্বনাময় ঘানি টেনে ফিরছে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তারা আদর্শ নারী হওয়ার মৌলিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা আজ পুরুষের অনুকরণ ও পুরুষের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির দাসীবৃত্তি করাকে নিজেদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছে। তারা পুরুষের বেশ আর পুরুষের কর্ম লাভকেই মনে করেছে সমতার অর্থ।

নারী কি যুগের সাথে সুবিচার করছে? তারা কি অতীত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াতেই মুক্তির নামে আজকের এই চরম পন্থা খুঁজে বের করার অভিনয় করছে না?– আফসোস! তারা ভুলের পর ভুলই করে যাচ্ছে। তাদের এক একটি ভুল সিদ্ধান্ত থেকে জন্ম নিচ্ছে আরও অসংখ্য ভুল। তারা যদি সত্যি মুক্তি চাইত, সত্যি সত্যিই যদি তারা সুবিচার চাইত, চাইত যদি তারা তাদের ন্যায্য অধিকার, তাহলে তারা সেই সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা অবশ্যই করত যা ইসলাম তাদের শিখিয়েছে। ইসলামের এসব শিক্ষা ও নীতিমালা সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি।

বস্তুত সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন এবং উন্নত উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে যথার্থ মর্যাদা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ইসলামী নীতি ও শিক্ষার বাস্তবায়ন একান্তই অপরিহার্য।

'অধিকারের সাম্য' দাবি করার অস্পষ্ট শ্লোগানের আড়ালে নারীর প্রকৃত অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। নারী জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে নারীর প্রতি সুবিচার প্রদর্শন কখনো সম্ভব নয়। তাছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কখনো সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জানি, স্বঘোষিত প্রতিবাদী ও আধুনিকতাবাদীদের কাছে কোনো প্রশ্নেরই যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই এবং কোনো সমস্যার সমাধানও নেই। তারা কেবল সমস্যাকে জটিলতর করতেই ওস্তাদ। তাই তারা কোনো বাস্তবভিত্তিক নীতি ও যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে আমাদের সেকেলে প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়া বলে গালি দিয়ে আত্মতুষ্টি অর্জন করে।

তারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে প্রচার করে; কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, প্রগতির অর্থ কি? তখন তারা শুধু এটুকুই অর্থ করে যে, প্রগতি মানে শিক্ষা ও বস্তুগত উন্নতি। এছাড়া তারা আর কোনো উন্নতির কথা ভুলেও মুখে আনে না। কারণ তারা জানে যে, আসল অর্থ করতে গেলে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হবে ও বেকায়দায় পড়তে হবে।

প্রগতির বিভ্রান্তিকর শ্লোগান তুলে তারা শুধু সমাজের বুকে জড়বাদী ধারণার বীজ বুনতেই সচেষ্ট। তারা প্রগতির ব্যাখ্যা দিতে চায় না। এ জন্যে যে, তারা জানে তারা যা বলছে ও করছে তার সাথে প্রগতির কোনো সম্পর্ক নেই। তারা

প্রগতির যে ঠুনকো মানে করে তা একান্তই বিভ্রান্তিকর। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের মুখোশ লুকানোর জন্যে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত উন্নতির গালভরা বুলি আওড়ায়। তারা খুব ভালো করেই জানে যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিত্যনতুন অধিকার– উদ্ভাবন ঘটেছে তেমনি তা ঘরের নারীকে বাইরে এনে পুরুষের সাথে কল-কারখানায় জুড়ে দিয়েছে। নারী তার নারীত্ব হারিয়ে পরিণত হয়েছে পুরুষের পেষণ ও সম্ভোগের কাঁচা দ্রব্যে। এটাই হলো তাদের প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার অর্থ।

একবার যখন নারীকে ঘর থেকে বের করে উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে সে তখন আর ঘরে বসে স্বস্তি পাবে কেন? আর চরে বেড়ানোর এতো বিরাট ময়দান পড়ে থাকতে সে বিয়ে করে ব্যক্তিবিশেষের আনুগত্যই বা করতে যাবে কেন? যৌনতৃপ্তি লাভের কোনো অসুবিধা তো তার এমনিতে নেই। বিয়ে ছাড়াই তা সে অনায়াসে ভোগ করতে পারে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মুক্ত নারী মুক্ত সমাজের বুকে এভাবেই জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে তাদের প্রগতিশীল জীবনের দর্শন। এসব গোলকধাঁধা আর ভ্রান্তির মায়াজালে ঘটে চলেছে যত অনাচার অঘটন।

এই তথাকথিত প্রগতিশীলতার পেছনে কেটে যাচ্ছে তাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবন। তারা এখন তাদের সামাজিক ও সরকারি আইনের ছত্রছায়ায় জারজ সন্তান জন্ম দেয় এবং এসব কাজে সন্তানকে লালন-পালন করার জন্যেও তারা বাধ্য নয়। এই হচ্ছে পাশ্চাত্যের সাধারণ সমাজচিত্র।

এরই গুণগান প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাদের রথী-মহারথীরা। এটাই নাকি উদার নীতি, প্রগতি, আধুনিকতা আর উন্নত মননশীলতা। এ নোংরামির দূষিত বিষাক্ত পরিবেশেই তাদের প্রগতি সহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে– গোটা বিশ্বময়।

নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের সীমালঙ্ঘন করে বাইরে ঘুরে বেড়ালে যে সামাজিক সমস্যাবলির সৃষ্টি হয় তাতে দ্বিমত পোষণের কোনো উপায় নেই। রইলো শিল্পোন্নয়নের কথা। শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বকে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, একইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে উদ্ভাবন ও মানবতার জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। ইসলাম শিল্পোন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবীর হাদিস মোতাবেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভাবন এবং সামগ্রিক অর্থে শিল্পোন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একইভাবে সভ্যতার বিকাশ সাধনও ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে সৃজনশীল

প্রতিভা দান করেছেন এই জন্যে যে, তারা আল্লাহর এই পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থকে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যবহারাধীনে আনার চেষ্টা-সাধনা করবে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকবিবেচনার শক্তি-দান করেছেন। এজন্যে ইসলাম সর্বোতভাবে উন্নয়নের সমর্থক। মানুষ তার বৃহত্তম কল্যাণের জন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করুক ইসলাম তাই কামনা করে। এজন্যে ইসলাম ইতিবাচক ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম, মানবতার যথার্থ উন্নয়ন ও বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে নর-নারীর কর্মক্ষেত্রে এবং তাদের মেধা ও ক্ষমতা মোতাবেক দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছে যাতে করে তারা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকভাবে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

কিন্তু ইসলামের এই সহজ-সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার বিপরীতে যারা নারীকে পুরুষের সাথে খাপছাড়া প্রতিযোগিতায় নামানোকেই উন্নতি ও প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করে তাদের জ্ঞান-বিবেক ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত এ ধরনের অপরিণামদর্শী ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকেরাই নারী তথা গোটা বিশ্বমানবতার নিকৃষ্টতম শত্রু। এমন মূর্খ ও ভোগবাদী শোষকগোষ্ঠীর হীন চক্রান্ত থেকে বিশেষভাবে নারী সমাজকে এবং সাধারণভাবে গোটা মানবতাকে মুক্ত করানোর সময় এসে গেছে। আর সমাজকেও এটা বুঝে নিতে হবে যে, কল-কারখানা অফিস-আদালত আর দোকানপাটে খেটে খাওয়ার নাম উন্নতি নয়। যারা এটাকে উন্নতি মনে করে তারা আসলে উন্নতির অর্থই বোঝে না, অথবা জেনে-শুনেই ভুল অর্থ করে।

বলুন তো, চাকরিরতা নারীরা যদি চাকরিতে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি উন্নতির গতি রুখে যাবে? তারা বাইরে না বেরুলে বাইরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে কি? বরং বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল জায়গায় নারীরা কাজ করে না সেখানে উৎপাদন উন্নতি তুলনামূলকভাবে বেশিই হয়। আর যে সকল জায়গায় নারী কাজ করে সেই সকল জায়গায় উৎপাদন ও উন্নতি তুলনামূলকভাবে কমই হয়। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছেন যে, কল-কারখানা, অফিস আদালত ও দোকানপাট থেকে যদি নারীরা সরে যায় তাহলে আজকের যুগের বেকার সমস্যার যেমন অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে তেমনি সামষ্টিক উন্নতির হারও বৃদ্ধি পাবে। আরো দেখা গেছে, যে সকল কল-কারখানায় নারীদের রাখা হয় না সেসব কলকারখানায় কখনো উৎপাদন হ্রাস দেখা দেয় না; বরং সক্ষম ও পরিশ্রমী পুরুষদের কর্মদক্ষতায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সুতরাং নারীদের দিয়ে পুরুষালী কাজ করিয়ে যারা উন্নয়নের কথা বলেন বা নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেন তাঁরা আসলে মানুষকে প্রবঞ্চিতই করেন। তাদের এই প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়ে নারী ও পুরুষ উভয়েরই

অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা কেবল তাদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যেই নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে টেনে আনছেন। এতে করে নারীরা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে পড়ছে এবং তার সুফল থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

এটা শুধু আমাদের মুখের কথাই নয়। আজকের পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের অবস্থার পর্যালোচনা করলে আপনারাও একই কথা বলতে বাধ্য হবেন এবং দুনিয়ার সমাজ বিশেষজ্ঞ ও সচেতন পর্যবেক্ষকরা আমাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে প্রায়ই মতামত প্রকাশ করেছেন। যে পাশ্চাত্যে স্বাধীনতার ও নারীমুক্তির শ্লোগান সবচেয়ে বেশি ওঠে থাকে সে পাশ্চাত্যে নারীদের অধিকার ও মান-মর্যাদার কি অবস্থা হচ্ছে? নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকার কি নিরাপদে আছে? যদি নিরাপদই থাকবে তাহলে এতো হৈ-হল্লা আর চেঁচামেচি কেন? কেন এত খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ আর রকমারী নারীনির্যাতনের লোমহর্ষক খবরাখবরে পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকা আর সংবাদমাধ্যমগুলো ভরে থাকে? ইউরোপ-আমেরিকায় নারী নির্যাতনের যত নিষ্ঠুর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে– সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে তার একটিমাত্র তুলনাও পাওয়া যায় না কেন? তার কারণ মুসলমান জাতি নামেমাত্র হলেও এখনও ইসলামের কোনো কোনো বিধান মেনে চলছে বলে মুসলিম সমাজে নারীদের অধিকার ও মানমর্যাদা এখনো নিরাপদ রয়েছে। দুনিয়ার যেকোনো জাতির নারীদের তুলনায় মুসলিম নারী তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে পূর্ণ সন্তুষ্টি ও সম্মানের সাথে জীবনযাপন করছে।

কিন্তু জড়বাদী পাশ্চাত্যে নারীমুক্তির শ্লোগান নিছক এক প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুক্তি বা উন্নতির সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। আজকাল পাশ্চাত্যের সচেতন বুদ্ধিজীবী এমনকি পুঁজিপতিরাও একথা স্বীকার করছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের এই মহামারী ব্যাধি নিরাময়ের প্রচেষ্টা গ্রহণের সৎসাহস তাঁদের নেই। ফলে তাঁরা সবকিছু দেখে-শুনেও চোখ বুজে সহ্য করছেন। তাছাড়া যথার্থ সংস্কার ও সংশোধনের ফলে তাদের গোটা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী কাঠামোই ধসে পড়বে। কারণ পাশ্চাত্যের উভয় জড়বাদী জীবন-দর্শন অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ একই বৃক্ষের দুটি বিষফল। এই উভয় জড়বাদী দর্শনই নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং ইসলাম যখন গোটা বিশ্বমানবতার সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান জানায় তখন কায়েমী স্বার্থের শিখণ্ডি এসব পুঁজিপতি এবং সমাজবাদী চক্রই তাদের মুখোশ লুকাতে গিয়ে দাগী অপরাধীদের মতো ইসলামের বিরোধিতা করে।

এখানে আমরা অর্থহীন তর্কবিতর্ক আর উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় জড়াতে চাই না। আসলে আমরা ওসব অপরাধচক্রের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই যারা মুক্তি ও প্রগতির মুখরোচক বলতে বিপদগ্রস্ত মানবতাকে তাদের হীন স্বার্থের শিকারে পরিণত করে আসছে। এরাই নারীকে বাজারের পণ্য-বিজ্ঞাপন আর দু'কড়ির বিলাসদ্রব্যে পরিণত করেছে। কাঁচা পয়সার চাকচিক্য দেখিয়ে এরাই নারীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে এবং এরাই নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এরা নারীকে তার মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। এরাই নারীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে চরম অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছে। এই পুঁজিবাদী গোষ্ঠী আর সমাজবাদী চক্র তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন একটি কাজও করেনি যাতে নারী তথা মানবতার কোনো কল্যাণ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্যের নারী এসব অপরাধী গোষ্ঠীর হাতের পুতুল সেজে নিজেদের মান-মর্যাদা ও অধিকারকে পানির দামে বিকিয়ে কি নিজেদের সাথে সুবিচার করেছে? আমরা এই প্রশ্নের জবাব চাই। তাঁরা যদি এখন নেশার ঘোরে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন, বা তাঁরা যদি এর জবাব দিতে অপ্রস্তুত হন, তাহলে আমরা অন্য প্রশ্ন করবো যে, তাঁরা কি স্রষ্টার পক্ষ থেকে ন্যস্ত তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করেছেন? তাঁরা কি তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন?

স্পষ্টত যদি তাঁদের জীবন দাম্পত্য ও মাতৃত্বের মহান উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ, স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতির মহত্তম বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থেকে থাকে তাহলে তা সত্যিই আক্ষেপের বিষয়। যদি তাঁরা এসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে তাঁদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। ব্যস, যেমন চললো তেমনই জীবন কাটিয়ে দেওয়া হলো। পরিবার-সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তনে তাদের কোনো ভূমিকা রইলো না। রইলো না কোনো মহৎ লক্ষ্য।

যেখানে ইচ্ছা যার তার সাথে যৌনতৃপ্তি মেটানোর মধ্যে জীবনের কি মূল্য থাকতে পারে? জীবনে যদি তাদের কোনো মূল্য বা মর্যাদাই না থাকে তাহলে তাদের মানুষ হয়ে জন্মানোর অর্থটাই কি থাকবে? তাঁরা যে অবনতির কোনো নিম্নতম অতল তলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সম্ভবত সেই অনুভূতি থেকেও তাঁরা আজ বঞ্চিত। তাঁরা যে কতো হীন-অসহায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন সেই অনুমানও হয়তো তাঁদের নেই!

এতসব বাস্তবতার প্রত্যক্ষ উদাহরণের পরও কি আমাদের চোখ খোলেনি এবং আমরা কি এখনো এটা বুঝতে পারিনি যে, আধুনিক নারী তার নিজের সাথে সুবিচার করছে না কি অবিচার?

পঞ্চম অধ্যায়

মহিলাদের জরুরী মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারীর পর্দা

প্রশ্ন-১. কোনো গায়র মাহরাম ড্রাইভারের সাথে মহিলার একাকি কোথাও যাওয়া বৈধ কি?

উত্তর : না, গাড়ি বা বাইকে এমন কোনো পুরুষের সাথে মহিলার একাকি যাওয়া বৈধ নয়, যার সাথে বিবাহ বৈধ। যথা– বাস, ট্রেন বা জলজাহাজের কোনো সফরে যাওয়া, এমনকি কোনো ইবাদাতের সফরেও বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، اِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গে ছাড়া একাকি একদিন এক রাতের সফর করা বৈধ নয়।"[২৬৩]

তিনি আরো বলেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ اِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّ امْرَاَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ.

"কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা মহিলার সঙ্গে তার সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে।" এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে

---

[২৬৩] বুখারী: হাদীস নং: ১০৮৮, মুসলিম-১৩৩৮।

আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, যাও, "তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।"[২৬৪]

তিনি আরও বলেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী হয়।"[২৬৫]

স্থানীয় কোথাও গেলে সাথে যদি অন্য কোনো সাবালক ছেলে, পুরুষ বা মহিলা থাকে, তাহলে যাওয়া চলে। কিন্তু সফর দীর্ঘ হলে সাথে মাহরাম ছাড়া মোটেই যাওয়া বৈধ নয়; যদিও সাথে অন্য মহিলা বা পুরুষ থাকে।

প্রশ্ন-২. মহিলাদের জন্য পর্দা করা উত্তম, নাকি তা ফরয?

উত্তর : মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয। করলে উত্তম না করলেও চলে এমন নয়। আর পর্দা বলতে চেহারা ঢাকা পর্দা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে পর্দায় মহিলাদের চেহারা ঢাকার ব্যাপারে দুই শ্রেণির আমল ছিল। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহিলারা চেহারা ঢাকত না। কিন্তু বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে চেহারা ঢেকেই পর্দা করতেন। কোনো কোনো হাদীসে চেহারা না ঢাকার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

প্রশ্ন-৩. পত্র-পত্রিকা, টিভি বা নেটের ছবিতে মহিলা দেখা কি হারাম?

উত্তর : হ্যাঁ। ছবিতেও অন্য মহিলা দেখা হারাম। যেহেতু তাতেও ফিতনা আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"বিশ্ববাসীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।"[২৬৬]

এ নির্দেশ জীবিত, মৃত, মূর্তি বা ছবি সর্ব প্রকার মহিলা দেখার ব্যাপারে প্রযোজ্য।

---

[২৬৪] মুসলিম: হাদীস নং: -১৩৪১।
[২৬৫] সুনানে তিরমিযী, -১১৭১।
[২৬৬] আল- কুর'আন : ২৪: ৩০।

প্রশ্ন-৪. ছাপা কাগজে মহিলার ছবি দেখা কি হারাম?

উত্তর : বেগানা মহিলার প্রতি তাকানো হারাম, তাই ছাপা কাগজেও মহিলার ছবি দেখা হারাম।

প্রশ্ন-৫. আপন মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো বোন, চাচী, মামী, স্ত্রীর বোন বা ভাবীর সাথে মুসাফাহা করা বৈধ কি?

উত্তর : যার সাথে পুরুষের বিবাহ বৈধ, তার সাথে মুসাফাহা করা অথবা তার চেহারা দেখা বৈধ নয়। কাপড় বা কাপড়ের উপরেও তার হাত ধরে মুসাফাহা হারাম। মহিলা বুড়ি অথবা পুরুষ বুড়ো হলেও মুসাফাহা হারাম। বায়আতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস

مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ.

"হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।"[২৬৭]

বলা বাহুল্য, মহিলার জন্য তার মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই, ফুফা, খালু, স্বামীর ভাই, (দেবর), বোনাই বা নন্দাইয়ের সাথে মুসাফাহাহ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৬. মাহরাম মহিলাদের মাথা চুম্বন করা কি বৈধ?

উত্তর : বৈধ, যদি তাতে কামনা-বাসনা না থাকে।

প্রশ্ন-৭. মহিলাদের চাকরি করা কি বৈধ?

উত্তর : বৈধ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চাকরি করা বৈধ। শর্ত হলো, সে কর্মক্ষেত্র কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হতে হবে। পুরুষ-মহিলা একই স্থলে কর্ম হলে, সে চাকরি বৈধ নয়। যেহেতু তাতে ফেতনা আছে। নারী মোহিনী ও আকর্ষণীয়।

---

[২৬৭] ত্বাবারানী, ৪৮৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।"[২৬৮]

সুতরাং পরপুরুষ হতে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে মহিলাকে। এমনকি নামাযের কাতারের ব্যাপারে তিনি বলেন,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হলো সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো প্রথম কাতার।[২৬৯]

বলাই বাহুল্য যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মিশ্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও চাকরি মুসলিম মহিলার জন্য বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৮. চিকিৎসার জন্য কি বেপর্দা হওয়া বৈধ?

উত্তর : মহিলার চিকিৎসার জন্য প্রথমত মহিলা ডাক্তার খোঁজা জরুরি। না পাওয়া গেলে পুরুষ ডাক্তারের কাছে স্বামী বা কোনো মাহরামের উপস্থিতিতে চিকিৎসা করানো জরুরি। মহিলা ডাক্তার থাকতে পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করা হারাম। যেমন পুরুষ ডাক্তারের কাছে প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গ প্রকাশ করা অবৈধ।

প্রশ্ন-৯. মহিলা সেন্ট ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে যেতে পারে কি?

উত্তর : পর্দার সাথে হলেও মহিলা সেন্ট বা পারফিউম জাতীয় কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে যেতে পারবে না। কারণ তাতে ফিতনা আছে। মহনবী ﷺ বলেন,

إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا.

"প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোনো প্রকার) সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে

---

[২৬৮] আহমাদ, বুখারী-৫০৯৬, মুসলিম-২৭৪০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।
[২৬৯] আহমাদ, মুসলিম-৪৪০, সুনান আরবাআহ, মিশকাত-১০৯২।

সে এমন এমন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিন ভাষা (বেশ্যার মেয়ে) ব্যবহার করলেন।"[২৭০]

এমনকি মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেতেও সে সেন্ট ব্যবহার করতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেন,

لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ، وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ.

"আল্লাহর বান্দিদের মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খুশবু ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।"[২৭১]

اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتّٰى تَغْتَسِلَ.

"যে মহিলা সেন্ট ব্যবহার করে মসজিদে যাবে, সেই মহিলার গোসল না করা পর্যন্ত কোনো নামায কবূল হবে না।"[২৭২]

প্রশ্ন-১০. স্বামী যদি পর্দা করতে বাধা দেয়, তাহলে স্ত্রীর করণীয় কী?

উত্তর : স্বামীর জন্য ওয়াজিব স্ত্রীকে পর্দার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাকে বেপর্দার দিকে ঠেলে দেওয়া নয়। বন্ধু-বান্ধবের সামনে দেখা সাক্ষাৎ করতে গিয়ে নিজের তথা তার সর্বনাশ আনয়ন করা মোটেই বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।"[২৭৩]

---

[২৭০] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে-৪৫৪০।
[২৭১] আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহ জামে-৭৪৫৭।
[২৭২] ইবনে মাজাহ-৪০০২, সহীহ জামে- ২৭০৩।
[২৭৩] তাহরীম-৬।

আর স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, বেপর্দা হওয়ার ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা। স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব। কিন্তু গোনাহর বিষয়ে তার আনুগত্য বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"স্রষ্টার অবধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির বাধ্য হওয়া বৈধ নয়"।[২৭৪]

কিন্তু পর্দা করার জন্য যদি কোনো হতভাগা স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, তাহলে তাও গ্রহণ করতে পারে সে। হয়তো বা মহান আল্লাহ তার জীবনে উত্তম স্বামী মিলিয়ে দেবেন, যাকে নিয়ে সে ইহকাল এবং পরকালে সুখী হবে।

প্রশ্ন-১১. ডাক্তারের সাথে নার্সের এবং ম্যানেজারের সাথে মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারির নির্জনতা অবলম্বন বৈধ কি?

উত্তর : বৈধ না। কারণ শরীআতের নির্দেশ হলো, "কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে মাহরিম ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে।"[২৭৫]

আর "যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী হয়।"[২৭৬]

মহান আল্লাহ বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

"মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।"[২৭৭]

আর এ কারণেই কোনো মুসলিম মহিলার জন্য এমন চাকরি নেওয়া বৈধ নয়, যেখানে পর-পুরুষের সাথে ওঠাবসা করতে বা নির্জনতায় থাকতে হবে।

---

[২৭৪] আহমাদ, হাকেম, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং: ৩৩৭১৭।
[২৭৫] বুখারী ও মুসলিম।
[২৭৬] তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী-৯৩৪।
[২৭৭] আল ইমরান-১৪।

প্রশ্ন-১২. মহিলা কি ড্রাইভিং করতে পারে?

উত্তর : শরীআতের দুটি নীতি আছে: ১. যে বৈধ কাজ অবৈধ কোনো কাজে টেনে নিয়ে যায়, তা অবৈধ। ২. মঙ্গল আনয়ন অপেক্ষা অমঙ্গল দূর করা অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

এই নীতির আলোকে বলা যায় যে, মহিলা ড্রাইভিং করতে পারে না। যেহেতু তারা ড্রাইভিং করলে তাদেরকে চেহারা খুলতে হবে। তেল ভরতে, টায়ার ইত্যাদি পরিবর্তন করতে, চেক-পয়েন্টে, পথে গাড়ি বিকল হলে পুরুষদের সাথে কথা বলতে হবে। নির্জন জায়গায় বিকল হলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। তার যৌবন তাকে অজানা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে। এ ছাড়া আরো অনেক কারণে মহিলাদের জন্য ড্রাইভিং বৈধ নয়।

প্রশ্ন-১৩. অন্ধ শিক্ষকের সামনে ছাত্রীর বেপর্দা হয়ে কি পড়া যায়?

উত্তর : পরিপূর্ণ অন্ধ হলে তার সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। কারণ সে তো দেখতেই পায় না। নবী করীম ﷺ ফাতেমা বিনতে কায়িসকে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহর বিন উম্মে মাকতুমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করতে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, "সে অন্ধ একজন লোক। তুমি তার কাছে নিজের চাদর খুলে রাখবে (সে তোমাকে দেখতে পাবে না)"[২৭৮] তাছাড়া নবী করীম ﷺ এর পেছনে লুকিয়ে থেকে মা আয়েশা হাবশীদের খেলা দেখতেন।[২৭৯] পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর ভাষ্য "তোমরা দু'জনেও কি অন্ধ?"[২৮০]

তবে শর্ত হলো, মহিলা অন্ধের প্রতি (অনুরূপ কোনো পুরুষের প্রতি) কামদৃষ্টিতে তাকাবে না। কারণ মহান আল্লাহ মহিলাকেও নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

---

[২৭৮] মুসলিম-১৪৮০।
[২৭৯] বুখারী-৯৫০, মুসলিম-৮৯২।
[২৮০] এ হাদীস সহীহ নয়।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তবে যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২৮১]

প্রশ্ন-১৪. বিবাহের পূর্বে কি বাগ্‌দত্ত স্বামী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশা বা ফোনে কথাবার্তা বলা বৈধ?

উত্তর : যতক্ষন না বিবাহ্-বন্ধন কায়েম হয়েছে, ততক্ষণ পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, অবাধ মেলামেশা বা যৌনজীবনের কথাবার্তা বলা হারাম। অভিভাবকের জন্যও হারাম ছেলেমেয়েকে এমন অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া। অবশ্য বিবাহের পূর্বে এক নজর দেখে নেওয়া বৈধ। যেমন আকদের পরে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা যৌনজীবনের কথাবার্তা বলা ও যৌন মিলনও বৈধ।

প্রশ্ন-১৫. কোনো যুবতীকে বোন বা বন্ধু বানিয়ে কি তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলা ও পত্রালাপ করা বৈধ?

উত্তর : কোনো যুবতীর সাথে কোনো যুবকের নিষ্কাম বন্ধুত্ব অসম্ভব। পরন্তু সেই বন্ধুত্বের জেরে দেখা সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলা ও পত্রালাপ করা নিঃসন্দেহে হারাম। তেমনি কোনো যুবতীকে বোন বানিয়েও অনুরূপ দেখা সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলা ও পত্রালাপ করা বৈধ নয়। কারণ বোন বলতেই বান আসে। বোন বলতে বলতেই মনের বান তুফান তোলে। তেমনি কারো সাথে মা পাতিয়েও অনুরূপ দেখা সাক্ষাৎ অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি বৈধ নয়। যেহেতু কাউকে বউ বললেই যেমন সে নিজের বউ হয়ে যায় না। তেমনি কাউকে মা বা বোন বললেই নিজের মাহরাম হয়ে যায় না; যতক্ষণ না তাদের সাথে রক্ত, দুগ্ধ বা বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম হয়েছে।

---

[২৮১] সূরা নূর-৩১।

প্রশ্ন-১৬. মহিলা কি পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে পারে?

উত্তর : মহিলা প্রয়োজনে পর পুরুষের সাথে কথা বলতে পারে। তবে সে কথা যেন স্বাভাবিক হয়। রুক্ষ ও কর্কষ হয় এবং তা যেন মধুময় আকর্ষণীয় না হয়। মহান আল্লাহর বাণী,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর।"[২৮২]

প্রশ্ন-১৭. পরপুরুষের সাথে পার্থিব ও দ্বীনী কথা বলাও কি হারাম?

উত্তর : পর্দার আড়াল থেকে পরপুরুষের সাথে পার্থিব ও দ্বীনী কথা বলা হারাম নয়। তবে নামাযের জামাআতে ইমামের ভুল সংশোধন করতে মহিলা তাসবীহ বলবে না; বরং হাত দ্বারা শব্দ করবে।

প্রশ্ন-১৮. মহিলারা কি নার্সের কাজ করতে পারবে?

উত্তর : কেবল মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে করতে পারে। কোনো বেগানা পুরুষের সেবা-শুশ্রুষা করা তার জন বৈধ নয়। অনুরূপ পুরুষ নার্স কেবল পুরুষ রোগীর খিদমত করতে পারে।

প্রশ্ন-১৯. অনেকে বলে মহিলা সতী হলে, তার মন পবিত্র হলে পর্দার দরকার হয় না।

উত্তর : মহিলা যতই সতী ও পবিত্র মনের হোক, তার জন্য পর্দা ওয়াজিব। কোনো মহিলার মন কোনো সাহাবী মহিলার মন হতে বেশি পবিত্র হতে পারে না। অথচ তাদেরকেই পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পরন্তু কেউ সতী হলে সে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারবে ঠিকই, কিন্তু পর পুরুষের নজর ও মনকে কি পবিত্র রাখতে পারবে? সে নিজের মনকে পবিত্র রেখে নিজ রূপ সৌন্দর্য দ্বারা পর পুরুষের মনকে প্রলুব্ধ করলে কি পর্দার উদ্দেশ্য সফল হবে? সুতরাং পর্দা সতী অসতী সকলের জন্য। অসতী মেয়ে পর্দা করলেও পর্দার ভেতরে তার অসতীত্ব বজায় থাকবে। ঘোমটার ভেতরে খোমটার নাচ দেখিয়ে পরিবেশ নোংরা করবে। আর তার হিসাব তো ভিন্ন আল্লাহর কাছে।

---

[২৮২] সূরা আহযাব-৩২।

প্রশ্ন-২০. কিছু পুরুষ আছে, যারা বাড়ির সকল দায়িত্ব স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তি নেয়। এমনকি কেনাকাটা পর্যন্ত স্ত্রী নিজেই করে। এমন পুরুষ সম্বন্ধে শরীআতের বিধান কী?

উত্তর : কিছু পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে 'দাইয়ূস' হয়। যারা স্ত্রীর বেপর্দা ও নোংরামিতেও সায় দিয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দাইয়ূস' (স্ত্রী-কন্যার পর্দহীনতা ও নোংরামির ব্যাপারে ঈর্ষাহীন) ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না।"[২৮৩]

আর কিছু পুরুষ ততটা না হলেও স্ত্রীর আঁচল ধরা হয়। সে গাঁড়ল হয়ে স্ত্রীকে মোড়ল বানায়। এমন অসফল পুরুষ জেনে অথবা অজান্তে নিজেকে প্রভু স্ত্রীর 'বাধ্য গোলাম' বানায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।"[২৮৪]

পাশ্চাত্যের সভ্যতা-ঘেঁষা এমন পুরুষরা কোনোদিন দ্বীন-দুনিয়ায় সফল হতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "সে জাতি কোনো দিন সফলকাম হতে পারবে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।"[২৮৫]

---

[২৮৩] নাসাঈ-২৫৬১।
[২৮৪] সূরা নিসা-৩৪।
[২৮৫] বুখারী-৪৪২৫।

মহিলা সেন্ট লাগিয়ে মসজিদে নামায পড়তে গেলেও তার জন্য নামায শুদ্ধ নয়। আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত, একদা চাশতের সময় তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদে প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবু হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস সালাম'। মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি কোথায় যাবে? সে বলল, মসজিদের জন্য। তিনি বললেন কী জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি? সে বলল, মসজিদে আসার জন্য। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, বলল, আল্লাহর কসম! পুনরায় বললেন, আল্লাহর কসম, বলল, আল্লাহর কসম! তখন তিনি বললেন, তবে শোনো আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাশেম ﷺ বলেছেন, "সেই মহিলার কোনো নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধী ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মতো গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।[২৮৬]

প্রশ্ন-২১. পৃথক গার্লস স্কুল-কলেজ না থাকলে মেয়েদেরকে যৌথ প্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠানো কি বৈধ হবে?

উত্তর : ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশার যৌথ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে পড়তে পাঠানো বৈধ নয়। মুসলিমদের ওয়াজিব হলো পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং নিজেদের মেয়ে-বোনকে পরপুরুষের আকর্ষণে আসতে বাধা দেওয়া।

প্রশ্ন-২২. এমন পর্দাহীন দেশ ও পরিবেশেও কি পর্দা করা ওয়াজিব, যেখানে পর্দাটাই মানুষের কাছে দৃষ্টি আকর্ষক হয়?

উত্তর : এমন দেশ ও পরিবেশ, যেখানে পর্দা নেই অথবা বিরল, যেখানে মহিলারা দিনেও নাইট ড্রেস পরে থাকে অথবা নগ্নপ্রায় থাকে, সেখানেও মুসলিম মহিলার জন্য পর্দা ওয়াজিব। যদিও চাদর বা বোরকা সেখানকার বেদ্বীন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ হলো আল্লাহর বিধান। এ বিধান সর্বত্র বহাল থাকবে।

প্রশ্ন-২৩. বাড়ির চাকরকে কি পর্দা করতে হবে? হাউজবয়, হাউস ড্রাইভারকে পর্দা করা তো বড় কঠিন। আমার মা বলে, 'মাথায় কাপড় থাকলে সমস্যা নেই' তার কথা কি ঠিক?

উত্তর : বাড়ির চাকর ক্রীতদাস নয়। চাকর, ড্রাইভার প্রভৃতি সেবক হলেও তারা পুরুষ। আর যে পুরুষ মাহরাম নয়, তার সামনে মহিলার পর্দা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে আপনার মায়ের কথা ঠিক নয়। কারণ মাথায় কাপড় নিলেই পর্দা হয়ে যায় না। চেহারা হলো আসল সৌন্দর্যের জিনিস। আর তা খোলা রাখলেই মিষ্টি হাসি ও চোখাচোখির ফলে বিপদ আসন্ন হতে পারে।

---

[২৮৬] আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ-১০৩১।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.

"তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।"[২৮৭]

প্রশ্ন-২৪. আমি আমাদের বাড়ির ড্রাইভারের সাথে একাকি কলেজে যাই। কখনও মার্কেট করতেও যাই। আমার মন তার প্রতি আকৃষ্ট না হলে শরীআতের দৃষ্টিতে কি কোনো সমস্যা আছে তাতে?

উত্তর : আপনার ছোট ভাই যদি সাবালক হয়, তাহলে বেগানা হাউস ড্রাইভারের সাথে আসা যাওয়া চলবে। পক্ষান্তরে যদি নাবালক হয়, তাহলে তার আপনার সাথে থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

প্রশ্ন-২৫. আমরা আমাদের বাড়ির হাউস ড্রাইভারের সাথে দুই বোন কলেজে যাই। কখনও মার্কেটেও যাই তাকে নিয়ে। শরীআতের দৃষ্টিতে কি কোনো সমস্যা আছে তাতে?

উত্তর : একাধিক মহিলা হলে বেগানা হাউস ড্রাইভারের সাথে শহরের ভেতরে আসা যাওয়া চলবে। তবে নিরাপত্তার শর্তসাপেক্ষে। কিন্তু দূরের সফর বৈধ নয়, যদিও তা ইবাদাতের হয়।

প্রশ্ন-২৬. স্ত্রীর চাকরি করাতে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি কী কী?

উত্তর : পুরুষ মহলে চাকরি করলে অবাধ মেলামেশার সমস্যা, বেপর্দা হওয়ার সমস্যা, চরিত্র খারাপ হওয়ার সমস্যা, সন্তান লালন-পালনের সমস্যা, বাড়িতে আয়ার সাথে স্বামীর নির্জনতাবলম্বনের সমস্যা ইত্যাদি। আর মহিলা-মহলে চাকরি করলে সন্তান লালন-পালনের সমস্যা, বাড়িতে আয়ার সাথে স্বামীর নির্জনতাবলম্বনের সমস্যা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২৭. অবরোধ প্রথা কি ইসলামে স্বীকৃত?

উত্তর : ইসলামে অবরোধ প্রথা নেই। ইসলামে আছে পর্দার বিধান। মহিলার কর্মস্থল মাঠে-ঘাটে, কল কারখানায়, অফিসে ক্লাবে নয়। ইসলাম মহিলাকে বাড়িতে থাকতে নির্দেশ দেয়। কুরআন বলে,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক ইসলামী) জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না।"[২৮৮]

---

[২৮৭] সূরা আহযাব-৫৩।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"তাদের ঘর্ই তাদের জন্য উত্তম।"[২৮৯]

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা ঘরের ভেতরে অবরুদ্ধ থাকবে বরং তারা প্রয়োজনে পর্দার সাথে বের হতে পারবে। তবে তারা (প্রাক ইসলামী) জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াতে পারবে না। তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে তারা সুগন্ধি বিলিয়ে বের হতে পারবে না। তারা প্রয়োজনে মাঠে-ঘাটে ও বাজারে যেতে পারে। তবে ছল করে জল আনতে যাওয়ার মতো অপ্রয়োজনে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াবে না।

মহিলা হেরেমের বন্দিনী নয়। যদিও কোনো কোনো পরিবেশে বাড়াবাড়ি করে তাকে বন্দিনী করে রাখা হয়। স্বামী স্ত্রীর কর্তা বলে কোনো কোনো পুরুষ তার উপর অবৈধ কর্তৃত্ব করে।

প্রশ্ন-২৮. বেগানা মহিলার উপর আচমকা দৃষ্টি পড়ে গেলে হাদীসে বলা হয়েছে, "তুমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও" (মুসলিম) মহিলাদের ক্ষেত্রেও কি একই নির্দেশ? তারাও কি বেগানা পুরুষদের দিকে তাকাতে পারবে না?

উত্তর : হ্যাঁ, এই নির্দেশে সবাই সমান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.

"বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।[২৯০]

তবে কামদৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো বৈধ দৃষ্টিতে তাকানো যাবে। মা আয়েশা হাবশীদের খেলা দেখছেন। নবী করীম ﷺ তাকে আড়াল করে তা দেখিয়েছেন।[২৯১] টিভি প্রভৃতির পর্দায় বা ছবিতে পুরুষ দেখার ক্ষেত্রেও একই বিধান। কামনজর নিয়ে তাকানো যাবে না।

প্রশ্ন-২৯. যুবক যুবতীর মাঝে বন্ধুত্ব, অতঃপর পোস্ট, এসএমএস, ইমেল, ফেসবুক প্রভৃতির মাধ্যমে চিঠি লেখালিখি করে হৃদয়ের আদান-প্রদান করা কি বৈধ? যদি তাদের মাঝে বিবাহের এঙ্গেইজমেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?

উত্তর : বেগানা যুবক যুবতীর মাঝে নিষ্কাম বন্ধুত্ব অসম্ভব। কারো দ্বারা বিরলভাবে তা সম্ভব হলেও শরীআতে তা হারাম। তাদের পরস্পর পত্রালাপ ও

---

[২৮৮] সূরা আহযাব-৩৩।
[২৮৯] আবূ দাউদ ৫৭৬।
[২৯০] সূরা নূর-৩১।
[২৯১] বুখারী-৯৫০, মুসলিম-৮৯২।

রসালাপ বৈধ নয়। ইনগেইজমেন্ট (বাগদান) হয়ে গেলেও বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যেমন তাদের মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হারাম, তেমনি চিঠির মাধ্যমে হৃদয়ের আদান প্রদানও। যেহেতু তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর ফিতনা ও দাজ্জাল থেকে পাকা মুমিনকেও দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২৯২]

প্রশ্ন-৩০. বিবাহের পূর্বে যুবক যুবতীর একে অপরকে বুঝে নেওয়ার, পছন্দ করে নেয়ার, ভালোবাসা করে নেওয়ার সুযোগ ইসলামে আছে কি?

উত্তর : বিবাহের পূর্ব বর কনের একে অপরকে এক নজর দেখে নেওয়ার ও পছন্দ করে নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু তারপরে চিঠি, ফোন বা নেটের মাধ্যমে অথবা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার মাধ্যমে ভালোবাসা করে নেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। বিবাহ বন্ধন কায়েম করা বা বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পর বিবাহ সারার পূর্বে সব চলবে। বন্ধনের আগে নয়। বিএ পরীক্ষা দেওয়ার আগে হয়তো টেস্ট পরীক্ষা আছে। কিন্তু বিয়ে করার আগে কোনো টেস্ট পরীক্ষা নেই।

প্রশ্ন-৩১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাসা থেকে বের হওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কিন্তু অনেক সময় সে বাড়িতে না থাকলে পাশের বাসা অথবা কাছের মার্কেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তখন কি তার বিনা অনুমতিতে গেলে গোনাহ হবে?

উত্তর : স্ত্রীর উচিত, এ ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে রাখা। অতঃপর শরয়ী আদবের সাথে নিজের বা ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে বাইরে কোথাও গেলে কোনো ক্ষতি হবে না ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন-৩২. সত্তর আশি বছরের বৃদ্ধা যদি বেগানা পুরুষকে পর্দা না করে, তাহলে কোনো ক্ষতি আছে কি?

উত্তর : সত্তর আশি বছরের বৃদ্ধার জন্য পর্দা ফরয থাকে না। সে বেগানা পুরুষকে দেখা দিতে পারে। তবে শর্ত হলো, সে যেন সেজেগুজে প্রসাধন করে বের না হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে বৃদ্ধার

---

[২৯২] আহমাদ ৪/৪৩১,৪৪১, আবূ দাউদ-৪৩১৯।

পর্দা করাটাই উত্তম। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন, "তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২৯৩]

প্রশ্ন-৩৩. শরয়ী পর্দা করলে স্বামী তালাক দিতে চায়। সুতরাং আমি কী করতে পারি?

উত্তর : বুঝানোর পরও যদি না মানে, তাহলে সন্তান হওয়ার আগে আগেই এমন হতভাগা স্বামীর নিকট থেকে তালাক নেওয়াই ভালো। ইনশা আল্লাহ পরবর্তীতে তার চেয়ে ভালো স্বামী জুটে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।"[২৯৪] কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, দ্বীন মানার জন্য স্ত্রীকে তালাকের হুমকি দেওয়া। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেন। অথচ ভাগ্যের ব্যাপারে যে চায় সে পায় না। পরন্তু সে পায়, যে চায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

প্রশ্ন-১. বহু বিবাহ বা একাধিক বিবাহকে অনেক মুসলিমও ঘৃণা করে। যদিও অনেকে তা কামনা করে। ইসলামে বহু বিবাহের বিধান কী?

উত্তর : অধিকাংশ মানুষের বহু বিবাহকে ঘৃণা করার কারণ হচ্ছে সতীনের সংসারের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ। পুরুষ তার একাধিক স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না অথবা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে পারে না বলে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়, তা দেখে মানুষ বহু বিবাহকে ঘৃণা করে। অথচ ইসলামে বিবাহের ব্যাপারে মৌলিক বিধান হলো, সামর্থ থাকলে পুরুষ একাধিক বিবাহ করবে। তবে বহু স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ বজায় না রাখতে পারলে একটি নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

---

[২৯৩] সূরা নূর-৬০।
[২৯৪] সূরা ত্বালাক- ২।

"আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুই তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের জন্য পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।[২৯৫]

পরন্তু একাধিক বিবাহ করা শর্তসাপেক্ষে জায়েয। যেহেতু আমাদের মহানবী ﷺ একাধিক বিবাহ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. সাঈদ বিন জুবাইরকে বলেছিলেন, বিবাহ কর। কারণ, এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যার সবার চেয়ে বেশি স্ত্রী। অথবা, এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সবার চেয়ে বেশি স্ত্রী ছিল।[২৯৬]

উল্লেখ্য, একই সাথে চারটির বেশি স্ত্রী রাখা হারাম। যেমন উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সমানাধিকার দিয়ে রাখার ক্ষমতা না হলে একটাই বিবাহ করতে হবে। তাতেও সক্ষম না হলে রোযা পালন করে যেতে হবে।[২৯৭]

প্রশ্ন-২. যাকে রক্ত দেওয়া হয়েছে, তার সাথে কি বিবাহ বৈধ?

উত্তর : কাউকে রক্ত দান করলে তার সাথে রক্তের সম্পর্ক কায়েম হয় না। সুতরাং তার সাথে বিবাহ বৈধ।

প্রশ্ন-৩. কোনো বিবাহিত মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ কি?

উত্তর : কোনো বিবাহিত স্বামীওয়ালী সধবা মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার তালাক হয়েছে অথবা তার স্বামী মারা গেছে এবং নির্ধারিত ইদ্দতকাল অতিবাহিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

"নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সাধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হলো আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো; এই শর্ত যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়।[২৯৮]

---

[২৯৫] সূরা নিসা-৩।
[২৯৬] আহমাদ, বুখারী।
[২৯৭] বুখারী-৫০৬৫, মুসলিম-১৪০০।
[২৯৮] সূরা নিসা-২৪।

প্রশ্ন-৪. একজনের বিবাহিত স্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থায় অন্যের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে বৈধ কি?

উত্তর : মহান আল্লাহ যে সকল মহিলাকে বিবাহ হারাম বলেছেন, তার মধ্যে একজন হলো বিবাহিত মহিলা, যে কোনো স্বামীর বিবাহ বন্ধনে বর্তমানে সংসার করছে এবং তালাক হয়নি।

বলা বাহুল্য, একজনের স্ত্রী অবস্থায় থাকাকালে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনই শুদ্ধ হবে না। কিন্তু অন্ধপ্রেম সেই দম্পতিকে চির ব্যভিচারের নর্দমায় ফেলে দেয়।

প্রশ্ন-৫. এক ব্যক্তি এক কুমারীর সাথে (প্রেম করে) ব্যভিচার করেছে, এখন সে বিবাহ করতে চায়। এটা কি তার জন্য বৈধ?

উত্তর : বৈধ। যদি বাস্তবে তাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের ওপর আল্লাহর নিকট তাওবা করা ওয়াজিব; এই নিকৃষ্টতম অপরাধ হতে বিরত হবে, অশ্লীলতায় পড়ার ফলে যা ঘটে গেছে, তার উপর খুব লজ্জিত হবে, এমন নোংরামীর পথে পুনরায় পা না বাড়াতে দৃঢ়সংকল্প করতে হবে এবং অধিক অধিক সৎকাজ করবে। সম্ভবত আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত করবেন। যেমন তিনি বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

“যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তিকে দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, (পূর্ণ) ঈমান এনে সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপরাশিকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।”[২৯৯]

---

[২৯৯] সূরা ফুরকান-৬৮-৭১।

আর ঐ ব্যক্তি যদি ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে বিবাহ বন্ধনের পূর্বে এক মাসিক দেখে তাকে (গর্ভবতী কি না তা) পরীক্ষা করে নেবে। যদি (মাসিক না হয় এবং) তার গর্ভ প্রকাশ পায়, তাহলে তার বিবাহ বন্ধনে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরের ফসলকে নিজের পানি দ্বারা সিঞ্চিত (অর্থাৎ অন্যের বিবাহিত নারীকে বিবাহ করে সঙ্গম) করতে নিষেধ করেছেন।[৩০০]

প্রশ্ন-৬. কোনো মুসলিমের সাথে অমুসলিমের বিবাহ কি বৈধ?

উত্তর : কোনো মুসলিম মহিলার সাথে অমুসলিম পুরুষের বিবাহ বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

"মুশরিকা রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মুশরিকা নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত মুশরিকা পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিও না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[৩০১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

---

[৩০০] আবূ দাউদ, লাজানাহ দায়েমাহ।

[৩০১] সূরা বাক্বারা-২২১।

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কাছে বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগ করে এলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। যদি তোমরা তাদেরকে মোহর দিয়ে দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা ফেরত চেয়ে নাও এবং অবিশ্বাসীরা ফেরত চেয়ে নিক, যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর ফায়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩০২]

বলা বাহুল্য, ইসলাম গ্রহণ করলে তার সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ বৈধ। অনুরূপ কোনো মুসলিম পুরুষও কোনো অমুসলিম মহিলাকে বিবাহ করতে পারে না। অবশ্য কিছু শর্তের সাথে কেবল ইহুদী খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.

"বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো) যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান করে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়।[৩০৩]

[৩০২] সূরা মুমতাহিন-১০।
[৩০৩] সূরা মায়িদা-৫।

কিন্তু কোনো মুসলিম মহিলা কোনো ইহুদী খ্রিস্টান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। কারণ মুসলিমরা তাদের নবীর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু তারা মুসলিমদের নবীর প্রতি ঈমান রাখে না।

প্রশ্ন-৭. হালালা বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর : স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর লজ্জিত হয়ে ভুল বুঝতে পেরে তাকে ফিরে পেতে 'হালালা' পন্থা অবলম্বন বৈধ নয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে হালাল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোনো বন্ধু বা চাচাতো মামাতো ভায়ের সাথে বিবাহ দিয়ে এক রাত্রি বাস করে তালাক দিলে পরে ইদ্দতের পর নিজে বিবাহ করা এক প্রকার ধোঁকা এবং ব্যভিচার। যাতে দ্বিতীয় স্বামী এক রাত্রি ব্যভিচার করে এবং প্রথম স্বামী ঐ স্ত্রীকে হালাল মনে করে ফিরে নিয়েও তার সাথে চিরদিন ব্যভিচার করতে থাকে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী ঐরূপ বিবাহ করে, হাদীসের ভাষায় সে হলো 'ধার করা ষাঁড়।'[৩০৪]

এই ব্যক্তি এবং যার জন্য হালাল করা হয়, সে ব্যক্তি (অর্থাৎ প্রথম স্বামী) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অভিশপ্ত।[৩০৫]

প্রশ্ন-৮. জায়বদলি বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর : জায়বদলি বা বিনিময়-বিবাহ বিনা মোহরে বৈধ নয়। এ ওর বোন বা মেয়েকে এবং ও এর বোন বা মেয়েকে বিনিময় করে পাত্রীর বদলে পাত্রীকে মোহর বানিয়ে বিবাহ ইসলামে হারাম।[৩০৬]

অবশ্য বহু উলামার নিকট উভয় পাত্রীর পৃথক মোহর হলেও জায়বদলী বিয়ে বৈধ নয়। (যদি তাতে কোনো ধোঁকা ধাপ্পা দিয়ে নামকে-ওয়াস্তে মোহর বাঁধা হয় তাহলে।

প্রশ্ন-৯. মুতআহ বিবাহ বৈধ কী?

উত্তর : মুত্আহ বা সাময়িক বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। কিছুর বিনিময়ে কেবল এক সপ্তাহ বা মাস বা বছর স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যেহেতু ঐ স্ত্রী ও তার সন্তানের দুর্দিন আসে, তাই ইসলাম এমন বিবাহকে হারাম ঘোষণা করেছে।[৩০৭]

প্রশ্ন-১০. তালাকের নিয়তে বিবাহ বৈধ কী?

উত্তর : তালাকের নিয়তে বিবাহ এক প্রকার ধোঁকাবাজি। বিদেশে গিয়ে বা দেশেই বিবাহ-বন্ধনের সময় মনে মনে এই নিয়ত রাখা যে কিছুদিন সুখ লুটে

---

[৩০৪] ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯।
[৩০৫] ঐ ১৮৯৭, মিশকাত৩২৯৬।
[৩০৬] বুখারী, মুসলিম।
[৩০৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-৩১৪৭।

তালাক দিয়ে দেশে ফিরব বা চম্পট দেব, তবে এমন বিবাহও বৈধ নয়। (এরূপ করলে ব্যভিচার হয়) কারণ, এতেও স্ত্রী ও তার সন্তানের অসহায় অবস্থা নেমে আসে। তাতে নারীর মান ও অধিকার খর্ব হয়।

প্রশ্ন-১১. বাল্যবিবাহ কি বৈধ?

উত্তর : বাল্যবিবাহ বৈধ।[৩০৮] তবে সাবালক হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে পছন্দ না হলে তারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে।[৩০৯]

প্রশ্ন-১২. কোনো মুসলিমের জন্য বেশ্যা বা অসতী মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ কি?

উত্তর : কোনো মুসলিম কোনো ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করতে পারে না; বরং এ ব্যাপারে ঐরূপ নারী মনোমুগ্ধকর সুন্দরী রূপের ডালি বা ডানাকাটা পরি হলেও মুসলিম পুরুষের তাতে রুচি হওয়াই উচিত নয়। একান্ত প্রেমের নেশায় নেশাগ্রস্ত হলেও তাকে সহধর্মিণী করা হারাম।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

"ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকে এবং ব্যভিচারিণী কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদী পুরুষকে বিবাহ করে থাকে। আর মুমিন পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হলো।"[৩১০]

সুতরাং অসতী নারী মুশরিকের উপযুক্ত; মুসলিমের নয়। কারণ, উভয়েই অংশীবাদী; এ পতির প্রেমে উপপতিকে অংশীস্থাপন করে এবং ও করে একক মাবূদের ইবাদাতে অন্য বাতিল মাবূদকে শরিক। (অবশ্য অসতী হলেও কোনো মুশরিকের সাথে কোনো মুসলিম নারীর বিবাহ বৈধ নয়।)

পক্ষান্তরে ব্যভিচারিণী যদি তাওবা করে প্রকৃত মুসলিম নারী হয়, তাহলে এক মাসিক অপেক্ষার পর তবেই তাকে বিবাহ করা বৈধ হতে পারে। গর্ভ হলে গর্ভাবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ নয়। প্রসবের পর বিবাহ হতে হবে।

---

[৩০৮] মুসলিম, মিশকাত-৩১২৯।
[৩০৯] বুখারী-৫১৩৮,আবূ দাউদ, মিশকাত-৩১৩৬।
[৩১০] সূরা নূর-৩।

প্রশ্ন-১৩. একই সাথে চারের অধিক মহিলাকে স্ত্রীরূপে রাখা বৈধ কি?

উত্তর : ইসলামী বিধান হলো প্রয়োজনে ৪টি মহিলাকে একই সময়ে স্ত্রীরূপে রাখা যায়। তার বেশি নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُولُوا.

"আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের জন্য পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।[৩১১]

প্রশ্ন-১৪. নাতিন বা পুতিনকে ঠাট্টাছলে অনেকে 'গিন্নী' বলে। তাহলে তাদের সাথে কি নানা বা দাদার বিবাহ বৈধ?

উত্তর : নাতিন ও পুতিনের কাছে তাদের নানা ও দাদা পিতাস্বরূপ এবং নানা-দাদার কাছে তারা কন্যা বা মেয়েস্বরূপ। তাদের পরস্পর বিবাহ বৈধ নয় এবং ঐ শ্রেণির ঠাট্টা-উপহাসও বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ......

"তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ......।"[৩১২]

প্রশ্ন-১৫. স্ত্রী থাকতে তার বোনকে অথবা তার বোনঝি বা ভাইঝিকে অথবা তার খালা বা ফুফুকে বিবাহ করা বৈধ কি?

উত্তর : দুই বোনকে সতীন বানানো কুরআনী বিধানে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

---

[৩১১] সূরা নিসা-৩।
[৩১২] সূরা নিসা- ২৩।

"(হারাম করা হয়েছে) দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩১৩]

আর হাদীসের বিধানে ফুফু, ভাইঝি বা খালা, বোনঝিকে সতীন বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩১৪]

প্রশ্ন-১৬. কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, জোরপূর্বক বর বা কনেকে বিবাহের কাবিন-নামা বা তালাক-পত্রে সই করিয়ে বিবাহ বা তালাক দেওয়া হয়। কিন্তু জোরপূর্বক বিবাহ বা তালাক কি বৈধ?

উত্তর : জোরপূর্বক বিবাহ বা তালাক হিসেবে গণ্য নয়। ভয় দেখিয়ে বা হুমকির মুখে কাউকে বিয়ে করে সংসার করলে ব্যভিচার করা হবে। অনুরূপ তালাকও। জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হলে কেউ মুসলিম হয়ে যায় না, জোরপূর্বক কুফুরী করালে যেমন কেউ কাফের হয় না। তেমনি বিবাহ ও তালাকও। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"কেউ বিশ্বাস করার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল।"[৩১৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃত এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ) থেকে (ক্ষমা) করেন।"[৩১৬]

প্রশ্ন-১৬. আমি বিবাহের বয়স-উত্তীর্ণ একজন ধনী ও রোগী মহিলা। আমি একজন সুপুরুষকে বিবাহ করে কেবল স্ত্রীর মর্যাদা পেতে চাই। আমি আমার পৈতৃক বাড়িতেই থাকব। আমি তার কাছে কোনো প্রকার খোরপোশ দাবি করব না। সে কেবল মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাবে। তার প্রথম স্ত্রী আছে। সে তার ঐ স্ত্রীর কাছে আমার কথা গোপন রাখবে। সে রাজি, আমি রাজি, আমার অভিভাবকও রাজি। এমন বিবাহে কোনো সমস্যা আছে কি?

---

[৩১৩] সূরা নিসা-২৩।
[৩১৪] সূরা বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-৩১৬০।
[৩১৫] সূরা নাহল-১০৬।
[৩১৬] ইবনে মাজাহ-২০৪৫।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত আছে, তা পূরণ হলে এমন বিবাহ বৈধ। আপনার অভিভাবক, সাক্ষীস্বরূপ কমপক্ষে দুইজন সৎ ব্যক্তি, দেনমোহর, বিবাহের প্রচার ইত্যাদি। খোরপোশ স্বামীর উপর ফরয, কিন্তু আপনি তা থেকে তাকে মুক্তি দিলে তা বৈধ হবে। আর তার প্রথম স্ত্রী এর খবর না জানালে বা অনুমতি না দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-১৭. অনেক সময় উপযুক্ত পাত্র বিবাহের প্রস্তাব দিলে মেয়ে অথবা মেয়ের বাপ এই বলে বাদ করে দেয় যে, পড়া শেষ হলে তবেই বিয়ে হবে। এটি কি বৈধ?

উত্তর : এটা বৈধ নয়। পড়া কোনো ওজর নয়। তাছাড়া বিয়ের পরও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া যায়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ে) বিবাহ দাও। যদি তা না কর, তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি হবে।"[৩১৭]

প্রশ্ন-১৮. বর ভিন দেশে থাকলে টেলিফোনের মাধ্যমে বিয়ে পড়ালে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : বিবাহের ব্যাপারটা দুটি জীবনের চির-বন্ধন। সুতরাং ধোঁকাবাজির আশঙ্কায় টেলিফোন বা নেটের মাধ্যমে বিয়ে পড়ানো বৈধ নয়। অবশ্য বরের ফিরে আসার আগে বিয়ে পড়ানো একান্ত জরুরি হলে যেখানে সে থাকে, সেখানের পরিচিত কাউকে উকীল বা প্রতিনিধি বানিয়ে বিয়ে পড়ানো যায়।

প্রশ্ন-১৯. বিবাহের পর মোহর কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর : স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলে, নির্জনতা অবলম্বন করলে অথবা বিবাহের পর মারা গেলে মোহর ওয়াজিব হয়। কেবল বিয়ে পড়ালেই মোহর ওয়াজিব হয় না। নির্জনবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন-২০. নাবালিকার বিবাহ কি শুদ্ধ নয়?

উত্তর : দেশীয় আইনে সাবালিকা হয় ১৮ বছর পূর্ণ হলে। কিন্তু শরীআতের আইনে সাবালিকা হলো সেই মেয়ে, যার স্বাভাবিকভাবে মাসিক শুরু হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তা অনুমতিক্রমে বিবাহ দিলে বাধা নেই। অবশ্য মেয়ে না চাইলে জোরপূর্বক বিবাহ শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন-২১. অনেক বৃদ্ধ অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে, এটি কি শরীআতে বৈধ?

উত্তর : মেয়ে ও তার অভিভাবক সম্মত থাকলে সে বিবাহ বৈধ।

---

[৩১৭] তিরমিযী-১০৮৫,ইবনে মাজাহ-১৯৬৭।

প্রশ্ন-২২. নামকরা বংশীয় ছেলে বা মেয়ের সাথে কি বংশ-পরিচয়হীন ছেলে বা মেয়ের বিবাহ্ শুদ্ধ নয়?

উত্তর : কোনো কোনো মানুষ এই ভেদাভেদ-জ্ঞান রেখে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী হাতছাড়া করে। অথচ তা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপররের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ্-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।"[৩১৮]

আর মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হলো সেই যার চরিত্র সুন্দর।"[৩১৯]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশি পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চবংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"[৩২০]

নবী করীম ﷺ বলেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের বিবাহ দাও। যদি তা না কর (শুধু দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও; বরং দ্বীন বা চরিত্র থাকলেও কেবল বংশ, রূপ বা ধন-সম্পত্তির লোভে বিবাহ্ দাও। তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।"[৩২১]

প্রশ্ন-২৩. মেয়ে যাকে বিয়ে করতে রাজি নয়, তার সাথে বাপ জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে কি?

উত্তর : মেয়ে রাজি না থাকলে কারো সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া শরীআতসম্মত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "অকুমারীর পরামর্শ বা জবানী অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীর সম্মতি না নিয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর কুমারীর সম্মতি হলো নীরব থাকা।[৩২২]

---

[৩১৮] আল কুর'আন, সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩।
[৩১৯] ত্বাবারানী, সহীহুল জামে-১৭৯।
[৩২০] আল-আদাবুল মুফরাদ।
[৩২১] তিরমিযী-১০৮৫,ইবনে মাজাহ-১৯৬৭।
[৩২২] বুখারী, মুসলিম, সহীহ নাসাঈ-৩০৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ-১৫১৬।

প্রশ্ন-২৪. বিয়েতে বাবা রাজি ছিল না। ভাই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে অবশ্য বাপ রাজি হয়ে গেছে। এখন সে বিয়ের হুকুম কী?

উত্তর : বাপ থাকতে ভাই অভিভাবক হতে পারে না। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ নয়। পরবর্তীতে রাজি হলেও পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে। অনুরূপ যারা পালিয়ে গিয়ে মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে তাদের অবস্থা একই রকম।

প্রশ্ন-২৫. অবৈধ প্রণয়ের মাধ্যমে অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোর্ট-ম্যারেজ বা লাভ-ম্যারেজ বৈধ কি?

উত্তর : বিয়ের পূর্বে কোনো যুবক-যুবতীর ভালোবাসা করা হারাম। অতঃপর পরস্পর অবাধ মিলামিশা ও ব্যভিচার করা তো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যভিচার হলো ফৌজদারি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ১০০ চাবুকাঘাত। পরন্তু বিবাহিত হলে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত। অতঃপর যে মা-বাপ কত মায়া মমতার সাথে মানুষ করে, সেই মা বাপের মাথায় লাথি মেরে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে লাভ-ম্যারেজ বা কোর্ট-ম্যারেজ করে তা তো পশুর সমতুল্য। কিন্তু সে বিয়েতে মেয়ের বাপ রাজি না থাকলে বিয়ে শুদ্ধই হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।"[৩২৩]

এমন চোরদের দাম্পত্য, চির-ব্যভিচারের হয়। যেহেতু তাদের বিবাহ শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন-২৬. মা-বাবার পছন্দমতো বিয়ে কি ছেলের জন্য জরুরি? মা-বাপ যখন নিজেদের কোনো আত্মীয়-বন্ধুর মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চায়, অথবা বেশি পণদাতা ঘরের মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চায়, অথচ ছেলের পছন্দ না হয়, তাহলে কি তাদের বাধ্য হয়ে সেই বিয়ে করা জরুরি? দ্বীনদার মেয়ে যদি বাপ-মা পছন্দ না করে, তাহলে ছেলে কী করতে পারে?

উত্তর : ছেলের যে মেয়ে পছন্দ নয়, তার সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া বাপের জন্য জায়েয নয়; বরং বরের সম্মতি না থাকলে জোর করে বিয়ের বন্ধনই হবে না। বাপ-মা নিজেদের স্বার্থ দেখলে এবং বউ পছন্দে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য না দিলে ছেলে নিজেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু যে মেয়ে বাপের পছন্দ নয়, সে মেয়েকে নিজে নিজে বিয়ে করে ঘরে আনলে যদি তারা ঘরে জায়গা না দেয়, তাহলে অবশ্যই তা বড় অন্যায়। অবশ্য মেয়ে খারাপ বা অসতী হওয়ার ফলে যদি মা-বাপ বাধ সাদে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

---

[৩২৩] আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত-৩১৩১।

প্রশ্ন-২৭. পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রীর কী কী দেখা যায়? বর ছাড়া কি বরের বাপ-চাচা, ভাই-বন্ধু বা বোনাইও কি পাত্রী দেখতে পারে?

উত্তর : পাত্রী দেখতে গিয়ে বরের জন্য পাত্রীর চেহারা, হাত ও পায়ের পাতা দেখা বৈধ। অনেকে বলেছেন, খোলা মাথাও দেখা যায়। তবে শর্ত হলো, পাত্রীকে নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করা বৈধ নয়। বাপ-মায়েরও উচিত নয় তাদেরকে কোনো রুমে একাকী ছেড়ে দেওয়া।

বর ছাড়া ঐ পাত্রীকে অন্য কোনো পুরুষ, বরের বাপ-চাচা, ভাই-বন্ধু বা বোনাই দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে মেয়ে যদি বেপর্দা হয় অথবা যদি পর্দা বিরোধী হয়, তাহলে আর ফতোয়া কিসের!

প্রশ্ন-২৮. অনেক ছেলে আছে, যারা বিয়ের আগে হবু বউকে দেখতে লজ্জা করে এবং বলে, মা-বোন দেখলেই যথেষ্ট। তাদের পছন্দ হলে আমারও পছন্দ হয়ে যাবে। এটা কি ঠিক?

উত্তর : এ হলো সেই ছেলেদের কথা, যারা নিজের মা-বোনকে চরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কিন্তু তার ফলে নিজের জীবনের একটি মহাফয়সালার সময়ে তাদের অন্ধভক্ত সাজা ঠিক নয়; বরং অন্ধভক্ত সাজতে হলে তাদের থেকেও বেশি প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাজতে হয়। তিনি বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি প্রস্তাবের জন্য তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়, যদিও ঐ মহিলা তা জানতে না পারে।"[৩২৪]

এক মহিলার সাথে মুগীরাহ বিন শু'বাহর বিয়ের কথা পাকা হলো। তিনি তাঁকে বললেন, "তাকে দেখে নাও। কারণ তাতে বেশি আশা করা যায় যে, তোমাদের ভালোবাসা চিরস্থায়ী হবে।"[৩২৫]

সুতরাং এই নির্দেশের উপরে মা-বোনের দেখাকে প্রধান্য দেওয়া জ্ঞানী যুবকের উচিত নয়। যাতে তাকে পরে পস্তাতে না হয় এবং মা-বোনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের প্রতি অভক্তি না চলে আসে। যেহেতু বিয়ের আগে দেখে অপছন্দ হলে তাকে বর্জন করার সুযোগ থাকবে, কিন্তু বিয়ের পরে সে সুযোগ বিরল।

প্রশ্ন-২৯. যাকে বিয়ে করব তাকে তার অজান্তে লুকিয়ে দেখতে পারি কি?

উত্তর : বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেওয়া বিধেয়। যাতে পছন্দ-অপছন্দ করার মতো সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়। সুতরাং যদি কেউ বিবাহ করার পাক্কা নিয়তে নিজ পাত্রীকে তার ও তার অভিভাবকের অজান্তে গোপনে থেকে লুকিয়ে দেখে, তাহলে তাও বৈধ। তবে এমন স্থান থেকে লুকিয়ে দেখা বৈধ নয়,

---

[৩২৪] সিলসিলাহ সহীহাহ-৯৭।

[৩২৫] আহমাদ ৪/২৪৪,২৪৬, তিরমিযী-১০৮৭,নাসাঈ-৬/৬৯, ইবনে মাজাহ-৮৬৬।

যেখানে সে তার একান্ত গোপনীয় অঙ্গ প্রকাশ করতে পারে। অতএব স্কুলের পথে বা কোনো আত্মীয়র বাড়িতে থেকেও দেখা যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোনো রমণীকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়, তখন প্রস্তাবের জন্যই যদি তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়; যদিও ঐ রমণী জানতে না পারে।"[৩২৬]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি এক তরুণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাকে দেখার জন্য লুকিয়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আমি তার সেই সৌন্দর্য দেখলাম, যা আমাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করল। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করলাম।[৩২৭]

প্রশ্ন-৩০. এ্যাঙ্গেইজমেন্ট বা বাগদানের সময় বর-কনের আংটি পরা কী ঠিক?

উত্তর : এটি একটি ইউরোপীয় ও বিজাতীয় প্রথা। মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়, কেননা এতে বিজাতির অনুসরণ করা হয়।

প্রশ্ন-৩১. আমাদের বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। আগামী বছর বিবাহ হবে। ততদিন পর্যন্ত আমি কি আমার হবু স্ত্রীকে টেলিফোনের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারি? কোনো সাংসারিক আলাপ- আলোচনা করতে পারি কি?

উত্তর : পাত্রী দেখার পর বিবাহ ঠিক হয়ে গেলে অথবা পাকা কথা বা তার দিন স্থির হয়ে গেলে হবু স্ত্রীর সাথে পর্দার সাথে বা টেলিফোনে অথবা পত্রালাপের মাধ্যমে দ্বীনী বা সাংসারিক কোনো আলোচনা করা হারাম নয়। তবে তা হারামের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তবুও যদি সত্যই আপনি হারামের দিকে না যান, অর্থাৎ কোনো যৌন বিষয় বা প্রেম-ভালোবাসার কথা আলোচনা না করেন, আর তা অবশ্যই কঠিন, তাহলে আপনি তা করতে পারেন। নচেৎ ক্ষেতের পাশে চরতে চরতে যদি ক্ষেতের ফসলও খেতে শুরু করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি গোনাহগার হবেন।

প্রশ্ন-৩২. কনের মাসিক অবস্থায় কি বিয়ে পড়ানো যায়?

উত্তর : কনের মাসিক অবস্থায় বিয়ে পড়ানোতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো, বাসররাতে স্বামীর সহবাস করা। যেহেতু তাতে রয়েছে মহাপাপ।

প্রশ্ন-৩৩. বিয়ের সময় উলুধ্বনি দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর : বিয়ের সময় উলু-উলু খুশির ধ্বনি বৈধ নয়। এ সময় বর-কনেকে দু'আ করতে হয়।

---

[৩২৬] সিঃ সহীহাহ-৯৭।
[৩২৭] সিঃ সহীহাহ-৯৯।

প্রশ্ন-৩৪. বিবাহের সময় খাস মহিলা মহলে কেবল মহিলাদের সামনে মহিলারা নাচতে পারে কি?

উত্তর : মহিলাদের নাচে অনেক প্রকার ফিতনার আশঙ্কা আছে। তাই তা মাকরূহ।

প্রশ্ন-৩৫. বিবাহের সময় মেয়েরা ঢোল বাজিয়ে গান করতে পারে কী?

উত্তর : কেবল মহিলাদের সামনে হলে ও কেবল তাদের কানে গেলে 'দফ' (একমুখো ঢোলক) বাজিয়ে বৈধ গান গাওয়া যায়। (সাফা) তার মানে বেগানা পুরুষদের সামনে বা তাদেরকে শুনিয়ে গাইলে অথবা তার সঙ্গে ঢোল বা অন্য কোনো মিউজিক হলে অথবা গান অশ্লীল বা শির্কী বা বিদআতী হলে চলবে না।

প্রশ্ন-৩৬. বিবাহের পর মহিলা-মহলে বর-কনেকে 'একঠাঁই' করা বৈধ কি? উল্লেখ্য, সেখানে বরের সাথে তার বোনাই-বন্ধুও থাকে। সেখানে বর-কনেকে নিয়ে চলে নানা লেকাচার, নানা কীর্তি। এগুলো কি বৈধ?

উত্তর : বাড়ির ভেতরে বেপর্দা মেয়েদের এমন 'একঠাঁই' করা বৈধ নয়। শরীআতে এমন বেহায়ামির সমর্থন নেই।

প্রশ্ন-৩৭. স্ত্রী কি নির্জনে কেবল স্বামীকে নানা অঙ্গ-ভঙ্গির সাথে নাচ দেখাতে পারে?

উত্তর : তাতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন-৩৮. গান-বাজনা হারাম। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরকে শুনায়, তাহলে তাতে ক্ষতি আছে কি?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে প্রেমের গান গেয়ে শুনাতে পারে। তবে তাতে শর্ত হলো, যেন তার সাথে বাজনা না থাকে এবং তারা ছাড়া অন্য কেউ তা শুনতে না পায়। এমনকি তাদের সন্তানরাও তা না শোনে। কারণ, এটিও এক প্রকার স্পর্শ ও চুম্বনের মতো মিলনের ভূমিকা।

প্রশ্ন-৩৯. স্বামীর হাতে আংটি বা স্ত্রীর হাতে চুড়ি রাখা কি জরুরি? তা খুলে ফেললে কি কোনো অমঙ্গল বা বিপদের আশঙ্কা আছে?

উত্তর : দাম্পত্যের চিহ্নস্বরূপ হাতে আংটি দেওয়া বৈধ নয়। কারণ তা অমুসলিমদের আচরণ। হাতের সৌন্দর্যের জন্য মহিলাদের চুড়ি পরা বৈধ। তবে তাতে এই বিশ্বাস রাখা অমূলক যে, তা খুলে ফেললে স্বামীর কোনো অমঙ্গল ঘটবে।

প্রশ্ন-৪০. আমাদের বিবাহের দিনে আমি কি আমার স্ত্রীকে কোনো উপহার দিয়ে স্মৃতিচারণ করে খুশি করতে পারি?

উত্তর : এ দরজা খুলে দেওয়া ঠিক মনে করি না। কারণ ধীরে ধীরে তা বিজাতির 'হানিমুন' ও 'বিবাহ-বার্ষিকী' পালনের প্রথা হিসেবে পালন শুরু হয়ে

যাবে। সুতরাং প্রত্যহ না পারলেও অনির্দিষ্ট দিনে কোনো উপহার পেশ করে ঐ খুশি করা যায়। নচেৎ মুসলিম দম্পতির তো সর্বদা খোশ থাকার কথা। মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হলো সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ করে দেয়, যাকে কোনো আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোনো অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না" ।৩২৮

প্রশ্ন-৪১. স্ত্রী কি কুলক্ষণা হতে পারে?

উত্তর : মহানবী ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো কিছুতে কুলক্ষণ থাকে, তাহলে তা আছে নারী, বাড়ি ও (গাড়ি) সওয়ারীতে।"[৩২৯]

ভাগ্যদোষে এমন কুলক্ষণা স্ত্রী এসে স্বামীর সুখী জীবনকে দুঃখময় করে তুলতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে তাকদীরের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শিরক। কিছুকে অপয়া মনে করা শিরক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শিরক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।"[৩৩০]

প্রশ্ন-৪২. আমার স্বামী বড় কৃপণ। আমার ব্যাপারে এবং আমাদের ছেলেমেয়ের ব্যাপারে পয়সা খরচ করতে বড় কৃপণতা করে । এখন তার অজান্তে যদি টাকা-পয়সা নিয়ে খরচ করি, তাহলে সেটা কি চুরি হবে?

উত্তর : স্বামী যদি সত্য-সত্যই কৃপণ হয় এবং বাস্তবেই যদি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অর্থাভাবে কষ্ট হয়, তাহলে তার অজান্তে তার অর্থ নিয়ে প্রয়োজনে খরচ করা বৈধ। তবে তা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। অধিক বিলাসিতা করার জন্য না হয়। অথবা অন্য কোনো আত্মীয়কে দেয়ার জন্য না হয়। একদা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ নবী করীম ﷺ কে বললেন যে, 'আবু সুফয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই, তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।"[৩৩১]

---

[৩২৮] আহমাদ, নাসাঈ।

[৩২৯] বুখারী।

[৩৩০] আহমাদ ১/৩৭৮, ৪৪০, আবু দাউদ ৩৯১০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিঃ সহীহাহ ৪৩০নং।

[৩৩১] বুখারী ও মুসলিম।

প্রশ্ন-৪৩. আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে না। কথায় কথায় আমাকে গালাগালি করে, মারধরও করে। ছেলেমেয়ে এবং কাছের ও দূরের মানুষের কাছে আমাকে আপমানিত করে। কিন্তু সে আবার নামাযও পড়ে। সুখ- শান্তির জন্য আমি এখন কী করতে পারি?

উত্তর : ১. আপনি ধৈর্য ধরুন এবং গালি ও মারের বদলা নেওয়া থেকে দূরে থাকুন। ২. আল্লাহর কাছে নামাযে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ আপনার স্বামীকে সৎ বানায়। ৩. কেন আপনাকে গালাগালি বা মারধর করছে, তার কারণ আবিষ্কার করুন। আপনি বলছেন, 'সে নামাযী।' তাহলে আশা করি, সে পাগল নয় এবং মাদকদ্রব্যও সেবন করে না। তাহলে কেন খামোখা আপনাকে গালাগালি করবে? ভেবে দেখুন, দোষ আপনার মধ্যে নেই তো? আপনার পারিপাট্য, সাজগোজ বা সময়ানুবর্তিতাতে কোনো ত্রুটি নেই তো? আপনি কি আপনার স্বামীর সব চাহিদা মিটাতে পেরেছেন? আপনি কি সেই স্ত্রী, যার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হলো সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খুশি করে দেয়, যাকে কোনো আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোনো অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।"[৩৩২] আপনি হয়তো কোনো কোনো ব্যাপারে তার মতের সাথে মত মিলাতে পারছেন না। আপনি হয়তো চাচ্ছেন, সে আপনার মতে চলুক। অথচ বৈধ বিষয়ে তার আনুগত্য করা আপনার জন্য ওয়াজিব। সে আপনার কর্তা, অথচ আপনি হয়তো তাকে নিজের কর্তা বলে মেনে নিতে পারছেন না। আর তার জন্যই সে আপনার প্রতি বিরাগ। আপনি হয়তো তার মুখের ওপর মুখ দেন, তার প্রতি মুখ চালান। আর তার জন্যই সে আপনাকে মারধর করে। যাই হোক, কারণ নির্ণয় করে জ্ঞানী মেয়ের মতো তার বাধ্য হয়ে যান। আর এতে নিজেকে ছোট মনে করবেন না। কারণ, স্বামীর মর্যাদার কাছে প্রত্যেক স্ত্রীই ছোট; যদিও স্ত্রী ধনে, বংশে ও শিক্ষায় স্বামীর তুলনায় বড় হয়। এ কথা মেনে নিতে পারলে আপনাদের সুখ-শান্তির বাগানে আবার বসন্ত ফিরে আসবে।

প্রশ্ন-৪৪. বিবাহের চার মাস পর আমার স্ত্রীর সাথে আমার মায়ের মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। এক সময় অশান্তি করে সে তার বাবার বাড়ি চলে গেল। অতঃপর পুনরায় সে আমাদের বাড়ি আসতে চাইল না। সে বলল, 'যদি আমাকে নিয়ে আপনি অন্য কোথাও অথবা আমার বাপের বাড়িতে থাকতে পারেন, তাহলে সংসার করব। নচেৎ নয়। এখন আমি কী করি? আমার মা-বাপ

---

[৩৩২] আহমাদ, নাসাঈ।

বউয়ের খিদমত চায়। কিন্তু আমরা অশান্তি চাই না। এখন শান্তি বজায় রাখার জন্য যদি অন্যত্র কোথাও মা-বাপকে ছেড়ে বসবাস করি, তাহলে কি আমি গোনাহ্গার হব? নাকি আমি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেব?

উত্তর : সংসারের এটি একটি মহাসমস্যা। মা ও বউয়ের খেয়াল - খুশির মাঝে পুরুষ দিশেহারা হয়ে যায়। মায়ের মন রক্ষা করা জরুরি। আবার অপর্যাপ্ত কারণে তালাক দেওয়াও হারাম। সুতরাং শেষ পথ এটাই যে, আপনি বউ নিয়ে অন্যত্র বাস করুন, মায়ের সংসার থেকে পৃথক হয়ে যান। তবে মা-বাপের সুবিধার কথা ভুলবেন না। পারলে তাদের জন্য দাসী রেখে নেবেন।

প্রশ্ন-৪৫. বাপ-মায়ের আদেশ পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু তারা যদি বউ তালাক দিতে বলে, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : বাপ-মায়ের আদেশ পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু তারা যদি অন্যায় আদেশ করে, তাহলে তা পালন করা হারাম। সুতরাং বউ তালাক দিতে বললে কারণ জানতে হবে। কারণ যদি সঠিক হয় এবং সে কারণে বউ তালাক দেওয়া ওয়াজিব হয়, তাহলে বুঝানোর পর তালাক দেবে। পক্ষান্তরে কারণ যদি সঠিক না হয়, কেবল বউয়ের প্রতি ঈর্ষাবশত হয়, তাহলে তালাক দেওয়া বৈধ নয়। পুরুষকে পরীক্ষা দিতে হবে সংসারের এই মা-বউয়ের দ্বন্দ্বে। শরীআতই হবে সঠিক ফায়সালাদাতা। কোনো আবেগ বা প্রেম, কোনো ঈর্ষা বা হিংসা অথবা কোনো পার্থিব লোভ-লালসা যেন পুরুষকে কারো প্রতি অন্যায় আচরণে বাধ্য না করে।

প্রশ্ন-৪৬. সন্তান বেশি হলে মানুষ গরিব হয়ে যাবে। এ কথা বলা কি ঠিক?

উত্তর : অবশ্যই ঠিক নয়। কারণ রুযীর মালিক আল্লাহ। কেউ কারো রুযীর দায়িত্ব নিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের রুযী বহন করে না; আল্লাহই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রুযী দান করেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।[৩৩৩]

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি।[৩৩৪]

---

[৩৩৩] সূরা আনকাবুত : ৬০।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

"তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্যভয়ে হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চিয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[৩৩৫]

প্রশ্ন-৪৭. গর্ভ-নিরোধক ট্যাবলেট ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর : মুসলিমের উচিত, সংখ্যা-বৃদ্ধিতে শরীআতের উদ্দেশ্যকে সফল করা। তবুও যদি অতি প্রয়োজন পড়ে, যেমন মহিলা যদি রোগা হয়, প্রত্যেক বছর সন্তান হওয়ার ফলে অতি দুর্বল হয়ে পড়ে, অথবা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে ট্যাবলেট ব্যবহার করে সাময়িকভাবে সন্তান বন্ধ রাখতে পারে। অবশ্য সেই সাথে স্বামীর অনুমতি ও ডাক্তারের পরামর্শও জরুরি। পক্ষান্তরে জীবনহানির আশঙ্কা ছাড়া চিরতরের জন্য গর্ভধারণের পথ বন্ধ করে দেওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৪৮. টেস্টটিউবের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার করা কি বৈধ?

উত্তর : বীর্য স্বামীর হলেও তা টেস্টটিউবের মধ্যে রেখে স্ত্রী গর্ভে রাখতে গিয়ে তার লজ্জাস্থান খোলা ও তা স্পর্শ করা হয় ইত্যাদি। আমার মতে স্বামী-স্ত্রীর উচিত, এ কাজ না করে তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

প্রশ্ন-৪৯. কৃত্রিমভাবে সন্তান নেওয়ার বিধান কী ?

উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে সন্তান প্রজনন মূলত দুইভাবে হয়ে থাকে:

ক. আভ্যন্তরিক প্রজনন। আর তা এভাবে হয় যে, পুরুষের বীর্য সিরিঞ্জের সাহায্যে নারীর গর্ভাশয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে রাখা হয়।

খ. বাহ্যিক প্রজনন। আর তা এভাবে হয় যে, নারী-পুরুষের বীর্য নির্দিষ্ট টেস্টটিউবে নিয়ে মিলন ঘটানোর পর যথাসময়ে নারীর গর্ভাশয়ে রাখা হয়।

উক্ত দুই পদ্ধতির প্রজনন অনুসারে ছয়ভাবে সন্তান নেওয়া হয়ে থাকে।

ইসলামী শরীআতে তার কিছু বৈধ, কিছু অবৈধ। প্রথমত: অভ্যন্তরীণ প্রজনন:

১. সঙ্গমের সময় স্বামীর বীর্য স্ত্রীর গর্ভাশয়ে কারণবশত না পৌঁছলে তা নিয়ে সিরিঞ্জের সাহায্যে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে সন্তান নেওয়া ।

২. স্বামীর বীর্যে শুক্রকীট না থাকলে অন্য কোনো পুরুষের বীর্য নিয়ে সিরিঞ্জের সাহায্যে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে সন্তান নেওয়া।

---

[৩৩৪] সূরা আনআম : ১৫১।
[৩৩৫] সূরা বানী ইস্রাঈল : ৩১।

৩. স্বামী-স্ত্রীর বীর্য নিয়ে টেস্টটিউবে রেখে মিলন ঘটিয়ে যথাসময়ে তা স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে সন্তান নেওয়া।

৪. স্ত্রীর গর্ভাশয় সুস্থ, কিন্তু তার ডিম্বাণু না থাকার ফলে স্বামীর বীর্য এবং অন্য কোনো মহিলার ডিম্বাণু নিয়ে প্রজনন টেস্টটিউবে মিলন ঘটিয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে সন্তান নেওয়া।

৫. স্বামীর বীর্যে শুক্রকীট না থাকলে এবং স্ত্রীর গর্ভাশয় সুস্থ, কিন্তু তার ডিম্বাণু না থাকার ফলে অন্য পুরুষের বীর্য এবং অন্য কোনো মহিলার ডিম্বাণু নিয়ে প্রজনন টেস্ট-টিউবে মিলন ঘটিয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে সন্তান নেওয়া।

৬. স্ত্রীর গর্ভাশয় সন্তান ধারণে অক্ষম হলে অথবা গর্ভ-ধারণের কষ্টবরণ না করতে চাইলে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য নিয়ে টেস্ট-টিউবে রেখে মিলন ঘটিয়ে যথাসময়ে তা অন্য কোনো মহিলার গর্ভাশয়ে স্থাপন করে সন্তান নেওয়া।

সরাসরি ব্যভিচার ছাড়া উক্ত ছয় উপায়ে সন্তান গ্রহণ প্রচলিত রয়েছে বিশ্বের বহু দেশে এবং সে জন্য বীর্য ব্যাংকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে এই শ্রেণির সন্তান নেওয়া বিধান নিম্নরূপ: কেবল বিলাসিতার জন্য কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়া ইসলামে বৈধ হতে পারে না। কারণ, পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের নিকট স্ত্রীর লজ্জাস্থান প্রকাশ করা বৈধ নয়। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য প্রথমত মুসলিম মহিলা ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা ওয়াজিব। তা না পাওয়া গেলে অমুসলিম মহিলা ডাক্তার। তা না পাওয়া গেলে মুসলিম পুরুষ ডাক্তার। পরিশেষে তাও না পাওয়া গেলে অমুসলিম পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো বৈধ। তাতেও কোনো পুরুষ ডাক্তারের সাথে কোনো রুমে একাকিনী চিকিৎসা করানো বৈধ নয়। জরুরি হলো, সেই রুমে তার স্বামী অথবা অন্য কোনো মহিলা থাকবে।

বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলিম মহিলা ডাক্তারের কাছে যাওয়া বৈধ। তবে সন্তান গ্রহণের ছয়টি পদ্ধতির মধ্যে কেবল প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা বৈধ। আর উক্ত উভয় পদ্ধতিতে যে সন্তান হবে, তা হবে বৈধ সন্তান।

কিন্তু অবশিষ্ট ২,৪,৫ ও ৬ নং পদ্ধতিতে প্রজন্মিত সন্তান বৈধ সন্তান হবে না। যেহেতু তাতে বংশে অন্য বংশের অবৈধ সংমিশ্রণ ঘটে।

পরিশেষে সতর্কতার বিষয় এই যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন মুসলিম উক্ত দু'টি বৈধ পদ্ধতিও অবলম্বন না করে, কারণ তাতেও টেস্ট-টিউবের মাধ্যমে অজ্ঞাত-পরিচয় শুক্রানূর অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা থাকে।

প্রশ্ন-৫০. অনেক পুরুষ আছে, যাদের কন্যা-সন্তান হলে স্ত্রীকে দোষ দেয়, তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এমন পুরুষদের ব্যাপারে শরীআতের বিধান কী?

উত্তর : নিঃসন্দেহে এ আচরণ বর্তমানের পণ ও যৌতুক প্রথার করালগ্রাসের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় দুর্বল ঈমানের মানুষ দ্বারা ঘটে থাকে। আর যে স্বামী কন্যা প্রসব করার জন্য স্ত্রীকে দায়ী করে, তার জ্ঞানও দুর্বল। কারণ, বীজ তো তারই। জমির দোষ কী? তাছাড়া কন্যা তার জন্য ভালো হবে না মন্দ, তাই বা সে জানল কী করে? সমাজে দেখা যায় যে, কত কন্যার পিতামাতা সুখী এবং কত পুত্রের পিতামাতা চিরদুঃখী। তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তার দেওয়া ভাগ ও ভাগ্য নিয়ে কি সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়?

পরন্তু কন্যা-সন্তান অপছন্দ করা জাহেলী যুগের আচরণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট।[৩৩৬]

প্রশ্ন-৫১. কোনো লম্পট যদি শালী বা শাশুড়ির সাথে অথবা পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে বিবাহিত স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?

উত্তর : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো মাহরামের সাথে ব্যভিচার করা সবচেয়ে বড় ব্যভিচার। কিন্তু কোনো অবৈধ সম্পর্ক বৈধ সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারে না। অবৈধভাবে মিলন ঘটালেই সে তার স্ত্রী হয়ে যায় না এবং তার মা বা মেয়ে স্ত্রীর বন্ধন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায় না।

মহান আল্লাহ কাকে কাকে বিবাহ হারাম, সে কথা বলার পর বলেছেন,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

---

[৩৩৬] সূরা নাহল : ৫৮-৫৯।

"উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়।"[৩৩৭]

সেখানে বৈধ মিলনের ফলে অনেক মহিলা হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অবৈধ মিলন ব্যভিচারের ফলে কেউ হারাম হবে কিনা সে কথা বলেননি। সুতরাং বুঝা যায় যে, উক্ত মহিলাগণ ছাড়া অন্য কেউ হারাম নয়। হাদিসে কিছু মহিলার হারাম হওয়ার কথা বলা হলেও ব্যভিচারের ফলে হারাম হওয়ার কথা বলা হয়নি। অথচ জাহেলি যুগে ব্যভিচারের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। সুতরাং বুঝা যায় যে, কোনো অপবিত্র সম্পর্ক কোনো পবিত্র সম্পর্কের বন্ধনকে ধ্বংস করতে পারে না।

প্রশ্ন-৫২. একজন স্বামী তার স্ত্রীকে 'মা' বলে 'যিহার' করেছে। অতঃপর তাকে তালাক দিয়েছে। তাকে কি যিহারের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে?

উত্তর : তালাক দেওয়ার পর যিহারের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। যেহেতু সে আর স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে , তাহলে (এর প্রায়শ্চিত্ত) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তিদান। এর দ্বারা তোমাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।"[৩৩৮]

প্রশ্ন-৫৩. কোনো হতভাগা স্বামী স্ত্রীকে 'তুই আমার মা বা মায়ের মতো' বললে 'যিহার' হয়। কিন্তু কোনো হতভাগী স্ত্রী যদি স্বামীকে 'তুমি আমার বাপ বা বাপের মতো' বলে, তাহলে তার বিধান কী?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে 'যিহার' হবে না। কেবল মহিলাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৪. যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে বলে, 'আমি তোমার নিকট থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাচ্ছি' তাহলে কি তাকে স্ত্রীরূপে রাখা যাবে?

উত্তর : স্ত্রী নিজ স্বামী থেকে আল্লাহর পানাহ চাইলে আল্লাহর নামের তা'যীম করে তাকে তা দেওয়া ওয়াজিব। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কেউ

---

[৩৩৭] সূরা নিসা : ২৪।
[৩৩৮] সূরা মুজাদালাহ্ : ৩।

আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে আল্লাহর নামে প্রার্থনা করবে, তাকে দান কর।"[৩৩৯] তাঁর এক স্ত্রী তাঁর নিকট থেকে আল্লাহর পানাহ চাইলে তিনি বলেছিলেন, "তুমি বিশাল সত্তার পানাহ চেয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের বাড়ি চলে যাও। (অর্থাৎ তাকে তালাক দিয়ে দাও)"[৩৪০]

প্রশ্ন-৫৫. স্বামীর কাছ থেকে কখন তালাক নেওয়া বৈধ এবং কখন ওয়াজিব?

উত্তর : যখন স্বামী এমন কাজ করবে, যা কাবীরা গোনাহ এবং তা কুফরী নয়, বুঝানোর পরও মানতে চাইবে না, তখন তালাক নেওয়া বৈধ। যেমন ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি। কিন্তু যে কাজ করার ফলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, তার সাথে সংসার করা বৈধ নয়। তাওবা না করলে সে ক্ষেত্রে তালাক নেওয়া ওয়াজিব। যেমন মাযারে যাওয়া, শিরক করা, দ্বীন, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল ﷺ-কে গালি দেওয়া, নামায ত্যাগ করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৫৬. তালাক স্বামীর হাতে দেওয়া হলো কেন? স্ত্রী তালাক নিতে পারে, দিতে পারে না কেন?

উত্তর : যেহেতু পুরুষ মহিলার তুলনায় জ্ঞানে পাকা, ক্রোধের সময় বেশি ধৈর্যশীল। নচেৎ স্ত্রীর হাতেও তালাক থাকলে সামান্য ঝামেলাতেই সে 'তোমাকে তালাক' বলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকত। যেমন অনেক মহিলা সামান্য কিছু হলেই রেগে বলে বসে, 'আমাকে তালাক দাও, আমি তোমার ভাত খাব না' ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৫৭. কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে বলে, 'তুমি অমুকের বাড়ি গেলে তোমাকে তালাক।' অতঃপর স্ত্রী তা অমান্য করে অমুকের বাড়ি চলে গেলে তালাক হয়ে যাবে কি?

উত্তর : তালাক নির্ভর করছে স্বামীর নিয়তের উপর। স্বামীর উদ্দেশ্য যদি সত্যই তালাক দেওয়ার থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। তালাকের নিয়ত না থাকলে এবং স্ত্রী যাতে অমুকের বাড়ি না যায়, সে ব্যাপারে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে তালাক হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৮. আমি স্ত্রীকে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার দুলাভাইয়ের বাড়ি গেলে তোমাকে তালাক।' অতঃপর সে আমার কথা মানেনি, সে তার দুলাভাইয়ের বাড়ি গেছে। এখন কি তালাক হয়ে যাবে? এখন আমার করণীয় কী ?

উত্তর : অবাধ্য বউকে বাধ্য করার জন্য তালাকের হুমকি দেওয়া যায়, কিন্তু তাকে জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার সংকল্প না থাকলে তালাক দিয়ে

---

[৩৩৯] আবু দাউদ, নাসাঈ।
[৩৪০] বুখারী ৫২৫৪ নং।

ফেলতে হয় না। তবুও নিয়ত যদি জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার এবং তালাক দেওয়ার থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। ইদ্দতের মধ্যে তাকে যথানিয়মে ফিরিয়ে নিতে হবে। পক্ষান্তরে তাকে কেবল শক্তভাবে বাধা দেওয়ার নিয়ত থাকলে এবং তালাকের নিয়ত আদৌ না থাকলে তালাক হবে না; বরং তার বিধান হবে কসমের। সে ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৯. আমি মায়ের বাড়িতে ছিলাম। স্বামী বলেছিল, 'আজ তুমি বাড়ি না ফিরলে, তোমাকে তালাক।' আমি বাড়ি ফিরতে চাইলাম। কিন্তু আমার ভাই জেদ ধরে আমাকে ফিরতে দিল না। এখন আমার কি তালাক হয়ে গেছে?

উত্তর : যদি আপনার ভাইয়ের আপনাকে জোরপূর্বক আটকে রাখার কথা সত্য হয়, তাহলে তালাক হবে না। পরন্তু স্বামীর মনে তালাকের নিয়ত না থাকলে এবং কেবল তাকীদ উদ্দেশ্য হলে তাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৬০. স্বামী ছয় মাস স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক না রাখলে আপনাআপনি তালাক হয়ে যায় কি?

উত্তর : শরীআতে আপনা-আপনি তালাক নামে কোনো তালাক নেই। তালাক দিতে হয়, না হয় নিতে হয় উভয় পক্ষ সম্মত থাকলে ছয় মাস কেন ছয় বছরেও দূরে থাকতে পারে। অবশ্য স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে, সে কথা ভিন্ন। নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পূর্ণ চার বছর অপেক্ষা করার পর আরো চার মাস দশদিন স্বামী- মৃত্যুর ইদ্দত পালন করে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। 'লিআন' হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আপনাআপনি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। তদনুরূপ বিবাহ অবৈধ প্রমাণিত হলে, স্বামী-স্ত্রীর একজন মুরতাদ হয়ে গেলে সাথে সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রশ্ন-৬১. স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বলে কি প্রথম স্ত্রীর তালাক চাওয়া বৈধ; যদিও বৈধভাবে শরীআতসম্মত বিবাহ হয়?

উত্তর : শরীআতের শর্ত মেনে দু'জনকেই সুখে রাখতে পারলে প্রথমার তালাক চাওয়া বৈধ নয়। যেমন দ্বিতীয়ার জন্যও বৈধ নয় প্রথমাকে তালাক দিতে স্বামীকে চাপ দেওয়া।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইবে, সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে।"[৩৪১]

তিনি আরো বলেন, "খোলা তালাক প্রার্থিনী এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারিণীরা মুনাফিক মেয়ে।"[৩৪২]

---

[৩৪১]আবু দাউদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫ নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬ নং

নবী করীম ﷺ বলেন, "কোনো মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে, তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)"[৩৪৩]

প্রশ্ন-৬২. স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। কিন্তু কোন্ সময়ে মাসিক থাকলেও তালাক দেওয়া যায়?

উত্তর : তিন সময় মাসিক থাকলেও তালাক দেওয়া যায়। (১) তার সাথে মিলন না হয়ে থাকলে। (২) গর্ভাবস্থায় মাসিক অব্যাহত থাকলে। (৩) খোলা তালাক হলে।

প্রশ্ন-৬৩. স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনরায় ফিরে পেতে চাইলে করণীয় কী?

উত্তর : একই সঙ্গে তিন বা ততোধিক বার অথবা একবার তালাক দিলে তা এক তালাক রজয়ী হয়। তাকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। তারপরও তাকে পেতে চাইলে নতুনভাবে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু নিয়মিত তিন তালাক দেওয়ার পর সে সুযোগ আর থাকে না। অবশ্য সে মহিলার অন্যত্র বিবাহ হলে, অতঃপর সে স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে অথবা মারা গেলে ইদ্দতের পর আগের স্বামী তাকে পুনঃবিবাহ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

"অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে, তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে, তাহলে তাদের (পনর্বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য-জীবনে) ফিরে আসায় কোনো দোষ নেই। এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।[৩৪৪]

---

[৩৪২] আবু দাঊদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫ নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬।

[৩৪৩] বুখারী, মুসলিম।

[৩৪৪] বাক্বারাহ ঃ ২৩০।

জ্ঞাতব্য যে, এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে 'হালালা বিবাহ' দিয়ে স্ত্রী হালাল করা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে স্ত্রী হালাল হয় না।

সতর্কতার বিষয় যেমন, তালাকের বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে এক রকম নয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে স্থানীয় কাযীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৬৪. রেজয়ী তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় স্ত্রী যদি ফিরতে না চায়, তাহলেও কি সে স্ত্রী থাকবে?

উত্তর : রেজয়ী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে দু'জনকে সাক্ষী রেখে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে সে স্ত্রী থাকবে, যদিও সে ফিরতে রাজি না হয়। তালাকের পর এমন স্বামীর সাথে স্ত্রী সংসার করতে না চাইলে খোলা তালাক নিতে পারে।

প্রশ্ন-৬৫. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে তাদের সন্তান কার কাছে থাকবে?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তার সন্তানের বেশি হকদার।"[৩৪৫] অবশ্য মায়ের মধ্যে কোনো প্রতিকূল গুণ থাকলে আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে পিতা সন্তানের অধিকার পাবে। যেমন মায়ের হাতে সন্তান থাকলে খারাপ হয়ে যাবে, এই আশঙ্কা থাকলে সে সন্তানের অধিকার হারাবে। পরন্তু সন্তান যদি জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। সে যাকে বেছে নেবে, সেই তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পাবে।[৩৪৬]

প্রশ্ন-৬৬. তালাক ও শোক পালনের ইদ্দত কখন থেকে শুরু হবে? খবর জানার পর থেকে, নাকি তালাক ও মরণের দিন থেকে?

উত্তর : তালাক ও শোক পালনের ইদ্দত খবর জানার পর থেকে নয়, বরং তালাক ও মরণের দিন থেকে গণ্য হবে। সুতরাং যদি কোনো মহিলা তিন মাসিকের পর খবর পায় যে, তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, তাহলে নতুন করে সে আর ইদ্দত পালন করবে না। অনুরূপ যদি কোনো মহিলা ৪ মাস ১০ দিন পর জানতে পারে যে, তার স্বামী মারা গেছে, তাহলে তাকে আর ইদ্দত পালন করতে হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, তালাকের ইদ্দত অন্য মহিলাদের জন্য ভিন্ন রকম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

---

[৩৪৫] দারাকুত্বনী ৪১৮ সিসঃ ৩৬৮।
[৩৪৬] তিরমিযী ১৩৫৭, ইবনে মাজাহ ২৩৫১নং।

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।[৩৪৭] যেমন শোকপালনের ইদ্দতও গর্ভকাল পর্যন্ত।

প্রশ্ন-৬৭. স্বামী মারা গেলে মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে? স্বামীর বাড়ি না স্ত্রীর পিতার বাড়ি?

উত্তর : যে গৃহে থেকে স্বামী মারার খবর পাবে, সেই গৃহ তার জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক হলে সেখানে ৪ মাস ১০ দিন অথবা গর্ভকাল ইদ্দত পালন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফুরাইআহকে বলেছিলেন,

امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي اَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ

"তুমি সেই গৃহে অবস্থান করো যে গৃহে তোমার কাছে তোমার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ এসেছে।[৩৪৮]

সুতরাং যদি সেই সময় স্ত্রী মায়ের বাড়িতে থাকে এবং শ্বশুরবাড়ি অপেক্ষা সেই বাড়ি সুবিধাজনক ও নিরাপদ হয়, তাহলে সেখানেই ইদ্দত পালন করতে হবে। মেয়ের বাড়িতে থাকলেও তাই। নচেৎ স্বামী-গৃহে ফিরে যেতে হবে। পক্ষান্তরে স্বামী-গৃহে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা গেলে এবং সেখানে তাকে দেখাশোনা করার মতো কোনো মাহরাম পুরুষ বা তেমন কেউ না থাকলে, সেখানে বসবাস করা তার জন্য অসুবিধাজনক বা ক্ষতিকর হলে মায়ের বাড়িতে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে পারে।

প্রশ্ন-৬৮. কোনো পড়ুয়া ছাত্রীর বা চাকুজিবী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে সে কীভাবে ইদ্দত পালন করবে? তার কি বিদ্যালয়ে বা চাকুরিস্থলে যাওয়া বৈধ হবে?

উত্তর : অন্য মহিলাদের মতো তার জন্যও স্বগৃহে ইদ্দত পালন করা এবং তাতে সকল প্রকার সৌন্দর্য ও সুগন্ধি বর্জন করা জরুরি। অবশ্য নিজের একান্ত প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে। সুতরাং দিনের বেলায় সে বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস করে আসতে পারে।

---

[৩৪৭] সূরা ত্বালাক্ব-৪।

[৩৪৮] আহমাদ ৬/৩৭০, ইবনে মাজাহ ২০৩১ নং, হাকেম ২/২২৬, ত্ববারানীর কাবীর ১০৮৪ নং, বাইহাক্বী ৭/৪৩৪।

প্রশ্ন-৬৯. স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামী হঠাৎ মারা যায় ঐ স্ত্রীকে কি ইদ্দত পালন করতে হবে? ঐ স্ত্রী কি তার ওয়ারেস হবে?

উত্তর : যে তালাকে স্ত্রী প্রত্যয়নযোগ্যা থাকে সেই (এক তালাক তথা রেজয়ী) তালাক পাওয়া অবস্থায় স্ত্রীকে শোকপালনের ইদ্দত পালন করতে হবে এবং স্বামীর ওয়ারেসও হবে। পক্ষান্তরে বায়েন বা খোলা তালাক পাওয়ার ইদ্দতে থাকলে স্ত্রীকে শোকপালনের ইদ্দত পালন করতে হবে না এবং সে স্বামীর ওয়ারেসও হবে না।

প্রশ্ন-৭০. বিবাহের পর স্বামীর সাথে বাসর বা মিলন হওয়ার আগেই যদি স্বামী মারা যায়, তাহলেও কি ইদ্দত পালন করতে হবে? ঐ স্ত্রী কি তার ওয়ারেস হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।"[৩৪৯]

এখানে মহান আল্লাহ আমভাবে সকল স্ত্রীর প্রতিই এই নির্দেশ দিয়েছেন।

আর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জয়েয নয়। তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।"[৩৫০]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমভাবে সকল স্ত্রীর প্রতিই একই নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ মীরাসের আয়াতেও আম নির্দেশ আছে। সুতরাং সে স্বামীর (এক চতুর্থাংশ সম্পত্তির) ওয়ারেস হবে; যদি অন্য কোনো বাধা না থাকে।

প্রশ্ন-৭১. গর্ভস্থ ভ্রূণ যদি গর্ভচ্যুত হয়, তাহলে কি গর্ভবতীর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে?

উত্তর : ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হলেই গর্ভবতীর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।"[৩৫১]

---

[৩৪৯] সূরা বাক্বারা : ২৩৪।
[৩৫০] বুখারী ও মুসলিম।
[৩৫১] সূরা ত্বালাক্ব : ৪।

প্রশ্ন-৭২. ইদ্দত যদি মহিলার গর্ভে সন্তান আছে কি না, তা দেখার জন্য হয়, তাহলে স্বামী ছেড়ে এক-দেড় বছর মায়ের বাড়িতে থাকার পর যে মহিলাকে স্বামী তালাক দেয়, তাকেও কি অতিরিক্ত তিন মাসিক অথবা মাসিক না হলে তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে?

উত্তর : আসলে ইদ্দত শুরু হবে তালাকের পর থেকে। ইতঃপূর্বে সে স্বামীর সাথে বহু দিন যাবৎ মিলন না করে থাকলেও বিধান এটাই যে, তালাক হওয়ার পর নির্ধারিত ইদ্দত পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

"তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন ঋতুস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।)[৩৫২]

প্রশ্ন-৭৩. স্বামী মারা গেলে এবং গর্ভে দুই মাসের বাচ্চা থাকলে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে, নাকি প্রসব হওয়া পর্যন্ত আরো প্রায় ৭ মাস ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর : গর্ভবতীর ইদ্দত শেষ হবে প্রসবের পর; যদিও তা তুলনামূলক লম্বা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।[৩৫৩]

একই কারণে গর্ভের শেষের দিকে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত মাত্র কয়েক ঘণ্টা হতে পারে।

প্রশ্ন-৭৪. যে মহিলা স্বামী মরার ইদ্দতে আছে, সে মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যায় কি না?

উত্তর : ইদ্দতে থাকা বিধবাকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য আভাসে ইঙ্গিতে বিয়ের কথা জানানোতে দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

---

[৩৫২] সূরা বাক্বারা : ২২৮।
[৩৫৩] সূরা ত্বালাক্ব : ৪।

حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

"আর তোমরা যদি আভাসে ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের কাছে কোনো অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু।"[৩৫৪]

প্রশ্ন-৭৫. ইদ্দত পালনের সময়কাল কি পিছিয়ে দেওয়া যায়?

উত্তর : মোটেই না। মৃত্যুর পর থেকেই সে সময় শুরু হয়।

প্রশ্ন-৭৬. ইদ্দত পালনের সময়ে কি ঘড়ি পরা যায়?

উত্তর : কেবল সময় দেখার উদ্দেশ্যে পরা যায়। জরুরি না হলে না পরাই উত্তম। যেহেতু তা অলংকারের মতো।

প্রশ্ন-৭৭. বিদেশে থাকা অবস্থায় বিধবা হলে মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর : যে ঘরে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা গেছে, সে ঘরেই ইদ্দত পালন করতে হবে। অবশ্য সেখানে যদি দেখাশোনা করার কেউ না থাকে, তাহলে শ্বশুরবাড়ি অথবা মায়ের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে পারবে।

প্রশ্ন-৭৮. স্বামী মরার সময় স্ত্রী মায়ের বাড়িতে ছিল। সে কোথায় ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর : নিজের স্বামীগৃহে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করবে।

প্রশ্ন-৭৯. কোনো স্ত্রীর স্বামী নিখোঁজ হলে করণীয় কী?

উত্তর : কোনো মহিলার স্বামী নিখোঁজ হলে নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পূর্ণ চার বছর অপেক্ষা করার পর আরো চার মাস দশদিন স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দত পালন করে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার বিবাহ হারাম।

বিবাহের পর তার পূর্বস্বামী ফিরে এলে তার এখতিয়ার হবে; স্ত্রী ফেরৎ নিতে পারে অথবা মোহর ফেরৎ নিয়ে তাকে ঐ স্বামীর জন্য ত্যাগ করতেও

---

[৩৫৪] সূরা বাক্বারাহ : ২৩৫।

পারে। স্ত্রী চাইলে আর নতুনভাবে বিবাহ আকদের প্রয়োজন নেই। কারণ, স্ত্রী তারই এবং দ্বিতীয় আকদ তার ফিরে আসার পর বাতিল। তবে তাকে ফিরে নেওয়ার পূর্বে ঐ স্ত্রী (এক মাসিক) ইদ্দত পালন করবে। গর্ভবতী হলে প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর সে সময়ে দ্বিতীয় স্বামী থেকে পর্দা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৮০. এক মহিলার দুধ-সন্তান ছাড়া আর কেউ নেই। সে মারা গেলে ঐ সন্তান কি তার ওয়ারেস হবে?

উত্তর : না। কারণ দুধ পান করলে দুধের আত্মীয়তা কায়েম হয় ঠিকই, কিন্তু মীরাসের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। সুতরাং সেই মহিলার সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা হবে।

প্রশ্ন-৮১. আমি বৃদ্ধ মানুষ। আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর জমি-সম্পত্তি নিয়ে ছেলেরা ঝগড়া-ঝামেলা করবে। সুতরাং আমি কি এখন আমার স্থাবর-অস্থাবর সকল অর্থ-সম্পত্তি মীরাসের ভাগবণ্টন অনুযায়ী প্রত্যেকের নামে লিখে দিতে পারি?

উত্তর : আপনার এ কাজ ঠিক হবে না। কারণ আপনি জানেন না যে, কে কখন মারা যাবে। হতে পারে আপনার কোনো ওয়ারেসেরই আপনি ওয়ারেস হবেন। সুতরাং আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলে-মেয়েরা শরয়ী মীরাস অনুযায়ী বিলি-বণ্টন করে নেবে। তারা ঝগড়া করলে আপনার দোষ হবে না। আপনি তাদেরকে ঝগড়া না করতে অসিয়ত করুন। কারো নামে কিছু লিখে না দিয়ে সব নিজের নামেই রাখুন।

প্রশ্ন-৮২. আমার তিনটি মেয়ে, কোনো ছেলে নেই। শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর আমার মেয়েরা দুইয়ের-তিন ভাগ সম্পত্তি পাবে এবং বাকি অংশ পাবে আমার ভাই। অথচ সে আমার ভাই হলেও, সে আমার দুশমন। আমি চাই না, সে আমার কোনো সম্পত্তি পাক। এখন কি আমি আমার সব সম্পত্তি আমার মেয়েদের নামে লিখে দিতে পারি?

উত্তর : আপনার সম্পত্তি কে পাবে, আর কে পাবে না, তাতে আপনার ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। সে ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর। তাঁর বিধানে যে যা পাবে, তাতে বাদ সাধবার অধিকার আপনার নেই। মহান আল্লাহ মীরাসের ভাগ-বণ্টনে বিধান দেওয়ার পর বলেছেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

"এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দান করবেন; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[৩৫৫]

সুতরাং আপনার ভাই আপনার দুশমন হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় সে আপনার সম্পত্তির ভাগ পাবে। অবশ্য সে যদি কাফের বা মুশরিক হয়, তাহলে সে আল্লাহর বিধানে মুসলিমের নিকট থেকে কোনো অংশ পাবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যৌন-জীবন

প্রশ্ন-১. রুমে কেবল স্বামী-স্ত্রী থাকলে শরীরে কোনো কাপড় না রেখে কি ঘুমানো যায়?

উত্তর : লজ্জাস্থান অপ্রয়োজনে খুলে রাখা বৈধ নয়। পর্দার ভেতরে প্রয়োজনে তা খোলা দোষ নেই যেমন মিলনের সময়, গোসলের সময় বা প্রস্রাব-পায়খানা করার সময়। অপ্রয়োজনে লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ওয়াজিব। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের কাছে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ লোকেরা পরস্পর এক জায়গায় থাকলে? তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে? তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশি হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।"[৩৫৬]

এখানে "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের কাছে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর" এর মানে এই নয় যে, স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর কাছে সর্বদা নগ্ন থাকা যাবে। উদ্দেশ্য হলো, তাদের সাথে মিলনের সময় অথবা অন্য প্রয়োজনে লজ্জাস্থান খোলা যাবে, অপ্রয়োজনে নয়। তাছাড়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘুমালে আকস্মিক বিপদের সময় বড় সমস্যায় পড়তে হবে। সুতরাং সর্তকতাই বাঞ্ছনীয়।

---

[৩৫৫] সূরা নিসা : ১৩-১৪।
[৩৫৬] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭ নং।

প্রশ্ন-২. স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের গোপন অঙ্গ দেখতে পারে কি?

উত্তর : শরীআতে তাতে কোনো বাধা নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের সর্বাঙ্গ নগ্নাবস্থায় দেখতে পারে। এতে স্বাস্থ্যগত কোনো ক্ষতিও নেই।

'স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের লজ্জাস্থান দেখতে নেই, বা হযরত আয়েশা রা. কখনও স্বামীর গুপ্তাঙ্গ দেখেননি, উলঙ্গ হয়ে গাধার মতো সহবাস করো না, বা উলঙ্গ হয়ে সহবাস করলে সন্তান অন্ধ হয়। সঙ্গমের সময় কথা বললে সন্তান তোতলা হয়, এ বর্ণনাগুলো একটিও সহীহ্ ও শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন-৩. শুনেছি, সহবাসের সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে নেই, রুম অন্ধকার রাখতে হয়, একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে নেই ইত্যাদি, তা কি ঠিক?

উত্তর : এ হলো লজ্জাশীলতার পরিচয়। পরন্তু শরীআতে তা হারাম নয়। রুম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে আর পর্দার প্রয়োজন নেই। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের লেবাস। উভয়ে উভয়ের সব কিছু দেখতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"(সফল মু'মিন তারা) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"[৩৫৭]

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ লোকেরা পরস্পর এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়। সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশি হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।"[৩৫৮] সুতরাং রুম অন্ধকার না করলে এবং উভয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হলে কোনো দোষ নেই।

---

[৩৫৭] সূরা মু'মিনুনঃ ৫-৭, এবং মাআরিজ ঃ ২৯-৩১।

[৩৫৮] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭ নং।

প্রশ্ন-৪. কোন্ কোন্ সময়ে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ? শুনেছি, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে সহবাস করতে হয় না, এ কথা কি ঠিক?

উত্তর : দিবারাত্রে স্বামী-স্ত্রীর যখন সুযোগ হয়, তখনই সহবাস বৈধ। তবে শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত কয়েকটি নিষিদ্ধ সময় আছে যাতে স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ নয়।

১. স্ত্রীর মাসিক অথবা প্রসবোত্তর অপবিত্র অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"লোকে রক্তঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।"[৩৫৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোনো স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোনো গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এসব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।)[৩৬০]

২. রমযানে দিনের বেলায় রোযা অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

"রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।"[৩৬১]

আর বিদিত যে, রমযানের রোযা অবস্থায় সঙ্গম করলে যথারীতি তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার কাফ্ফারা আছে। একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে, নচেৎ অক্ষম হলে ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।

---

[৩৫৯] সূরা বাক্বারাহ : ২২২।
[৩৬০] আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং।
[৩৬১] সূরা বাক্বারাহ : ১৮৭।

৩. হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"সুবিদিত মাসে (যথাঃ শওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোনো প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে।"[৩৬২]

এ ছাড়া অন্য সময়ে দিবারাত্রির যেকোনো অংশে সহবাস বৈধ।

প্রশ্ন-৫. হাদীসে এসেছে, "যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন দু'আ পড়ে, তাহলে তাদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।"[৩৬৩] বাহ্যত এ নির্দেশ স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, স্ত্রীর জন্যও কি ঐ দু'আ পড়া বিধেয়?

উত্তর : আসলে সহবাসের দু'আ স্বামীর জন্যই বিধেয়। স্ত্রী পড়লেও দোষ নেই। যেহেতু যে কাজ উভয়ের, সে কাজের নির্দেশ পুরুষকে দেওয়া হলেও মহিলাও শামিল হয়।

প্রশ্ন-৬. সহবাসের আগে দু'আ পড়লে শয়তান ক্ষতি করতে পারে না। ক্ষতি না করতে পারার অর্থ কী ?

উত্তর : এর অর্থ এই যে,

(ক) 'বিসমিল্লাহ'র বরকতে সেই সন্তান নেক হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ শয়তানকে বলেছেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ.

"আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোনো আধিপত্য থাকবে না।"[৩৬৪]

(খ) সন্তানের স্বাস্থ্যগত কোনো ক্ষতি হয় না।

(গ) সন্তান শিরক ও কুফরী মুক্ত হয়।

(ঘ) কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়।

(ঙ) ঐ সহবাসে শয়তান শরিক হতে পারে না।

---

[৩৬২] সূরা বাক্বারা : ১৯৭।
[৩৬৩] বুখারী- মুসলিম।
[৩৬৪] সূরা হিজর : ৪২।

প্রশ্ন-৭. আমি বিবাহিত। আমার সন্তান হয় না। টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেব ইচ্ছা করেছি। আমি চাই আমাদের সন্তানকে যেন শয়তান ক্ষতিগ্রস্ত না করে। কিন্তু তার জন্য পঠিতব্য দু'আটি কখন পড়ব?

উত্তর : যখন টিউবে রাখার জন্য বীর্য দেবেন, তখন বীর্যপাতের আগে প্রস্তুতির সময় দু'আটি পড়ে নেবেন।

প্রশ্ন-৮. স্ত্রী গর্ভাবস্থায় থাকার সময়ও কি সহবাসের দু'আ পড়তে হবে?

উত্তর : সহবাসের সময় দুআ পড়ায় দু'টি লাভ আছে। শয়তানের শরীক হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং শয়তানের ক্ষতি থেকে ঐ মিলনে সৃষ্ট সন্তানকে রক্ষা করা। সুতরাং যখন আমরা জানি যে, সন্তান আগের মিলনে এসে গেছে, অথবা সন্তান হবে না, অথবা সন্তান চাই না, তখনও যদি আমরা দু'আ পড়ি তাহলে তাতে আমরা নিজেদেরকে আমাদের যৌনানন্দে শয়তানের শরিক হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব। বলা বহুল্য, সহবাসের দু'আ সর্বাবস্থায় পঠনীয়। যেহেতু হাদীসের নির্দেশ ব্যাপক।

প্রশ্ন-৯. সহবাসের সময় হাঁচি হলে নির্দিষ্ট যিক্‌র পড়া যাবে কি?

উত্তর : এই সময় মুখে যিক্‌র পড়া যাবে না। মনে মনে পড়লে দোষ নেই। যেহেতু পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় নবী করীম ﷺ সালামের জবাব দেননি।[৩৬৫]

প্রশ্ন-১০. শরীআতে সমমৈথুন প্রসঙ্গে বিধান কী?

উত্তর : সমমৈথুন : পুরুষ-সঙ্গম বা পুরুষে পুরুষে পায়ুপথে কুকর্ম করাকে বলে। আর এরই অনুরূপ স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করাও। এটা সেই কুকর্ম, যা লূত এর সম্প্রদায় করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ.

"মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই উপগত হও।[৩৬৬]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

"তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ত্যাগ করে পুরুষদের কাছে গমন কর![৩৬৭]

---

[৩৬৫] মুসলিম ৩৭০নং।
[৩৬৬] সূরা শুআরা ১৬৫।
[৩৬৭] সূরা আ'রাফ ৮১।

আল্লাহ তাদেরকে এই কুকাজের শাস্তিস্বরূপ তাদের ঘর-বাড়ি উল্টে দিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন পাথর। তিনি বলেন,

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

"(অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো) তখন আমি (তাদের নগরগুলোর) ঊর্ধ্বভাগকে নিম্নভাগে পরিণত করেছিলাম এবং আমি তাদের উপর ক্রমাগত কঙ্কর বর্ষণ করেছিলাম।"[৩৬৮]

সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ের মতো কুকর্মে যে লিপ্ত হবে সেও উপযুক্ত শাস্তির উপযুক্ত। তাই এমন দুরাচার প্রসঙ্গে কিছু সাহাবী এর ফতোয়া হল, তাকে জ্বালিয়ে মারা হবে। কেউ কেউ বলেন, উঁচু জায়গা হতে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে। এ বিষয়ে একাধিক হাদীসও নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে; এক হাদিসে তিনি বলেছেন, "যাকে লূত সম্প্রদায়ের মতো কুকর্মে লিপ্ত পাবে, তাকে এবং যার সাথে এ কাজ করা হচ্ছে, তাকেও তোমরা হত্যা করে ফেল।"[৩৬৯]

প্রশ্ন-১১. গুপ্ত অভ্যাস ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর : গুপ্ত অভ্যাস (হাত বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বীর্যপাত, স্বমৈথুন বা হস্ত মৈথুন) করা কিতাব, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেকের নির্দেশ মতে হারাম।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে হলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।"[৩৭০]

সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী[৩৭১] ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কামলালসা চরিতার্থ করতে চায়, সে ব্যক্তি "এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে।" বলা বাহুল্য, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সীমালঙ্ঘনকারী বলে বিবেচিত হবে।

---

[৩৬৮] সূরা হিজর ৭৪।

[৩৬৯] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৫৭৫নং।

[৩৭০] সূরা মু'মিনূন ৫-৭।

সুন্নাহ থেকে দলিল, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্ত্রী সঙ্গম ও বিবাহ-খরচে সমর্থ, সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা অধিক দৃষ্টি-সংযতকারী এবং অধিক যৌনাঙ্গ রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি এতে অসমর্থ, সে যেন রোযা অবলম্বন করে, যেহেতু তা এর জন্য (খাসী করার মতো) কামদমনকারীর সমান।"[৩৭২]

সুতরাং নবী করীম ﷺ বিবাহে সমর্থ ব্যক্তিকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন, অথচ যদি হস্তমৈথুন বৈধ হতো, তবে নিশ্চয় তিনি তা করতে নির্দেশ দিতেন। অতএব তা সহজ হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি তা করতে নির্দেশ দিলেন না, তখন জানা গেল যে, তা বৈধ নয়।

আর সুচিন্তিত মত এই যে, যেহেতু এই কাজে বহুমুখী ক্ষতি ও অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে, যা চিকিৎসাবিদগণ উল্লেখ করে থাকেন; এতে এমন ক্ষতি রয়েছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় বিপজ্জনক; এ কাজ যৌনশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে, চিন্তাশক্তি ও দূরদর্শিতার ক্ষতি সাধন করে এবং কখনোবা এর অভ্যাসী ব্যক্তিকে প্রকৃত দাম্পত্য সুখ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ যে কেউ এ ধরনের অভ্যাসে নিজ কাম-লালসাকে চরিতার্থ করে থাকে, সে হয়তো বা বিবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবেন না।

প্রশ্ন-১২. লিঙ্গ স্পর্শ না করে স্ত্রী সহবাসের কথা কল্পনা করে বীর্যপাত করা কি বৈধ?

উত্তর : না এ কাজ বৈধ নয়। কারণ তা ব্যভিচারের আকর্ষণ করতে পারে। যুবকের উচিত বিবাহের আগে অথবা স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়ার আগে পর্যন্ত সুচিন্তা করা। কুচিন্তা এসে গেলে সে কুচিন্তা পরিহার করবে।

প্রশ্ন-১৩. স্ত্রীর যোনিপথ সংকীর্ণ ও সঙ্গম অযোগ্য হলে স্বামী তার পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে পারে কী?

উত্তর : স্ত্রীর যোনিপথ সংকীর্ণ ও সঙ্গম অযোগ্য হলে স্বামী তার পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে পারে না। যেহেতু সঙ্গমযোগ্য যোনি না থাকলে সেই স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিতে পারে। কারণ, পায়ুপথ সঙ্গমস্থল নয়। যদি এমনটি না হতো তাহলে তাকে তালাক দেওয়াও বৈধ হতো না।

প্রশ্ন-১৪. মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে ধারণা করে স্বামী-সহবাস করার পর পুনরায় রক্ত দেখা গেলে গোনাহ্ হবে কি? অতঃপর করণীয় কী?

উত্তর : প্রবল ধারণায় যখন বুঝা যাবে যে, মহিলা পবিত্র হয়ে গেছে, তখন তাকে গোসল করে নামায-রোযা করতে হবে। কিন্তু নামায-রোযা শুরু করার পর

---

[৩৭১] অধিকারভুক্ত দাসী বলে ক্রীতদাসী ও কাফের যুদ্ধবন্দিনীকে বুঝানো হয়েছে। এখানে কাজের মেয়ে, দাসী, খাদেমা বা চাকরানী উদ্দেশ্য নয়।

[৩৭২] বুখারী, মুসলিম।

অথবা স্বামী-সঙ্গমের পর যদি পুনরায় রক্ত দেখে তাহলে গোনাহ হবে না। যেহেতু স্রাব থাকা অবস্থায় মাসিক জেনে সঙ্গম করলে গোনাহ হবে। অবশ্য যদি সেই স্রাব অভ্যাসগত প্রিয়ডের ভেতরে হয়, তাহলে তা মাসিকের রক্ত। সুতারাং তারপর পুনরায় নামায-রোযা ও সঙ্গমাদি বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে তা যদি প্রিয়ডের বাইরে হয়, তাহলে তা মাসিকের রক্ত নয়, তাকে ইস্তিহাযার রক্ত বলে। তাতে কোনো দোষ হবে না। তবে মহিলার উচিত, অভ্যাসগত প্রিয়ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত রক্ত বন্ধ দেখে স্বামী-সহবাসে তড়িঘড়ি না করা। উচিত হল, সাদা স্রাব বের হতে শুরু না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরিপূর্ণরূপে রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রিয়ডের গণনার দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। নচেত স্ত্রী জেনেশুনে স্বামীকে বাধা না দিলে তার গোনাহ হবে।

প্রশ্ন-১৫. প্রসবোত্তর স্রাব অথবা ঋতুস্রাব থাকাকালীন সময়ে মিলন হারাম। কিন্তু সেই অবস্থায় স্বামী নিজের কাম-বাসনা চরিতার্থ করতে কী করতে পারে ?

উত্তর : মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"লোকেরা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং যতদিন না তারা পবিত্র হয় (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।[৩৭৩]

কিন্তু 'নিকটবর্তী হয়ো না'র অর্থ হল সঙ্গমের জন্য তাদের কাছে যেয়ো না। অর্থাৎ, যোনিপথে সঙ্গম হারাম। পায়খানাদ্বারেও সঙ্গম হারাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোনো পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোনো স্ত্রীর পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করে।"[৩৭৪]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোনো স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোনো গণকের কাছে

---

[৩৭৩] সূরা বাক্বারা : ২২২।
[৩৭৪] তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং।

উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ, কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এসব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।)[৩৭৫]

তাহলে যৌন-ক্ষুধা মিটাতে এ সময় করা যায় কি? এর উত্তর দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন, "সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।"[৩৭৬]

তা বলে কি মুখ-মৈথুন করা যায়? না, কারণ যে মুখে আল্লাহর যিকর হয়, সে মুখকে এমন কাজে ব্যবহার রুচিবিরুদ্ধ কাজ। অবশ্য উরু-মৈথুন করা যায়। তবে সতর্কতার সাথে, যাতে প্রস্রাব বা পায়খানাদ্বারে সঙ্গম না হয়ে বসে। যদিও মা আয়েশা রা. বলেছেন, 'নবী করীম ﷺ মাসিকের সময় আমাদেরকে যৌনাঙ্গে কাপড় রাখতে বলতেন। অতঃপর শয্যাসঙ্গী হতেন। তবে তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়।'[৩৭৭] তবুও কাপড় না রেখে যদি উরু-মৈথুন করে, তবে তা হারাম নয়।

প্রশ্ন-১৬. নিয়মিত মাসিক হওয়ার পরও অনেক সময় রক্ত দেখা যায়, সে সময় কি সহবাস বৈধ?

উত্তর : নিয়মিত মাসিকের পরে অথবা প্রসবের চল্লিশ দিন পরও যে অতিরিক্ত রক্ত দেখা যায়, তাতে সহবাস বৈধ এবং নামায-রোযা ওয়াজিব। একে ইস্তিহাযার রক্ত বলে। এ রক্ত হায়যের মতো নয়।

প্রশ্ন-১৭. মাসিকাবস্থায় স্বামী আমার নগ্ন দেহ নিয়ে খেলায় মাতলে আমার কী করা উচিত?

উত্তর : মাসিকাবস্থায় স্বামী নিজ স্ত্রীর দেহ নিয়ে খেলায় মেতে উঠলে এবং তার ফলে স্ত্রীরও উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রস্রাব-পায়খানাদ্বার সাবধানে হিফাযত করবে। নচেৎ সঙ্গম ঘটে গেলে সেও গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন-১৮. শুনেছি মাসিক অবস্থায় সহবাস করলে এক দীনার (সোয়া চার গ্রাম পরিমাণ সোনা অথবা তার মূল্য না পারলে এর অর্ধ পরিমাণ অর্থ) সাদাকাহ করে কাফ্ফারা দিতে হবে।[৩৭৮] কিন্তু স্ত্রী যদি সেই সময় মিলনে এমনভাবে উত্তেজিত করে, যাতে স্বামী তা দমন করতে না পেরে মিলন করে ফেলে, তাহলে কাফ্ফরা কাকে দিতে হবে?

উত্তর : কাফ্ফারা দিতে হবে স্ত্রীকে। আর স্বামীকেও দিতে হবে। যেহেতু সে ইচ্ছা করলে নাও করতে পারত। পক্ষান্তরে স্বামী জোরপূর্বক করলে এবং স্ত্রী বাধা দিতে না পারলে তার গোনাহ হবে না এবং তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে না।

---

[৩৭৫] আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২ নং।
[৩৭৬] মুসলিম ৩০২ নং।
[৩৭৭] বুখারী, মুসলিম।
[৩৭৮] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১২২পৃ.।

প্রশ্ন-১৯. মাসিক অবস্থায় সঙ্গম হারাম। কিন্তু স্ত্রী-দেহের অন্যান্য জায়গায় বীর্যপাত করা যায় কিনা?

উত্তর : উত্তম হলো স্ত্রীকে জাঙ্গিয়া পরিয়ে দেহের যেকোনো জায়গায় বীর্যপাত করা। অবশ্য যে নিজের মনোবলে সঙ্গম থেকে বাঁচতে পারবে, তার জাঙ্গিয়া না পরালেও চলবে। পরন্তু স্ত্রীর মুখে বীর্যপাত করা বিকৃত-রুচির মানুষদের ঘৃণ্য আচরণ। আর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম হারাম এবং এক প্রকার কুফরী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"লোকেরা ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা ঋতুঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।[৩৭৯]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

"সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।[৩৮০]

তবে সতর্কতার বিষয় যে, নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে থাকতে থাকতে যেন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে সেই জায়গায় প্রবেশ না হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "পাপ আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি। যে ঐ চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে, সে অদূরে সম্ভবত তার ভেতরে চরতে শুরু করে দেবে।"[৩৮১]

---

[৩৭৯] সূরা বাক্বারাহ : ২২২।
[৩৮০] মুসলিম ৪৫৫ নং।
[৩৮১] বুখারী ও মুসলিম।

প্রশ্ন-২০. হস্তমৈথুন যুবক-যুবতী কারোর জন্যও বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি একে অন্যের হস্ত দ্বারা মৈথুন করে, তাহলেও কি তা অবৈধ হবে?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন মৈথুন অবৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

"(সফল মু'মিন তারা,) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"[৩৮২] সুতরাং অবৈধ হলো নিজের হাতে নিজের বীর্যপাত। স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের হাত দ্বারা বীর্যপাত অবৈধ নয়।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে যৌনাচার করার ব্যাপারে বলছেন, "সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।"[৩৮৩]

প্রশ্ন-২১. সন্তান মায়ের স্তনবৃন্ত চুষে দুগ্ধপান করে। মিলনের পূর্বে স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণ করা কি স্বামীর জন্য বৈধ? পরন্তু অসাবধানতায় যদি পেটে দুধ চলেই যায়, তাহলে কি স্ত্রী মায়ের মতো হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর : স্বামীর জন্য বৈধ, তার স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণ করে উভয়ের যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। সে ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর দুধ তার পেটে চলেই যায়, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি হয় না এবং স্ত্রী "মা' হয়ে যায় না। কারণ দুধ পানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার যেসব শর্ত আছে, তা হলো

১. দুই বছর বয়সের মধ্যে দুধপান করতে হবে। সুতরাং তার পরে বড় অবস্থায় দুধপান করলে হারাম হবে না।

২. পাঁচবার পান করতে হবে। সুতরাং ২/৪ বার পান করলে কোনো প্রভাব পড়ে না। আর বড় অবস্থায় ৫ বারের বেশি পান করলেও কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন-২২. শৃঙ্গারের সময় স্তনবৃন্ত চুষতে গিয়ে স্ত্রীর দুধ যদি স্বামীর পেটে চলে যায়, তাহলে স্ত্রী কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর : রতিক্রীয়ার সময় দুধ যদি স্বামীর পেটে যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মা হয়ে যাবে না। কারণ দুধপান করিয়ে 'মা' হওয়ার দু'টি শর্ত আছে: ১. দুধপান

---

[৩৮২] সূরা মু'মিনুন : ২৯-৩১।
[৩৮৩] মুসলিম ৩০২ নং।

যেন বিভিন্ন সময়ে পাঁচবার হয়।[৩৮৪] সুতরাং পাঁচবারের কম হলে 'মা' প্রতিপন্ন হবে না। ২. দুধপান যেন দুধপান বয়সের ভেতরে হয়। আর তা হলো দুই বছর বয়সের ভিতরে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়।"[৩৮৫]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

"জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে; যদি কেউ দুধপান করার সময় পূর্ণ করতে চায়।"[৩৮৬]

সুতরাং দু'বছর বয়সের পরে দুধপান করলে মা প্রমাণিত হয় না। আর 'মা' প্রমাণিত না হলে স্ত্রী হারাম হবে না।

প্রশ্ন-২৩. সহবাসের সময় আমার স্বামী প্রবল উত্তেজনাবশত এমন অনেক অশ্লীল কথা বলে, যে কথা অন্য সময় বলে না। অনেক সময় সেসব বলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাতে কি তার পাপ হবে?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে যৌনতা করা হয়, সেটাই অন্যের সাথে করা অশ্লীলতা ও অসভ্যতা। সুতরাং পরস্পরের সঙ্গম বৈধ হলে প্রবল উত্তেজনায় পূর্ণ তৃপ্তি গ্রহণ করতে ঐ শ্রেণির কোনো কথা বলা দূষণীয় নয়। তবে তা না বললে যদি চলে, তাহলে ত্যাগ করাই উত্তম।

প্রশ্ন-২৪. সন্তান প্রসবের পর কখন মিলন বৈধ হয়?

উত্তর : সন্তান প্রসবের পর যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন থেকেই মিলন বৈধ। স্রাব অব্যাহত থাকলে ৪০ দিন পর্যন্ত অবৈধ। ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে স্রাব থাকলেও মিলন বৈধ।

---

[৩৮৪] মুসলিম ১৪৫২নং।
[৩৮৫] সূরা লুক্বমান : ১৪।
[৩৮৬] সূরা বাক্বারা : ২৩৩।

প্রশ্ন-২৫. স্বামী যদি কুশ্রী হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামী-সহবাসের সময় কোনো সুশ্রী যুবককে এবং স্ত্রী যদি কুশ্রী হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রী সহবাসের সময় কোনো সুশ্রী যুবতীকে কল্পনায় এনে তৃপ্তি নিতে পারে কি?

উত্তর : এই শ্রেণির কল্পিত পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর সহবাস এক প্রকার ব্যভিচার। সহবাসের সময় স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় অন্য কোনো সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান পুরুষকে কল্পনা করা। বৈধ নয়, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর নাম নিয়ে উভয়ের তৃপ্তি নেওয়া অথবা উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। মনে মনে যাকে ভালোবাসে, তার সাথে মিলন করছে খেয়াল করা। আলেমগণ বলেন, 'যদি কেউ এক গ্লাস পানি মুখে নিয়ে যদি কল্পনা করে যে, সে মদ খাচ্ছে, তাহলে তা পান করা হারাম।'

প্রশ্ন-২৬. একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ওয়াজিব। কিন্তু রাত্রিবাস সমানভাবে প্রত্যেকের সাথে করলেও মিলন সকলের সাথে হয়ে ওঠে না। তাতে কি আমি গোনাহগার হব?

উত্তর : একাধিক স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসাকে যেমন সমানভাবে ভাগ করে বণ্টন করা যায় না, তেমনি আকর্ষণ ও মিলনও সবার সাথে সমান হওয়া জরুরি নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়। কোনো স্ত্রী না চাইলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চাইলে তার হক আদায় করা উচিত এবং সে ক্ষেত্রে সকলের মাঝে সমতা বজায় রাখা কর্তব্য।

প্রশ্ন-২৭. ইফতারীর সময় হয়ে গেলে কিছু না খাওয়ার আগে কি স্বামী-স্ত্রী মিলন করতে পারে?

উত্তর : যদি স্বামী এতই ধৈর্যহারা হয়, তাহলে তা অবৈধ বলা যাবে না। যেহেতু সে সময় তাদের জন্য তা বৈধ। অবশ্য সুন্নত হল খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা। কিন্তু সেই সুন্নত পালনে যদি কেউ অধৈর্য হয়, তাহলে পেটের ক্ষুদা মিটাবার আগে যৌন-ক্ষুধা মিটাবার দরজা উন্মুক্ত আছে। ইবনে উমার রা. কোনো কোনো দিন সহবাস দ্বারা ইফতার করতেন বলে বর্ণিত আছে।[৩৮৭]

প্রশ্ন-২৮. রোযা রেখে মহিলা যদি মহিলা ডাক্তার না পেয়ে পুরুষ ডাক্তারের কাছে এমন রোগ দেখাতে যায়, যাতে ডাক্তার তার লজ্জাস্থানে হাত প্রবেশ করাতে বাধ্য হয়। তাহলে তাতে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর : ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তা করলে তাতে তার রোযা ভাঙ্গবে না; বরং স্বামীও যদি খেলার ছলে নিজ আঙুল প্রবেশ করায়, তবুও তার রোযা ভাঙ্গবে না। যেহেতু তার কোনো দলিল নেই। আর তা সহবাসও নয়।

---

[৩৮৭] ত্ববারানী।

প্রশ্ন-২৯. বৃহস্পতিবার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না বলে নফল রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি আসার পর অধৈর্য হয়ে আমার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়ে যান। এতে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর : নফল রোযা রাখার পর ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেললে কোনো ক্ষতি হয় না। তা কাযা করাও ওয়াজিব নয়। সুতরাং আপনার স্বামীর উক্ত আচরণে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন-৩০. রমযানের কাযা রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু একদিন আমার স্বামী অধৈর্য হয়ে আমার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়ে যান। এতে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর : ফরয রোযা করার সময় তা ভেঙ্গে ফেলা বৈধ নয়। অতএব আপনার স্বামীর উক্ত আচরণ ঠিক নয়। তার উচিত, আল্লাহর কাছে তাওবা করা। অবশ্য কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কারণ, সে কাজ রমযানের বাইরে তাই।

প্রশ্ন-৩১. ক্বিবলার দিকে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা নিষেধ, কিন্তু স্ত্রী সহবাস বৈধ কি?

উত্তর : ক্বিবলামুখী হয়ে স্ত্রী-সহবাস করা অবৈধ হওয়ার কোনো দলিল নেই। যারা স্ত্রী সহবাস করাকে প্রস্রাব-পায়খানা করার মতো মনে করেন, তারা অবশ্য তা বৈধ বলেন। আর যাদের কাছে ঘরের ভেতর ক্বিবলামুখে প্রস্রাব-পায়খানা বৈধ, তাদের কাছে স্ত্রী-সহবাসও বৈধ। সর্বোপরি এটাকে অবৈধ বলা যাবে না।

প্রশ্ন-৩২. সহবাস চলাকালে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

উত্তর : সহবাস চলাকালে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। তা দেখলে কোনো পাপও হয় না এবং চোখেরও কোনো ক্ষতি হয় না। তিনি আমার লজ্জাস্থান দেখেননি এবং আমি তার লজ্জাস্থান দেখিনি' বলে মা আয়েশা রা. এর প্রচলিত উক্তি সহীহ্ নয়।

প্রশ্ন-৩৩. সহবাস চলাকলে কথা বললে কি কোনো ক্ষতি আছে?

উত্তর : সহবাস চলাকালে স্বামী-স্ত্রীতে কথা বললে কোনো ক্ষতি নেই। সে সময় কথা বললে সন্তান বোবা হয়, এ ধারণা সঠিক নয়।

প্রশ্ন-৩৪. গর্ভাবস্থায় সঙ্গম বৈধ কি?

উত্তর : শরীআতে গর্ভাবস্থায় সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। ভ্রূণের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে সঙ্গমে দোষ নেই। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে পেটে চাপ না পড়ে। অবশ্য শেষের দিকে না করাই উচিত। যেহেতু বলা হয় যে, তাতে ব্যাক্টেরিয়াগত কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেমন যে মহিলার গর্ভপাত হয়, তার সাথে প্রথম তিন মাস সঙ্গম না করতে ডাক্তাররা উপদেশ দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন-৩৫. মিলন তৃপ্তির কথা স্বামী কি তার বন্ধুদের কাছে এবং স্ত্রী কি তার বান্ধবীদের কাছে বলতে পারে?

উত্তর : মিলন-তৃপ্তির কথা স্বামী তার বন্ধুদের কাছে এবং স্ত্রী তার বান্ধবীদের কাছে বলতে পারে না, বিশেষ করে যদি তারা অবিবাহিত হয়। মজা করে হলেও সে কথা কারো কাছে বলা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।"[৩৮৮]

আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবত কোনো পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবত কোনো মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল । আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মতো, যে কোনো নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।"[৩৮৯]

প্রশ্ন-৩৬. গোসল করার মতো পানি নেই জানলেও মিলন করা বৈধ হবে কী?

উত্তর : গোসল করার মতো পানি নেই জানলেও মিলন অবৈধ নয়। মিলনের সময় মিলন বৈধ। নামাযের সময় পানি না পাওয়া গেলে যথানিয়মে তায়াম্মুম করে নামায বৈধ। আবু যার রা. পানি না থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী-মিলন করলে নবী করীম ﷺ তাকে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযূর উপকরণ হলো পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল করে নাও।"[৩৯০]

প্রশ্ন-৩৭. হাদীসে আছে, "যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।"

---

[৩৮৮] মুসলিম।
[৩৮৯] আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আবু দাউদ, বাইহাকী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩ পৃ.।
[৩৯০] আহমাদ, আবু দাউদ ৩৩৩ নং।

কিন্তু বাসায় পানি না থাকার ফলে ফজরের নামায নষ্ট হওয়ার ভয়ে যদি আমি মিলনে রাজি না হই, তাহলে তাতেও কি আমি অভিশপ্তা হব?

উত্তর : পানি না থাকলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া যাবে। সুতরাং সেই ওজরে স্বামীর যৌন-সুখে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু শরীআতে এমন বিধান নেই যে, পানি না থাকলে তোমরা নাপাক হয়ো না; বরং বিধান হলো, মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।[৩৯১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

---

[৩৯১] সূরা নিসা : ৪৩।

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা টাকনু পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।[৩৯২]

প্রশ্ন-৩৮. স্বামীর যৌন-সুখে বাধা দেওয়া অথবা মিলন না দিয়ে তাকে রাগান্বিত করা অভিশাপের কাজ জানি। কিন্তু সে যদি অবৈধ মিলন প্রার্থনা করে, তাতে রাজি না হই; তাহলেও কি অভিশপ্তা হব?

উত্তর : স্বামী যদি অবৈধ মিলন চায় এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যদি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন বা তার অবাধ্যাচরণ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিশাপ আসার কোনো প্রশ্নই আসে না; বরং "আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির বাধ্য হওয়া যাবে না।"[৩৯৩] সুতরাং স্বামী যদি রমযানের দিনে অথবা মাসিকাবস্থায় মিলন চায় অথবা পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর তাতে সম্মত হওয়া বৈধ নয়। তাতে সে রাগারাগি করলেও সে রাগ তার অন্যায়। সে স্বামী একজন যালেম। আর স্ত্রীর উচিত, যালেম স্বামীর সাহায্য করা। একদা রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।" আনাস রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।"[৩৯৪]

---

[৩৯২] সূরা মায়িদাহ : ৬।
[৩৯৩] আহমাদ, হাকেম, মিশকাত ৩৬৯৬ নং।
[৩৯৪] বুখারী।

প্রশ্ন-৩৯. আমরা নতুন বর-কনে। ইসলামী বিধান মানার ব্যাপারেও আমাদেরকে নতুন বলতে পারেন। আমরা জানতে চাই, আমাদের প্রেমকেলিতে কোন্ সময় গোসল করা ফরয হয় এবং কোন্ সময় হয় না।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর যৌন-জীবনে বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। আর সেই অবস্থা অনুযায়ী বলা যাবে, কখন গোসল ফরয এবং কখন তা ফরয নয়। স্পর্শ, চুম্বন, দংশন, মর্দন ইত্যাদির ফলে যদি প্রস্রাবদ্বার থেকে আঠালো তরল পদার্থ বের হয় তাহলে তাতে গোসল ফরয নয়। তাতে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়ে লাগলে পানির ছিটা দিয়ে পবিত্র করতে হয় এবং প্রস্রাবদ্বার ধুতে হয়। কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় যদি বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে গোসল ফরয হয়ে যায়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ যোনিপথে প্রবেশ করলেই উভয়ের জন্য গোসল ফরয হয়ে যায়। তাতে বীর্যপাত হোক, চাই না হোক। যোনিপথের বাইরে স্ত্রী-দেহের উপরে বা তার হাতে বীর্যপাত হলে কেবল স্বামীর উপরে গোসল ফরয, স্ত্রীর উপরে নয়। অবশ্য সে প্রেম-কেলিতে যদি স্ত্রীর বীর্যপাত না হয় তাহলে। মোট কথা, বীর্যপাত গোসল ফরয হওয়ার একটি কারণ।

প্রশ্ন-৪০. সঙ্গমে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কলিং-বেল বেজে উঠলে উঠে গিয়ে দরজা খুলি এবং আমাদের বীর্যপাতও হয়নি। এতে কি গোসল জরুরি?

উত্তর : সঙ্গমে লিপ্ত হলেই এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ যৌনিপথে প্রবেশ করালেই গোসল ফরয। তাতে বীর্যপাত হোক অথবা না হোক।

প্রশ্ন-৪১. বীর্যপাত হলে গোসল ফরয। লিঙ্গাগ্র স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করলে এবং বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয। কিন্তু নিরোধ ব্যবহার করে প্রবেশ করালে এবং বীর্যপাত না হলে কি গোসল ফরয?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

"যখন স্বামী তার স্ত্রীর চার শাখা (দুই হাত ও পায়ের) ফাঁকে বসবে এবং লিঙ্গ লিঙ্গে স্পর্শ করবে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩৯৫] নিরোধ ব্যবহার করে লিঙ্গে-লিঙ্গে স্পর্শ না হলেও যেহেতু প্রবেশ করিয়ে তাতে যৌনতৃপ্তি অর্জন হয়, সেহেতু গোসল করতে হবে।

---

[৩৯৫] মুসলিম ৩৪৯ নং।

প্রশ্ন-৪২. আমি একজন বিধবা যুবতী। অনেক সময় স্বপ্নে দেখি, আমি পূর্ণ তৃপ্তির সাথে স্বামী সহবাস করছি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর শরমগাহে কোনো অতিরিক্ত তরল পদার্থ লক্ষ্য করি না। এতে কি আমার জন্য গোসল ফরয হবে?

উত্তর : শরমগাহে বীর্য লক্ষ্য না করলে ফরয নয়।[৩৯৬] যুবকও যদি স্বপ্নে সহবাস করে এবং ঘুমিয়ে উঠে কাপড়ে বীর্য দেখলে স্বপ্নদোষ হওয়ার কথা মনে না থাকলেও গোসল ফরয।

প্রশ্ন-৪৩. সহবাসের পর সত্বর গোসল করা কি জরুরি?

উত্তর : সহবাসের পর সত্বর গোসল করে নেওয়া উত্তম। নচেৎ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া হঠাৎ এমন প্রয়োজনও পড়তে পারে, যাতে গোসল করা জরুরি। অবশ্য নিশ্চিন্ত হলে ঘুমাবার আগে অথবা কাজকর্ম বা পানাহার করার আগে ওযূ করে নেওয়া মুস্তাহাব।[৩৯৭]

প্রশ্ন-৪৪. স্বামী-সহবাসের পর গোসল করার পূর্বে মহিলার জন্য কি ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও রান্না-বান্না করা বৈধ নয়?

উত্তর : স্বামী-সহবাসের পর গোসল করার পূর্বে মহিলার জন্য ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও রান্না-বান্না করা অবৈধ নয়। যা অবৈধ, তা হলো নামায, কা'বা-ঘরের তাওয়াফ, মসজিদে অবস্থান, কুরআন স্পর্শ ও তিলাওআত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ বৈধ।

একদা আবু হুরাইরা রা.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনার এক পথে দেখা হলো। সে সময় আবু হুরাইরা অপবিত্রাবস্থায় ছিলেন। তিনি সরে গিয়ে গোসল করে এলেন। নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে আবু হুরাইরা!" তিনি বললেন, 'আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই সেই অবস্থায় আপনার সাথে বসাটাকে অপছন্দ করলাম।' নবী করীম ﷺ বললেন, "সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না।"[৩৯৮] অর্থাৎ মুসলিম অভ্যন্তরীণভাবে অপবিত্র হলেও বাহ্যিকভাবে সে অপবিত্র হয় না বা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না।

প্রশ্ন-৪৫. গোসলের পর প্রস্রাব-দ্বার থেকে বীর্য বের হতে দেখলে কি পুনরায় গোসল করতে হবে?

উত্তর : গোসলের পর প্রস্রাবদ্বার থেকে বীর্য বের হলে তা উত্তেজনাবশত নয়; বরং তা কোনোভাবে ভেতরে আটকে থাকা বীর্য। সুতরাং তাতে পুনরায় গোসল করা ওয়াজিব নয়। তা প্রস্রাবের মতো, তা পুনরায় ধুয়ে ফেলে ওযূ করলেই যথেষ্ট।

---

[৩৯৬] বুখারী ১৩০, ৭৩৮নং।
[৩৯৭] বুখারী ৩৮৩, মুসলিম ৩০৫-৩০৬ নং।
[৩৯৮] বুখারী ২৭৯, মুসলিম ৩৭১ নং।

প্রশ্ন-৪৬. মিলনের পর বাথরুমে প্রস্রাব করতে গিয়ে দেখি, মাসিক শুরু হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে কি মিলনের গোসল করতে হবে?

উত্তর : স্বামী সহবাসের পর মাসিক শুরু হয়ে গেলে গোসল ফরয নয়। কারণ সে ফরয পালন করে কোনো লাভও নেই। সে গোসলের পর সে পবিত্র হবে না। সুতরাং মাসিক বন্ধ হওয়ার পর গোসল ফরয। কিন্তু মাসিকাবস্থায় যদি কুরআন মুখস্থ পড়তে হয়, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। কারণ বীর্যপাতঘটিত অপবিত্রতায় সঠিক মতে কুরআন পড়া বৈধ নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাজসজ্জা ও প্রসাধন

প্রশ্ন-১. বিনা অহংকারে পরিহিত বস্ত্র টাকনুর নিচে ঝুলানো হারাম কিনা?

উত্তর : পুরুষদের জন্য পরিহিত বস্ত্র পায়ের টাকনুর নিচে ঝুলানো হারাম, তাতে অহংকারের উদ্দেশ্যে হোক অথবা অহংকারের উদ্দেশ্যে না হোক। তবে যদি তা অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার শাস্তি অধিকতর কঠিন ও বড়। যেহেতু সহীহ মুসলিমের আবু যার রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।" আবু যার রা. বললেন, 'তারা কারা? হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক।' তিনি বললেন, "টাকনুর নিচে যে কাপড় ঝুলায়, কিছু দান করে দিয়েছি বলে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।"

এই হাদীসটি অনির্দিষ্ট। কিন্তু তা ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট, যাতে নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অহংকারে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না।"

সুতরাং আবু যার রা.-এর হাদীসে অনির্দিষ্ট উক্তি ইবনে উমারের হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। যদি অহংকারসহ কাপড় লটকায়, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি দেখবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য হবে কষ্টদায়ক আযাব। আর এই শাস্তি সেই শাস্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর, যে শাস্তি নিরহংকারের সাথে টাকনুর নিচে লুঙ্গি নামিয়ে থাকে এমন ব্যক্তির হবে'; যে ব্যক্তি প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন, টাকনুর নিচের লুঙ্গি জাহান্নামে।

অতএব শাস্তি যখন পৃথক পৃথক হলো, তখন অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করা অসঙ্গত হবে। কারণ অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করার নিয়মে শর্ত এই যে, উভয় দলিলের নির্দেশ অভিন্ন হবে। কিন্তু যদি নির্দেশ ভিন্ন হয়, তবে একে অপরের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এই জন্যই তায়াম্মুম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তাতে তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।" ওযুর আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করি না, যাতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।"[৩৯৯] সুতরাং তায়াম্মুম (মাসাহ করা) হাতের কনুই পর্যন্ত হবে না। (যদিও ওযূতে হাতের কনুই পর্যন্ত ধুতে হয়।)

ইমাম মালেক প্রমুখ যা আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তা এই কথার প্রতিই নির্দেশ করে। যাতে নবী করীম ﷺ বলেন, "মুমিনদের লুঙ্গি তার অর্ধ পদনালী (হাঁটু হতে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ) পর্যন্ত। আর গাঁটের নিচে যা হবে তা দোযখের হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার পরিহিত লেবাস (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জাম, ধুতি, কামীস ইত্যাদি) মাটির উপর ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাকিয়েও দেখবেন না।" অতএব নবী করীম ﷺ একই হাদীসে দুটি উদাহরণ পেশ করেন এবং উভয়ের শাস্তি পৃথক হওয়ার কারণে উভয়ের নির্দেশের ভিন্নতাও বিবৃত করেন। সুতরাং উক্ত দুইজন কর্মে ভিন্ন, নির্দেশ ভিন্ন এবং শাস্তিতেও পৃথক। এই থেকে তাদের ভুল স্পষ্ট হয়, যারা তাঁর উক্তি (গাঁটের নিচে যা তা দোযখে) কে (যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তা কাপড় ছেঁচড়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না) এই উক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করে।

আবার কতক মানুষ আছে যাদেরকে গাঁটের নিচে লুঙ্গি বা প্যান্ট ঝুলতে নিষেধ করলে বলে, 'আমি অহংকারের উদ্দেশ্যে ঝুলাইনি তো।'

কিন্তু আমরা তাদেরকে বলি যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো দুই প্রকার; প্রথম প্রকার শাস্তিঃ যার শাস্তি, মানুষকে কেবল সেই স্থানে আযাব দেওয়া হবে, যে স্থানে সে (শরীআতের) অবাধ্যতা করে এবং তা হচ্ছে গাঁটের নিচের অংশ, যার উপর নিরহংকারে কাপড় ঝুলায়। অতএব এ ব্যক্তিকে কেবল অবাধ্যতার অঙ্গে শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাতে অবাধ্যতা করছে, কেবল তার বদলায় তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে, আর তা হচ্ছে যা গাঁটের নিচে নামে। কিন্তু এই অবাধ্যাচারীর এই শাস্তি হবে না যে, তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না। (কারণ, তার অহংকার নেই) আর দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার প্রতি তাকাবেন না,

---

[৩৯৯] সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত।

তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে। আর এটা তার জন্য হবে, যে তার পরিহিত বস্ত্রকে পায়ের গাঁটের নিচে অহংকারের সাথে মাটিতে ছেঁচড়ে বেড়ায়।

প্রশ্ন-২. মহিলাদের দেহ থেকে লোম তুলে ফেলা কি বৈধ?

উত্তর : মহিলাদের দেহে তিন প্রকার লোম আছে।

(ক) যা তুলে ফেলা ওয়াজিব। যেমনঃ বগল ও গুপ্তাঙ্গের লোম।

(খ) যা তুলে ফেলা হারাম। যেমনঃ ভ্রুরুর লোম।

(গ) যে লোম তোলার ব্যাপারে কোনো আদেশ নিষেধ নেই, তা তুলে ফেলা বৈধ। যেমনঃ পিঠ বা পায়ের লোম। অনুরূপ চেহারায় পুরুষের মত দাড়ি-গোঁফের অস্বাভাবিক লোম।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীর উপর যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীর উপর যারা ভ্রু চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে। জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসউদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না? যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।"[৪০০]

প্রশ্ন-৩. পুরুষদের জন্য সোনা ব্যবহার হারাম। কিন্তু কেউ বলেন চার আনা পরিমাণ নাকি জায়েয, যাতে বিপদে কাজে আসে। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর : পুরুষের জন্য সোনার চেন, ঘড়ি, আংটি, বোতাম, কলম ইত্যাদি ব্যবহার বৈধ নয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সোনা ও রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[৪০১]

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের অঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

---

[৪০০] সূরা হাশর ৭ আয়াত।
[৪০১] তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৪১ নং।

অতঃপর নবী করীম ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হলো, তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।) কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।'[৪০২]

প্রকাশ থাকে যে, ব্যতিক্রমভাবে পুরুষের জন্য সোনার নাক বাঁধার অনুমতি রয়েছে ইসলামে। সাহাবী আরফাজার নাক কাটা গেলে নবী করীম ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দিয়েছিলেন।[৪০৩] প্রয়োজনে সোনার তার দিয়ে বাঁধতে অথবা সোনার দাঁত বাঁধিয়ে ব্যবহার করতেও অনুমতি আছে শরীআতে। পক্ষান্তরে চার আনা সোনার আংটি ব্যবহারের বৈধতা শরীআতে নেই। বিপদে প্রয়োজনে যেকোনো স্বর্ণটুকরা হাতে না রেখে সাথেও তো রাখা যায়। প্রকাশ থাকে যে, সোনা দিয়ে পলিশ করা জিনিসেও যেহেতু সোনা থাকে, সেহেতু তা পুরুষের জন্য ব্যবহার বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৪. পুরুষদের জন্য সোনা ছাড়া অন্য ধাতুর চেন পরা কি বৈধ?

উত্তর : যে অলংকার সাধারণত মহিলাদের, তা পুরুষদের পরা বৈধ নয়। গলায় চেন, কানে দুল, হাতে বালা ইত্যাদি পুরুষরা পরতে পারবে না। কারণ তাতে মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। যেমন মহিলারা পুরুষদের মতো প্যান্ট-শার্ট পরতে পারে না। কারণ তাতে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।[৪০৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যে মহিলার পোশাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।[৪০৫]

প্রশ্ন-৫. পাকা চুল-দাড়িতে কি কালো কলপ ব্যবহার করা বৈধ?

উত্তর : পাকা চুল দাড়ি সাদা না রেখে রাঙিয়ে রাখা তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নত। তবে তাতে কালো কলপ ব্যবহার করা বৈধ নয়। জাবের রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে আনা হলো। তখন তাঁর চুল দাড়ি ছিল 'ষাগামা'

---

[৪০২] মুসলিম: ২০৯০।
[৪০৩] আহমাদ ১৮৫২, আবূ দাউদ ৪২৩২, তিরমিযী ১৭৭০, নাসাঈ, ৫১৬১।
[৪০৪] বুখারী।
[৪০৫] আবূ দাউদ।

ফুলের মতো সফেদ (সাদা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কোনো রঙ দিয়ে এই সফেদকে বদলে ফেল। আর কালো রঙ থেকে একে দূরে রাখ।"

আর সকলের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "শেষ যামানায় এমন এক শ্রেণির লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মতো কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"[৪০৬]

তবে মেহেদী দিয়ে দাড়ি রাঙ্গানো যেতে পারে।

প্রশ্ন-৬. মুসলিম মহিলাদের জন্য শাড়ি পরা কি বৈধ?

উত্তর : শাড়ি যদি সারা দেহ ঢেকে নেয়, তাহলে বৈধ। বলা বাহুল্য, পেট-পিঠ বের করে অথবা পাতলা শাড়ি পরা বৈধ নয়। অনুরূপ এমন লেবাসও বৈধ নয়, যাতে নারী-দেহের কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যে নারীরা এমন শাড়ি বা লেবাস পরে, তারা সেই নারীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুই শ্রেণির মানুষ জাহান্নামবাসী হবে, যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণি হলো, সেই মহিলার দল যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথা হবে হেলে যাওয়া উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতের প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ অনেক দূরবর্তী স্থান হতেও পাওয়া যাবে।[৪০৭]

প্রশ্ন-৭. সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু চাঁছা কি বৈধ?

উত্তর : বৈধ নয়। কারণ আল্লাহর অভিশাপ সেই সব নারীর উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রু চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।[৪০৮]

প্রশ্ন-৮. হাতের নখ লম্বা করা কি হারাম?

উত্তর : হাতের নখ কেটে ফেলা প্রকৃতিগত সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ, ১. খাৎনা (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। ২. লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। ৩. নখ কাটা। ৪. বগলের লোম ছেড়া। ৫. গোঁফ কেটে ফেলা।[৪০৯]

---

[৪০৬] আবূ দাউদ ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে-৮১৫নং।
[৪০৭] মুসলিম- ২১২৮নং।
[৪০৮] বুখারী, মুসলিম।
[৪০৯] বুখারী, মুসলিম।

হযরত আনাস রা. বলেন, মোচ কাটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা তা চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে না রাখি।[৪১০]

তাছাড়া তাতে রয়েছে জন্তু-জানোয়ার ও কিছু কাফের মহিলাদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন, যা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৯. নখে নখ-পালিশ লাগানো কি বৈধ?

উত্তর : নখে নখ পালিশ লাগানো বৈধ। তবে ওযূ-গোসলের আগে তা তুলে ফেলতে হবে। নচেৎ ওযূ-গোসল শুদ্ধ হবে না। অবশ্য যে রঙে পানি আটকায় না, সে (আলতা বা মেহেন্দী জাতীয়) রঙ ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন-১০. বিউটি পার্লারে সুন্দরী সাজতে যাওয়া কি মুসলিম মহিলাদের জন্য বৈধ?

উত্তর : কয়েক কারণে বৈধ নয়

(ক) অপ্রয়োজনে তাতে অর্থ অপচয় হয়।

(খ) পুরুষ কর্মচারীর স্পর্শ নিতে হয়।

(গ) অপরের সামনে লজ্জাস্থান খুলতে হয়।

(ঘ) সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে কাফের মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়।

(ঙ) অনেক সময় গুপ্ত ক্যামেরায় মহিলাদের নগ্ন ছবি ধরে রাখা ও নেটে প্রচার করা হয়।

তবে একান্তে স্বামীর জন্য বাড়িতে বসে রূপচর্চা করা বৈধ।

প্রশ্ন-১১. স্বামীর চোখে অধিক সুন্দরী সাজার জন্য কি মাথায় পরচুলা, নকল চুল বা টেসেল ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : মহিলার সুকেশ সৌন্দর্যের অন্যতম দিক। মাথায় আদৌ চুল না থাকলে ত্রুটি ঢাকার জন্য পরচুলা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অধিক চুল দেখানোর জন্য তা বৈধ নয়। যেহেতু যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন মহিলাকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ করেছেন।[৪১১]

প্রশ্ন-১২. সৌন্দর্যের জন্য প্লাস্টিক সার্জারি বৈধ কি?

উত্তর : প্লাস্টিক সার্জারি দুটি উদ্দেশ্যে করা হয়, আঙ্গিক ত্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অথবা অতিরিক্ত সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে করা যায়। প্রথম উদ্দেশ্যে

---

[৪১০] মুসলিম- ২৫৮।

[৪১১] বুখারী-৫৯৪১, মুসলিম-২১২২, ইবনে মাজাহ- ১৯৮৮।

করা বৈধ। যেমনঃ বিকৃত ও কুশ্রী মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে বৈধ নয়। কারণ তাতে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়, যা শয়তানের প্ররোচনায় করা হয়।[৪১২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা হাত বা চেহারায় নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (ভ্রু চাছে), সৌন্দর্য আনার জন্য তারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহর অভিশাপ দিয়েছেন।[৪১৩]

প্রশ্ন-১৩. বৈধ খেলাধুলার সময় শর্ট প্যান্ট পরা বৈধ কি?

উত্তর : যে প্যান্টে জাং খোলা যায়, সে প্যান্ট পরাই বৈধ নয়। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট পরে খেলাধুলা করা বা সাঁতার কাটা যায়। জাং-খোলা খেলোয়ারদের খেলা দেখাও দর্শকদের জন্য বৈধ নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং কোনো জীবিত অথবা মৃতের উরুর দিকে তাকিয়ে দেখো না।[৪১৪]

অন্যত্র বলেন, "তুমি তোমার জাং ঢেকে নাও। কারণ, জাং হলো লজ্জস্থান।"[৪১৫]

পক্ষান্তরে কিশোরী ও যুবতীদের জন্য বৈধ নয় কোনো পুরুষ (প্রশিক্ষক বা অন্য পুরুষের) সামনে অনুরূপ ব্যায়াম, শরীর চর্চা বা খেলাধুলা করা অথবা সাঁতার কাটা বৈধ নয় এবং তা দর্শন করাও বৈধ নয়।

প্রশ্ন-১৪. বাড়িতে পাখি পোষা কি জায়েয?

উত্তর : সৌন্দর্য ও বিলাসিতার জন্য পিঞ্জিরা বা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পাখি পোষা, হাওয বা পাত্রের মধ্যে পানি রেখে মাছ পোষা বৈধ, যদি সঠিকভাবে খেতে-পান করতে দেওয়া হয় এবং কোনো প্রকারে যুলুম না করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে, যাকে সে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।"[৪১৬]

বুঝা গেল, যদি তাকে খেতে দিত, তাহলে জাহান্নামে যেত না।

---

[৪১২] সূরা নিসা-১১৯।
[৪১৩] বুখারী-৪৮৮৬, মুসলিম-২১২৫, আসহাবে সুনান।
[৪১৪] আবু দাউদ, সহীহুল জামে- ৭৪৪০।
[৪১৫] আবু দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম,ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে-৭৯০৬।
[৪১৬] বুখারী-২৩৬৫,৩৪৮২, মুসলিম-২২৪২।

প্রশ্ন-১৫. চোখের ভেতরে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা কি বৈধ?

উত্তর : প্রয়োজন হলে অবশ্যই বৈধ। তবে বিনা প্রয়োজনে কেবল চোখের সৌন্দর্য আনয়নের জন্য অর্থের অপচয় ঘটানো ঠিক নয়। বৈধ নয় অনুরূপ সৌন্দর্য নিয়ে কাউকে ধোঁকা দেওয়া।

প্রশ্ন-১৬. নক্সাদার বোরকা পরা কি বৈধ?

উত্তর : মহিলার লেবাসের সৌন্দর্য; দৃষ্টি আকর্ষী রঙ, নক্সা, ফুল ইত্যাদি গোপন করার জন্যই বোরকা বা চাদর ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই বোরকা বা চাদরই যদি জরিদার, এমব্রয়ডারি করা, ফুলছাপা ইত্যাদি হয়, তাহলে তো তার উপরে আরও একটি বোরকা পরা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং চাদর বা বোরকা সাদা-সিধা হবে, যা সৌন্দর্য গোপন করবে এবং বিতরণ করবে না। যা দেখে পুরুষদের মনে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করবে এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করবে না।

প্রশ্ন-১৭. চোখের পাতায় অতিরিক্ত লোম বা ল্যাশ লাগানো বৈধ কি?

উত্তর : না এটি বৈধ নয়। এটিও পরচুলা লাগানোর মতোই জালিয়াতির পর্যায়ে পড়ে। আর এমন প্রসাধিকা মহিলা অভিশপ্ত।

প্রশ্ন-১৮. শিশু-কিশোরীকে বুক ওঠার আগে বগল কাটা ফ্রক পরানো কি বৈধ?

উত্তর : মুসলিম মায়ের উচিৎ শৈশব থেকেই মেয়েকে ইসলামী লেবাসে অভ্যস্ত করে তোলা। কিশোরী মেয়ের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। সুতরাং তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা আদৌ উচিত নয়। বলা বাহুল্য, সেলোয়ারের সাথে ফুলহাতা কামিস বা ফ্রকই পরানো উচিত। সেই সাথে মাথায় ওড়না। যাতে শৈশব থেকেই তার মনে লজ্জাশীলতা, অপ্রগলভতা ও ধর্মভীরুতা স্থান করে নিতে পারে।

প্রশ্ন-১৯. হাদীসে এসেছে, 'সাদাসিধা বা আড়ম্বরহীন হয়ে থাকা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।' তার মানে কি সৌন্দর্য অবলম্বন করা ঈমানের আলামত নয়?

উত্তর : উক্ত হাদীসের অর্থ হলো, লেবাসে পোশাকে মুসলিম অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি, বিলাসিতা ও অপচয় করবে না। তার পোশাকে জাঁকজমক, ঠাটবাট ও আড়ম্বর থাকবে না। নচেৎ সৌন্দর্য অবলম্বন করা দোষের নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তা পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কী হবে?) নবী করীম ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য

পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা পোশাক পরায় অহংকার নেই।)" অহংকার হলো, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।[৪১৭]

যেমন; সাদাসিধা হয়ে থাকার মানে এও নয় যে, মুসলিম ন্যালাখ্যাপা হয়ে থাকবে, লেবাস পোশাক নোংরা হয়ে থাকবে এবং তার দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে। যেহেতু পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-২০. হাদীসের নির্দেশমতে বগলের লোম ছিঁড়ে বা তুলে ফেলতে হয়। কিন্তু আমাকে তা কষ্টকর মনে হয়। সুতরাং তা যদি কেটে বা চেঁছে ফেলি অথবা কেমিক্যাল দিয়ে তুলে ফেলি, তাহলে কোনো ক্ষতি আছে কি?

উত্তর : বগলের লোম ছিড়ে বা তুলে ফেলতে না পারলে তা ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলা অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা অথবা কেমিক্যাল দিয়ে তুলে ফেলায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-২১. অনেক মহিলার ধারণা, লম্বা নখে সৌন্দর্য আছে। সুতরাং নখ লম্বা ছেড়ে রাখায় কোনো দোষ আছে কি?

উত্তর : লম্বা নখে সৌন্দর্য নেই। অবশ্য বিকৃত পছন্দের অনেকের নিকট তা থাকতে পারে। কিন্তু শরীআতে নখ লম্বা করার অনুমতি নেই বরং মানুষের প্রকৃতি তা লম্বা রাখার বিরোধী। তাই চল্লিশ দিনের মাথায় তা কেটে ফেলতেই হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,"প্রকৃতিগত আচরণ পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ, ১. খাত্না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। ২. লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। ৩. নখ কাটা। ৪. বগলের লোম ছেড়া। ৫. গোঁফ কেটে ফেলা।[৪১৮]

হযরত আনাস রা. বলেন, মোছ কাটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা তা চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে না রাখি।[৪১৯]

প্রশ্ন-২২. শোনা যায়, 'মোচের পানি হারাম'। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর : যে পানিতে মোচ ডুবেছে, সে পানি প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণ্য হতে পারে। তবে সে পানি পান করা হারাম, তা বলা যায় না। অবশ্য মোচ ছেঁটে ছোট করার নির্দেশ আছে শরীআতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি

---

[৪১৭] মুসলিম-৯১, তিরমিযী, হাকেম-১/২৬।
[৪১৮] বুখারী, মুসলিম।
[৪১৯] মুসলিম- ২৫৮।

বাড়াও, মোচ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য অর্থাৎ মেহেদী রঙ্গ) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদ ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।"[৪২০]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার মোচ ছাটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪২১]

প্রশ্ন-২৩. চুল-নখ ইত্যাদি কেটে ফেলার পর তা দাফন করা কি বিধেয়?

উত্তর : সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. কর্তৃক এরূপ আমল বর্ণিত আছে। অনেক ফুক্বাহাও তা মুস্তাহাব মনে করেন। আর এ কথা বিদিত যে, বহু যাদুকর তা দিয়ে যাদুও করে থাকে। সুতরাং সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন-২৪. দাড়ি রাখা কি সুন্নত, নাকি ওয়াজিব?

উত্তর : দাড়ি রাখা সকল নবীর সুন্নাত (তরীকা)। কিন্তু উম্মতের জন্য তা পালন করা ওয়াজিব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি লম্বা কর এবং মোচ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য অর্থাৎ মেহেদী রঙ্গ) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদ ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।"[৪২২]

তিনি আরও বলেন, "মোচ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।"[৪২৩]

প্রশ্ন-২৫. দাড়ি কি মোটেই ছাঁটা চলবে না? নাকি সৌন্দর্যের জন্য এক মুঠির বেশি দাড়ি ছেঁটে ফেলা যায়?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপক নির্দেশ পালন করতে গিয়ে দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ভালো। যেহেতু তিনি যে দাড়ি ছাঁটতেন, তার সহীহ দলিল নেই। তবে সাহাবীদের আমল থেকে বুঝা যায় যে, এক মুঠির অতিরিক্ত দাড়ি ছেঁটে ফেলা যায়।

সমাপ্ত

---

[৪২০] আহমাদ, সহীহুল জামে-১০৬৭।
[৪২১] তিরমিযী-২৭৬২, সহীহুল জামে-৬৫৩৩।
[৪২২] আহমাদ, সহীহুল জামে-১০৬৭।
[৪২৩] মুসলিম-১৬০।

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১.	কুরআনুল কারীম (সহজ-সরল অনুবাদ)	মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ্ মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
২.	শব্দার্থে তাফসীরুল কুরআন (১-১০ খণ্ড)	মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ্ মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
৩.	আল কুরআনের সারমর্ম (সংক্ষিপ্ত তাফসীর)	মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী	প্রকাশিতব্য
৪.	পথের সম্বল (হাদীস সংকলন)	মাওলানা জলীল আহসান নদভী	প্রকাশিতব্য
৫.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৭.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
৮.	দারুসুল কুরআন (শেষ ১২ সূরা)	মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী	১৫০ টাকা
৯.	Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	২৯৫ টাকা
১০.	আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
১১.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
১২.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
১৩.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৩০ টাকা
১৪.	খোলাফায়ে রাশেদা (রা)	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
১৫.	মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৫০ টাকা
১৬.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০ টাকা
১৭.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	২৬০ টাকা
১৮.	আল্লাহর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
১৯.	রাসূল সা.-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
২০.	বারো চান্দের ফজিলত	ত্বকী উসমানী	প্রকাশিতব্য
২১.	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	১২০ টাকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
২২.	সহীহ আহকামে জিন্দেগী	মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
২৩.	রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদ সা.	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৮০ টাকা
২৪.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূলের ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ,ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৫.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৬.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাসআলা	আব্দুল্লাহ্ শহীদ আব্দুর রহমান	২১০ টাকা
২৭.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	১৫০ টাকা
২৮.	নাসিরুদ্দীন আলবানী, মুফতি আমীমুল ইহসান ও আব্দুল হামীদ ফাইযী রহ.-এর গ্রন্থাবলম্বনে **রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায**	মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	৪০০ টাকা
২৯.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মো ঃ আব্দুল লতীফ	২২০ টাকা
৩০.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৫০ টাকা
৩১.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে **কবীরা গুনাহ**	ইমাম আয যাহাবী	২৮০ টাকা
৩২.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	প্রকাশিতব্য
৩৩.	আসুন আল্লাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	২৮০ টাকা
৩৪.	আল কুরআনে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	যোবায়ের হোসাইন রাফীকী	প্রকাশিতব্য
৩৫.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	৩৩০ টাকা
৩৬.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আল্লামা ইবনুল জাওযী	প্রকাশিতব্য
৩৭.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৬০ টাকা
৩৮.	আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর সাথে প্রতিদিন (৩৬৫ দিনের ডায়েরী)	মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	৩৩০ টাকা
৩৯.	খাতামুন নাবীঈন (সা)	ডক্টর মাজেদ আলী খান	প্রকাশিতব্য
৪০.	গল্পে গল্পে আবু বকর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৫০ টাকা
৪১.	গল্পে গল্পে ওমর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৫০ টাকা
৪২.	গল্পে গল্পে ওসমান রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৫০ টাকা
৪৩.	গল্পে গল্পে আলী রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৫০ টাকা
৪৪.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৫০ টাকা
৪৫.	আবু বকর আস সিদ্দিক রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৪৬.	ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৪৭.	ওসমান ইবনুল আফ্‌ফান রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৪৮.	আলী ইবনে আবী তালিব রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য